মুজিবরের বাংলা

মুজিবরের বাংলা

পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
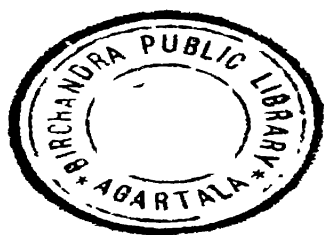
: পরিবেশক :

সুহাস পাবলিশিং হাউস

১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

অপরূপা প্রকাশনীর পক্ষে
শিশির কুমার মান্না কর্তৃক
১৮সি, টেমার লেন, কলি-৯ হইতে প্রকাশিত
প্রথম প্রকাশ—১৩৫৮ বৈশাখ

চিত্র-শিল্পী
প্রভাতকুমার কর্মকার

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণে
রয়েল হাফটোন
৪ নং সরকার বাই লেন

ফটো— পাহাড়ী রায়চৌধুরী

ব্যবস্থাপনায়
এস. পি. দত্ত
১৮ সি, টেমার লেন, কলি-৯

মূল্য—দশ টাকা

মুদ্রণে : শ্রীদামোদর প্রেস (৫২এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলি-৬)
মদন প্রেস (১।১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলি-৬)
বাণীরূপা (৯ নং মনমোহন বসু ষ্ট্রীট, কলি-৬)
রঘুনাথ প্রেস (২৫।২ এ, কালিদাস সিংহ লেন, কলি-৬)

জবানবন্দী

এই ধরণের গ্রন্থ, যাতে আছে তথ্য, আছে বিবরণ, আছে ইতিহাসের অনেক গৌরব-অগৌরবের অধ্যায়, তা লিখতে গেলেই দরকার সাহায্যের। মাল-মসলা ঠিক মত না জোগালে রান্না যেমন সুস্বাদু হয় না, তেমনি রসদ না পেলে গ্রন্থ হয় না সুপাঠ্য। অবশ্য রাঁধুনীর হাত হওয়া চাই পাকা, না-হলে বিস্তর মাল-মসলার সরবরাহ অব্যাহত থাকলে-ও রান্না হবে অখাদ্য। সেই পাকা পাচক হতে পেরেছি কিনা, সেই বিচারের বিচারক পাঠক। তবে পাঠক যদি কাজী হন, তাহলে বিচার কেমন হবে, তা আমার অজ্ঞাত।

যাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণীয়, তার সবাকার আগের পুরোহিত হলেন, জয় বাংলার সংগ্রামী জনগণ। ইতিহাসের স্বর্ণ-যুগের অরুণাভায় আমাকে নিয়ে গেছেন তাঁরাই। তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি উৎসাহ, পেয়েছি উদ্দীপনা, পেয়েছি আশা, পেয়েছি ভরসা। এর পরে ই যে পুস্তকের তথ্য ও তত্ত্ব আমাকে সবাধিক প্রেরণা জুগিয়ছে, তা হল, অধ্যাপক সমর গুহের একটি গ্রন্থ। বিশেষভাবে আর যাঁরা উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন, ঢাকার ইত্তেফাক, ঢাকার অন্যান্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা, কলকাতার আনন্দবাজার ও যুগান্তর, মৌলানা আজাদের 'ইণ্ডিয়া উনস্ ফ্রিডম', বদরুদ্দিন উমরের 'ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,' ঢাকার বেতার, করাচীর বেতার, স্বাধীন বাংলার বেতার, অষ্ট্রেলিয়ার বেতার, পুরাতন দলিল ও সরকারী বিবরণ, বন্ধুদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কলকাতার আনন্দবাজার ও যুগান্তরে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, ও সংবাদ এবং পাকিস্তানের উপর লিখিত বাংলায় বিভিন্ন পুস্তকাদি। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানালে করা হবে এঁদেরকে খাটো, নিজেকে ছোট।

এঁরা আমার স্মৃতি-তর্পণে উজ্জ্বল স্মারক হয়ে থাকুন, শুধু এইটুকু-ই আমার প্রার্থনা।

॥ পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

উৎসর্গ

শ্রী এন. হোসেন আলী

বেগম হোসেন আলী

অভিন্নহৃদয়েষু

সুহৃদ্‌বরেষু,

আমরা ভাবতে পারিনি, আপনি পাকিস্তান মিশনকে জয় বাংলা সরকারের মিশনে রূপান্তরিত করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। পৃথিবীতে আপনারা যে নজীর রাখলেন, তার কোন তুলনা নেই। আপনার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাকে স্মরণ-তীর্থ করে, এই গ্রন্থটি আপনাদের করকমলে উৎসর্গ করলাম।

জয় বাংলা

পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা

৭ই বৈশাখ

বিশ্বকবির সোনার বাংলা,
নজরুলের বাংলা দেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা,
রূপের তাহার নাইকো শেষ।
বাংলা দেশ ॥

শোনো একটি মুজিবরের কণ্ঠ হোতে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি,
আকাশে বাতাসে ঝড়ের বেগে ওঠে রণি।
বাংলা দেশ আমার বাংলা দেশ ॥

[মুজিবনগরে প্রজা-গণতন্ত্রী বাংলা
সরকারের শপথ গ্রহণের দিন এই গানটি গাওয়া

ঃ বক্তব্য ঃ

- ডাক দিলেন মুজিবর
- পাকিস্তান সৃষ্টির আদিকথা
- পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচন
- মোদের গরব মোদের আশা
- বর্তমান আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছেন
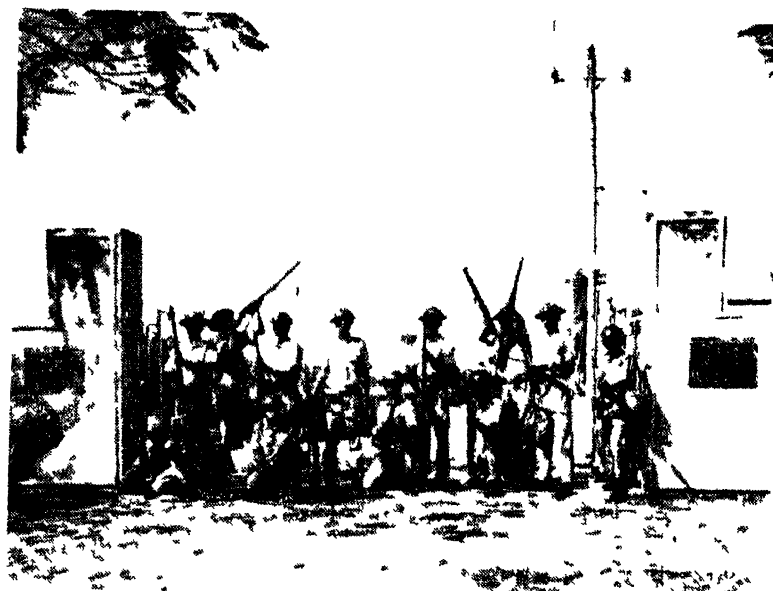
যুগান্তর

ডাক দিলেন মুজিবর

"আমি মুজিবর বলছি, হে বিশ্ববাসী, তোমরা শোন, আমি আজ বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।"......

ডাক দিলেন মুজিবর।

উনিশ শো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ, এই দিনটি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে শৃঙ্খল ভাঙ্গার এক ইতিহাস। বীর্য-দীপ্ত এ ইতিহাস, রক্তের আখরে, সোনার ফ্রেমে বাঁধানো হবে এই ইতিহাস, তার পাশে অক্ষয় অম্লান দ্যুতির মত শোভা পাবে হীরে-জহরৎ-মণি-মাণিক্য, আর তার মধ্যমণি হয়ে সূর্যের দীপ্তি ছড়াবেন শেখ মুজিবর রহমান। পূর্ববঙ্গকে যিনি পরিণত করেছেন সোনার বাংলায়, জয় বাংলায়।

অনেক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছি, বিপ্লবের অনেক গণ-অভ্যুত্থান দেখেছি, শুনেছি বিদ্রোহের অনেক সরব ও সোচ্চার বাণী। কিন্তু মুজিবরের ডাকের চেহাবা স্বতন্ত্র, খুশবাই তার ভিন্ন, আবেদন তার অন্য। এ তো শুধ্ আন্দোলন নয়, এ শুধ্ বিদ্রোহ নয়, এ শুধ্ বিপ্লবীদের বহ্নি-শিখা নয়। এর ডাক আরো গভীর, আরো তাৎপর্য পূর্ণ, আরো ঐতিহাসিক। কেননা, এ মানবতার জয়গান, এ মানব-মুক্তির উদ্বোধন সংগীত। এই মহামানবতার উদ্বোধন সংগীতে যোগ দেবার জন্য ডাক দিয়েছেন তিনি সকলকে। সভ্য দুনিয়ার তামাম নাগরিককে মুক্তির এই মহোৎসবে মাঙ্গলিক গাইতে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

উনিশ শো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ। স্বাধীন বাংলাব বেতাব কেন্দ্র। সেখান থেকে মুজিবর সাত কোটি বাঙালীব চিব আকাঙ্ক্ষিত আশাকে রূপ দিলেন ভাষায়, বললেন, "পূর্ববঙ্গকে আজ থেকে, এই শুভ-লগ্ন থেকে বাংলা নামে স্বাধীন সাবভৌম লোকতন্ত্রী বাষ্ট্রেব সিংহাসনে অভিষেক কবা হল।"

সেই সংগে সিংহনাদে গর্জে উঠলেন বঙ্গাল শেব মুজিবব, 'আমবা উচ্ছিষ্ট ভোগী কুকুব নই, বেড়াল নই। আমাদেব পবিচয়, আমবা মানুষ। মানুষেব মতই আমবা বাঁচতে চাই, বীবেব মত মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই, নিতে চাই আলো, নিতে চাই বাতাস, গাইতে চাই মুক্তিব সঙ্গীত। এ যদি না কবতে পাবি, আমবা বীবের মত মৃত্যু ববণ কববো। তাতে দুঃখ নেই, গোবব আছে। বাঙলা মায়েব সুযোগ্য সন্তান হিসেবে আত্ম-আহুতি দেওযাব চেয়ে বড় গৌবব আব কি হতে পাবে।' এই দিনই সন্ধ্যা সাতটায স্বাধীন বাংলাব বেতাব-কেন্দ্র থেকে গোটা বাংলাব জনগণেব উদ্দেশ্যে যে বেতাব ভাষণ শোনা গেল, তা জাতীব চিবকালেব স্মরণ-তীর্থ হযে থাকবে। অত্যন্ত জোরালো ভাষায ঘোষক বললেন:

"স্বাধীন বাংলা বেতাব কেন্দ্র থেকে আহ্বান শুনছেন।

স্বাধীন বাংলাব ভাই-বোনেবা 'আসসালাম আলেকুম'। মহান জননাযক বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিবব বহমান পূর্ববঙ্গেব স্বাধীনতা ঘোষণা কবেছেন। সাবা পূর্ববঙ্গে আজ মুক্তি সংগ্রাম। চিবাচবিত প্রথায পূর্ববঙ্গেব ধনসম্পদ লুণ্ঠন কববাব জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ কবতে না পেরে পশ্চিমাবা এখনও শোষণ অব্যাহত বাখতে চায। তাই সকল ন্যায নীতি বিসর্জন দিযে পৈশাচিকভাবে শক্তি প্রযোগেব মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালাকে সবপ্রকাব অধিকাব থেকে বঞ্চিত বাখতে বদ্ধপবিকব।

সমগ্র বাংলাদেশ সহ সমগ্র পৃথিবী আজ স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির এহেন জঘন্য প্রযোগ পৃথিবীব ইতিহাসে আব দ্বিতীয নজীব নেই।

আজ সারা দেশ সামরিক শক্তির দাপটে এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী জনসাধারণ তাঁদের উপরে আঘাত হেনে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।...ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায় স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার চক্রের দল প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় শত্রুবাহিনী শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। নানা স্থান থেকে সৈন্য এনে তারা তাদের শক্তিকে মজবুত করতে চাইছে। ই. পি. আর ও অন্যান্য শক্তি তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আমি মুক্তিপাগল কৃষক, শ্রমিক-ছাত্র জনতার নিকট আহ্বান জানাই—শত্রু সেনাদের মোকাবিলায় তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হানাদারদের যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিন। শত্রুসেনা শহরে প্রবেশ করতে চাইলে সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে মরিচের গুঁড়া, সোডা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিন। হাতবোমা নিক্ষেপ করুন। গ্রামের ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন, দলে দলে শহরমুখে অগ্রসর হোন এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট দখল করার কাজে লিপ্ত মুক্তি সেনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মুক্তি সেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সর্বপ্রকারে সাহায্য চালিয়ে আমাদের এই [illegible] আন্দোলনকে সফলকাম করে তুলুন।

বন্ধুগণ, আজকে সারা দেশের মানুষ উৎকণ্ঠায় পাগলের মত হয়ে উঠেছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরপরাধ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনগণের উপর ওরা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, দেখামাত্র গুলি করছে; হাজার হাজার মানুষ আজকে মৃত্যুবরণ করছে। এর নজীর বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তাই আমি সারা বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানাব, বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট আহ্বান জানাব,

আপনারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও চুপ করে থাকবেন না ; আসুন সাড়ে সাত কোটি এই পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের বাঁচাবার জন্য ; আপনারা আমাদের সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হোন। বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাই, আপনারা মানবতার খাতিরে, মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে, বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হোন! হে বিশ্বের অধিবাসী! তোমরা শোন, তোমরা শেখ, কিভাবে এই গণবিরোধী শক্তি, এই শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ, এই সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

• তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে আহ্বান জানাই, আপনারা চুপ করে থাকবেন না ; আসুন আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। বন্ধুগণ আমি, সারা বাংলার, স্বাধীন বাংলার জনগণের কাছে আহ্বান জানাব, বাঙালী ভাইয়েরা, আপনারা তুমুল সংগ্রামে নিজেদের শরিক করুন। এবং হানাদার দুষমনদের খতম করুন। যেখানে যে যে অবস্থায় আছেন, যাঁর হাতে যে অস্ত্র আছে সে অস্ত্র তুলে নিন। মা-বোন, বাপ-ভাইয়েরা বসে থাকবেন না। রাস্তায় বাহিব হোন এবং সুবিধামত স্থানে অবস্থান কবে, শত্রু সেনাদেব ঘায়েল করুন। মারাত্মকভাবে আঘাত হানুন, আঘাতের পর আঘাত হেনে বাংলাকে মুক্ত করুন। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়বে, এদিন আর সুদূর পরাহত নয়। পরিশেষে আমি জনগণকে আহ্বান জানাব, এই দেশ—এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নির্দেশে পরিচালিত হতে। অন্য কারো নির্দেশ বাঙালীরা কোন দিন বরদাস্ত করবে না, এবং কোন মারশাল ল' বাঙালীবা মানে না। আমি আহ্বান জানাব বাংলার নরনারী সকলের কাছে, আপনারা মারশাল ল' মানবেন না। মারশাল ল'-এর কোন আইনই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক, স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা! জয় স্বাধীন বাংলা!! জয় বাংলা!!!"

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক অভাবনীয় ব্যাপার। সপ্তকোটি কলকণ্ঠ বাঙালী এক সুর, এক ছন্দ ও একই গানে মুখরিত হয়ে উঠলো। তারা হয়ে উঠল এক মন, এক প্রাণ। কে আগে করিবে প্রাণ দান, তারই জন্য লেগে গেল কাড়াকাড়ি। একদিকে অতি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা, কামান, বারুদ, বিমানে সজ্জিত ইয়াহিয়ার জঙ্গী-বাহিনী অপরদিকে বাংলা দেশের মুক্তি পাগল মুজিবরের বীর জওয়ান, একমাত্র সম্বল যাদের সাহস আর অপরাজেয় মনোবল। মুজিবরের সেনাবাহিনীর হাতে নেইকো কোন অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা বারুদ, কামান, কিন্তু তবু তাঁরা বিপুল বিক্রমে, বিরাট উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে। তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যতদিন পর্যন্ত না আমরা পশ্চিমাদের নাগ পাশ থেকে পূর্ববঙ্গকে মুক্তি করতে পারি, ততদিন চলবে যুদ্ধ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। পশ্চিম পাকিস্থানের অনাচার, স্বৈরাচার এবং শাসন ও শোষণের যন্ত্র থেকে মুক্তি না পেলে নেই শান্তি, নেই সোয়াস্তি।

কিন্তু মুখে বলা আর কাজে করা, এর মধ্যে ফারাক যে অনেক। কঠিন কাজের জন্য চাই অসীম ধৈর্য্য, অশেষ ত্যাগ, অটুট মনোবল আর বিপুল বিক্রম। সে-সব বীর জওয়ানদের আছে পুরোমাত্রায়।

তাই পাকিস্তানের তখ্‌ত-এ-তাউস ইয়াহিয়া বেয়াদপদের রুখতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কম করে দশ হাজার সৈন্য নামালেন চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দরে। তাদের পাঠান হল ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোরের সেনা নিবাসে।

রাজপথে রাজপথে আরম্ভ হল জোর যুদ্ধ, প্রচণ্ড লড়াই। ঢাকা চট্টগ্রামের পথে পথে চলল মুক্তির লড়াই। একদিকে জঙ্গীশাহী জবরদস্ত সেনাবাহিনী, হাতে তাদের রাইফেল। অপরদিকে অপ্রত্যাশিত এই যুদ্ধে জওয়ানদের হাতে নেই কোন ভারী অস্ত্র-শস্ত্র।

কিন্তু, মনের বলে বলীয়ান হয়ে রণক্ষেত্রে যাঁরা নেমেছেন তাঁরা বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সুচ্যগ্র মেদিনী।

সারা দেশ সান্ধ্য আইনের কবলে। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে-ই বাংলা দেশের বিপ্লবী জনতা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায় রাস্তায়। হাতে তাদের নব রাষ্ট্রের নিশান, মুখে তাদের শৃঙ্খল ভাঙার গান। ফৌজ চলাচল ব্যবস্থা যাতে বিপর্যস্ত হয়, সেজন্য ভেঙে দিলে তারা পুল, ভেঙে দিলে রেল লাইন। ঢাকা বেতার কেন্দ্র মিলিটারীরা দখলদারী স্বত্ব কায়েম করে এই দিন সকাল সাতটা পনের মিনিটে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র বললেন, আমরা দখল করেছি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও দিনাজপুরের বিরাট এক অংশ।

এরই মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের প্রশাসক প্রধান জেনারেল টিক্কা খাঁ এক ষোলছড়ার ফতোয়া জারী করলেন। তিনি হুমকি দিয়ে বললেন "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সরকারী কর্মচারীরা কাজে যোগ দান করো, অন্যথায় যাবে তোমাদের গর্দান। বিচার করা হবে তোমাদের সামরিক আইনে।"

ষোল দফার সেই বয়ানে আরো আছে : কোন রকম রাজনৈতিক কার্য-কলাপ চলবে না। সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ। ব্যাঙ্কগুলির লেন-দেন থাকবে বন্ধ। আমানত, লকার, পুনরায় হুকুমনামা না দেওয়া পর্যন্ত নড়চড় করবে না।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, তামাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জ্বালিয়ে রাখতে হবে লাল বাতি। কোন সংবাদপত্র, পুস্তিকা, দেওয়াল-পত্র প্রকাশের আগে কর্তাদের কাছ থেকে সেন্সারের দস্তখৎ নিতে হবে। কর্তাদের যদি মর্জি হয় তবেই তার ছাড়পত্র মিলবে আত্মপ্রকাশের। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন মতামত বা সংবাদ প্রেরণ করা চলবে না। মুখে রাখতে হবে মুখোশ। এ-ছাড়া তাঁরা কেড়ে নিলেন সৈন্য, আধা সামরিক ও বাঙালী পুলিশ বাহিনীর

হাত থেকে অস্ত্র-শস্ত্র, করলেন তাঁরা তাঁদের নিরস্ত্র। এমন কি, আসাম পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হল বাঙালী প্রধান সৈন্যদের, তার জায়গায় বহাল করা হল-পাঞ্জাবের রাইফেল বাহিনীকে।

শুধু এই নয়, এই সঙ্গে এই ফতোয়া-ও দেওয়া হল, সে-সব লোকদের হাতে অর্থাৎ জিম্মায় আছে অস্ত্র, তাদের কাল-বিলম্ব না করে জমা দিতে হবে সেই সব অস্ত্র। যাঁরা সেই ফর্মান অগ্রাহ্য করবেন, তাঁদের জিন্দেগী করা হবে বরবাদ অথবা দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে তাদের করা হবে কয়েদ। অস্ত্র, লাঠি নিয়ে চলা-ফেরা ও পাঁচ জনের একত্র সমাহার, তাও করা হবে না বরদাস্ত।

এ-ছাড়া ঢাকার সর্বত্র জারী করা হল কার্ফু। কাউকে সেই আদেশ অমান্য করতে দেখলে মুহূর্তে-ই ঝলসে উঠবে রাইফেলের আগুন, স্তব্ধ করে দেওয়া হবে তার বে-চাল।

অর্থাৎ, এক কথায়, গণ-জীবনকে অচল, স্তব্ধ করে দেবার জন্য, সাধারণ নাগরিকের মুখের ভাষাকে বিদীর্ণ করে দেবার জন্য যা যা করা দরকার, তার চেয়েও লাখ গুণ বেশী আয়োজন করা হল। নাগরিকের যে বৈধ অধিকার, তার সবগুলোকে কেড়ে নেওয়া হল নির্মমভাবে। কেড়ে নেওয়া হল তার বাক্ স্বাধীনতা, কেড়ে নেওয়া হল তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, কেড়ে নেওয়া হল তার স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার ক্ষমতা, কেড়ে নেওয়া হল তার জনমত গঠন করবার স্বাধীনতা। সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে জনগণের হাতে রইলো আর কি?

কিন্তু কি কারণে এই সব বিরাট আয়োজন? জন-জীবন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক, জীবন কর্ম-মুখর ও চঞ্চল, তার জন্যেই কি এই ষোল দফার দামামা বাজানো হল?

করাচী রেডিও ও তাদের পোষ-মানা ঢাকা বেতার কেন্দ্র সাড়ম্বরে কিন্তু ঘোষণা করলো, অবস্থা সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। একটি

শিশুরও এই মিথ্যা ও নির্লজ্জ ব্যাভিচারে ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠবে। আর যাঁরা বুদ্ধির সাবালকত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা মিথ্যার এই সাজানো তুরুপের তাসকে অবলোকন করে, তারিফ করবেন সামরিক প্রশাসকদের, তাদের অপূর্ব এই নগ্ন মিথ্যাচারের। দিনকে রাত, আর রাতকে দিন বানানোর জন্য চতুরালির আশ্রয় নেওয়া দরকার, এ-কথা অস্বীকার করবে কে?

কিন্তু চালাকীর দ্বারা কোথায় কবে মহৎ কাজ হয়েছে? পৃথিবীর ইতিহাসে তার কি আছে কোন নিদর্শন? মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে ফ্যাসিজিম-এর রূপকার হিটলার তামাম দুনিয়ায় তাঁর একচ্ছত্র শাসন কায়েম করতে চেয়েছিলেন। হতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর একম্-অদ্বিতীয়ম ফুয়েরর।

কিন্তু ইতিহাস তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে। নিজের হাতেই নিজেকে খুঁড়তে হয়েছে তার কবর। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা মদমত্ত শাসকেরা ভেবেছেন, মিথ্যার জালিয়াতিতে তাঁরা করবেন বাজীমাৎ। দিনকে রাত বানানোর বাদশা গোয়েবল্‌সের প্রেতাত্মাও ঠোঁট টিপে হাসছে, নির্জলা মিথ্যার এই কসরৎ দেখে। তাঁর কুখ্যাতির রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন পাকিস্তানের বেইমানী ও শয়তানী প্রোপাগাণ্ডা। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এ-সব মিথ্যার বেসাতি বিশ্বের কোথাও বিকাচ্ছে না। গোয়েবলসের শিক্ষা তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে। এবার আর কোন মিথ্যার বুজরুকিতে ভোলবার মত দিল্‌দরিয়া মন তাঁদের নেই।

ছাব্বিশে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক ভাষণে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ অনেক নরম-গরম বাণী বিতরণ করলেন। সেই বাণীতে প্রথমেই 'যত নষ্টের গোড়া', 'নাটের গুরু' মুজিবরকে দাঁড় করিয়েছেন আসামীর কাঠগড়ায়, এনেছেন তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ। কিন্তু কি তাঁর কসুর? মুজিবর অপমান করেছেন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাকে! পাকিস্তানকে তিনি ভেঙে টুকরো

টুকরো করে দিতে চান! তাই তিনি · আর তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের শত্রু? তাহলে অবশ্য এই অপরাধের শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে।

এই শাস্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াহিয়া, বর্তমান পাকিস্তানের সর্বেসর্বা। আওয়ামী লীগকে পাকিস্থানের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করবার ফর্মান দিলেন, তাকে বে-আইনী ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন।

সেই গরম সুরকে নরম করে ইয়াহিয়া খাঁ আরো বললেন, পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া মাত্র তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে কার্যকরীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ব্যবস্থা নেবেন। শুধু তাঁর অনুরোধ, অবস্থা অনুধাবন করুন। আজকেব এই অবস্থার জন্য দায়ী : যাঁরা পাকিস্তান-বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাকামী।

তারপর আওরঙ্গজেবের ভাবে বিগলিত হয়ে তিনি তাঁর শেষ বক্তব্য রাখলেন : পাকিস্তানে ঐক্য, নিবাপত্তা ও অখণ্ডতা বজায় রাখা তাঁর পবিত্রতম কর্তব্য। তাই তিনি সেনাবাহিনীকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন : যখন যা দরকার তাই করবে। যে কোন উপায়ে সয়তানদেব শায়েস্তা করতে হবে।

কিন্তু এই শয়তান কারা? শেখ মুজিবর রহমান, তাঁর অনুগত অনুগামী ও তাঁর সমর্থকেরা? অর্থাৎ গোটা পূর্ব বাংলা! কেননা, এঁরাই নির্বাচিত করেছেন মুজিবব রহমান ও আওয়ামী লীগকে।

কিন্তু গোটা পূর্ব বাংলাকে ইয়াহিয়া ও তাঁর জঙ্গীবাহিনী শায়েস্তা করতে পারবে কি?

মুস্কিল হয়েছে, বেয়াড়া ইতিহাস যে অন্য কথা বলে। এর পরবর্তী কয়েক দিনেব ঘটনাপঞ্জী সে কথাই প্রমাণ কবছে।

এটা হল ছাব্বিশে মার্চের রোজনামচা। এর পরেব রোজনামচা কি? সেটাই পরবর্তী বক্তব্য

ইতিহাসেরও মার আছে। ইতিহাসও প্রতিশোধ নিতে জানে—অন্যায়ের, অত্যাচারের, বঞ্চনার। সেই কথা ভুলে গেছেন ইয়াহিয়া খাঁ।

সেই ইতিহাস যখন কথা বলে, তখন কোন শক্তি, কোন নিষ্পেষণ, কোন অমানুষিক অত্যাচার, বেয়নেটের নির্মম চাবুক তার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস করে না। যদিও দাঁড়ায়, তবে তার উদ্ধত ফণা মুহূর্তের দাবাগ্নিতে নিস্ফল আর্তনাদ করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে।

কিন্তু কে কাকে বলবে, ইতিহাসের সেই চূড়ান্ত, অপ্রতিরোধ্য অমোঘ ও অনিবার্য সত্যের কথা? আর বললেও তা শুনবে কেন পূর্ববঙ্গের বুকে চেপে বসা ক্ষমতা মদে-মত্ত সাহেন-শা ইয়াহিয়া খাঁ? তাই স্বপ্নের ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকা ইয়াহিয়া খাঁর এখনও চোখ খোলেনি, এখনও নিদের ঘোরে আঁখি তার ঢুলঢুল।

তাই নির্লজ্জ জঙ্গী নায়ক, পাশবিকতায়, মনুষ্যত্বহীনতায়, যিনি জল্লাদকে হার মানান স্বচ্ছন্দে, তিনি বুঝতে পারছেন না, ইতিহাসেরও চাবুক আছে। সেই চাবুক কখন, কিভাবে, কোন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে আর কিভাবেই না তার নির্মম প্রতিশোধের বাহু বিস্তার করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের দাঁহাপনা ক্ষমতা গর্বে স্ফীত হয়ে ইতিহাসের সেই অমোঘ চূড়ান্ত রায়কে মুহূর্তের ফুৎকারে নস্যাৎ করবেন কেমন করে? স্বীকার করুন অথবা নাই করুন, ইতিহাস নিজের নিয়মে চলে। তার বিজয়ের রথ চক্র এগিয়ে চলে উদয় দিগন্তের দিকে।

কিন্তু ইতিহাসের রাজপথ একদিনে তৈরী হয় না। তার বিজয়ের স্বর্ণ রথ একদিনেই সাফল্যের সোপানে উন্নীত হয় না। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ইতিহাসের শক্ত ভিৎ। জনগণ ধীরে ধীরে মোহ-মুক্ত হয়। অন্ধ সংস্কার—প্রচলিত বাধা-ধরা ছকে বাঁধা পথ সেই পথ যদি জনগণকে করে শোষণ, চালায় অন্যায় শাসন, করে অবিচার, বাড়ায় দারিদ্র্য-অনটন-ব্যাধি, তাহলে দীর্ঘ দিন অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যাভিচার চালিয়ে যেতে পারে না। তার মধ্যে সৃষ্টির নতুন যুগের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে থাকে, যার মধ্যে গজিয়ে ওঠে নতুন পাতা, সবুজ কিশলয়। যতই শক্ত হবে নিষ্পেষণ যন্ত্র, যতই নির্মম হবে বেয়নেটের ক্রুদ্ধ আস্ফালন, যতই চলবে পাশবিক

অত্যাচার, যতই ভরে উঠবে কারাগারের বৃহৎ প্রকোষ্ঠ, যতই বন্দুকের নল আকাশে বাতাসে রণ দামামা বাজাবে, তখনই বুঝতে হবে ইতিহাসের এক অধ্যায় বিলীন হবার জন্য প্রস্তুত. সে এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনই বুঝতে হবে, অন্ধকার কেটে গিয়ে নূতন যুগের অরুণোদয়ের স্বর্গ মঞ্চের অভিষেক-উৎসবে মিলিত হচ্ছি সবাই।

অতএব, ক্ষতি কি অত্যাচার যদি প্রবল হয়, শাসন-যন্ত্র যদি সবল হয়, বেয়নেটের চাবুক যদি কড়া হয়, বুলেট যদি অজস্র রক্তপাত ঘটায় তো ক্ষতি কি? রক্তপাত? আত্মলাঞ্ছনা? আত্মনিপীড়ন? হাসালে তুমি মোরে।

দরকার তো এ সবেরই। যত দরকার তুমি নাও। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরকে ভয় করবো? বুক পেতে দিয়েছি, কিন্তু মাথা পাতি নি, হাত রেখেছি ইস্পাতের মত সবল, মেরুদণ্ডকে রেখেছি হিমালয়ের মত খাড়া।

অতএব রক্তের হোলি উৎসবে, নারকীয় উল্লাসের ব্যাভিচারে দিল্ যদি তোমার খুস হয়, নাও তবে টগবগে বুকের তাজা তপ্ত রক্ত, করো শোণিতপাত। আমরা সৌখিন মজদুরী করতে আসি নি। আমরা এসেছি নিজেদের আত্মপ্রকাশের, যা জল ও বাতাসের মত, আলো ও সূর্যের মত প্রাণধারণের জন্য অপরিহার্য, তাই প্রতিষ্ঠা করতে, নিজেদের আজাদীকে অম্লান ও অক্ষুণ্ণ রাখতে; তার জন্য দরকার হয় রক্তের, তাই দেবো, দরকার হয় প্রাণের তাও দেবো, দরকার হয় আত্মলাঞ্ছনা সেও সহ্য করবো!

কিন্তু কে এই মুজিবর রহমান? যিনি গোটা বাংলার হৃৎপিণ্ডকে একই সুরের ঐকতানে বেঁধে দিয়েছেন, কি তাঁর পরিচয়? জন-গণ-মন অধিনায়ক সোনার বাংলার মুকুটহীন সম্রাটের কি পরিচয়? তাঁর আজকের মুকুটহীন সম্রাট (মুকুটহীন সম্রাটও তাকে বলবো কেন, জনগণই তাঁর মুকুট, তাঁরাই তাঁকে করেছেন সম্রাট) হবার পেছনে আছে ইতিহাস, আছে সংগ্রাম, আছে অকুতোভয় সাহস।

একদিনে শুধু একটি মাত্র কারণে গোটা বাংলার জনগণের হৃদয় মন জয় করা, তা শুধু আকাশ কুসুম কল্পনায় সম্ভব, বাস্তবে নয়। জনগণের করতে হবে ভালো, দুঃখ-দারিদ্র-যন্ত্রণায় হতে হবে এক মন, এক প্রাণ। বিনা স্বার্থ ত্যাগে, বিনা কষ্ট স্বীকারে, বিনা আত্ম-লাঞ্ছনায় আসে না কিছুই; জনগণকে কিছু দিতে হবে, তবেই জনগণ তোমাকে দেবে অনেক কিছু। দেবে শ্রদ্ধা, দেবে ভালোবাসা, দেবে তোমার জন্য জান, খুন কবুল করতেও হবে না অনুমাত্র পিছপা।

নাতিদীর্ঘ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, উন্নতনাসা মুজিবরেরও এই স্বতঃস্ফূর্ত গণ সমর্থন পাওয়ার পিছনে আছে সেই স্বার্থত্যাগ, নির্যাতন ও কষ্ট বরণের বিরাট এক দলিল। কখনো তিনি থেকেছেন পুরোভাগে, কখনো থেকেছেন শেষভাগে, কখনো থেকেছেন ডাইনে, কখনো বাঁয়ে। যেখানে আছেন জনগণ, সেখানেই আছেন তিনি, যেখানে আছে সংগ্রাম, সেখানেই আছে তিনি, যেখানে আছে যন্ত্রণা, সেখানেই আছেন তিনি, যেখানে আছে হৃত-সর্বস্ব মানুষের আর্তনাদ, সেখানেই আছেন তিনি। তিনি আছেন ভোরের ফুটে ওঠা স্নিগ্ধ আলোর মত, বাধাহীন বাতাসের মত, প্রাণ ধারণের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত। "যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, আমি সেই দিন হবো শান্ত"— এই হল মুজিবরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। চোখের কোণে বিদ্যুৎ দীপ্তির মত বুদ্ধির জ্যোতি ঝলমল করছে, সুউন্নত ললাটে বরাভয়ের স্নিগ্ধ প্রসন্নতা, চিবুকে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কাঠিন্যের ইঙ্গিত।

এই মুজিবর রহমান মায়ের কোল আলো করেছিলেন উনিশ শো কুড়ি সালের সতেরই মার্চ। পূর্ব দিগন্তে তখন উদয় সূর্যের অম্লান আলো। যে জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার নাম ফরিদপুর আর টাঙ্গিপাড়া হল গ্রাম। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান। তিনি আদালতে চাকরী করতেন সেরেস্তাদারের। তাঁদের পরিবারে আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল, অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলে মধ্যবিত্ত, তাই ছিল তাঁদের পরিবার।

মুজিবর পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। এছাড়া মুজিবরের আছে চার বোন, এক ভাই। বয়স যখন তাঁর সাত, তখন হল তাঁর হাতে খড়ি, পাঠানো হল তাঁকে গোপালগঞ্জে স্কুলের জীবন-পরিক্রমা সমাপ্ত করতে। লেখাপড়ায় চিরদিনই তিনি ছিলেন ভালো, পরীক্ষায় পাসের রেকর্ডও অগৌরবের নয়। আর কোন দিকে নয়, পড়বো ইতিহাস, জানবো পৃথিবীর গতি প্রকৃতি, এই ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস, চোখ হল তাঁর খারাপ। ডাক্তার হুকুম দিলেন, লেখাপড়া সব আপাতত শিকেয় তোল। ডাক্তারের নির্দেশ, তাও চোখের মত একটা মহামূল্য সম্পদ, অতএব, পড়াশুনা রইলো বন্ধ।

কেটে গেল কয়েকটা বছর। কিন্তু পড়াশুনার প্রতি প্রবল ঝোঁক, তাঁকে রাখতে পারলো না কেউ নিষেধের কারা-প্রাচীরে। তিন বছর পর আবার তিনি ভর্তি হলেন স্কুলে, সেই তাঁর আগেকার স্কুল গোপালপুরে। প্রমোসন পেলেন ক্লাস এইটে। কিন্তু এই সময়েই ঘটলো এক স্মরণীয় অধ্যায়। রাজনৈতিক জগতে প্রবেশের সেই বোধহয় প্রথম ছাড়পত্র। একটি জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন, এই তাঁর অপরাধ। অতএব, ভোগ করো কারাদণ্ড, মাথা পেতে নিলেন রাজদণ্ড। মাত্র সাতদিনের জেল জীবন দিলো তাঁকে এক অদ্ভুত জগতের স্বাদ।

ঊনিশ শো বিয়াল্লিশ সাল। গোপালপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেট পরীক্ষায় তিনি হলেন উত্তীর্ণ। এবার তিনি বাছলেন পথ, এলেন কলকাতায়। উচ্চতর শিক্ষায় অন্তরকে তিনি করবেন উদ্ভাসিত। তাই এ্যাডমিশন নিলেন তিনি বর্তমানের মৌলানা আজাদ কলেজ ও অতীতের ইসলামিয়া কলেজে। শুরু হল আই-এ পড়া, রইলেন বেকার হোস্টেলে।

সুরাবর্দি তখন বাংলার রাজনীতিতে বিরাট এক নক্ষত্র। ঘটনাচক্রে হল তাঁর সঙ্গে আলাপ, চলালো নিরবে নিভৃতে কত আলোচনা।

তারপরেই তিনি হলেন একটি প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য ও সক্রিয় কর্মী। প্রতিষ্ঠানটির নাম নিখিল ভারত মুসলীম স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন। ইত্যবসরে ইসলামিয়া কলেজ থেকে পাস করলেন মুজিবর বি, এ। সেদিন ছিল উনিশ শো সাতচল্লিশ সাল, পাকিস্তান পায়দা হবার বছর। মুজিবর কলকাতা থেকে এলেন ঢাকা। উদ্দেশ্য, পড়বেন তিনি আইন। এ্যাডমিশন নিলেন য়্যুনিভারসিটিতে। কিন্তু রাজনীতির তাজা রক্ত তাঁর হাড়ে-মজ্জায় বাসা বেঁধেছে। অতএব আইন রইল পড়ে, ক্লাশ রইলো দূরে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি রাজনীতির আসরে, এলেন রঙ্গমঞ্চে। কেতাবী পড়া-শুনার সেখানেই ইতি, এবার আরম্ভ হল রাজনীতির পাঠ, অভিজ্ঞতা করতে লাগলেন অর্জন। পাকিস্তানের কর্ণধার-চক্র কেমন করে কারবার চালাচ্ছেন, তা মুজিবরের হতে লাগলো মালুম। যে ভাষা প্রাণের ভাষা, যে ভাষা ভালোবাসার ভাষা, যাকে বাদ দিলে পূর্ববঙ্গ হয়ে যাবে ফকীর, সেই ভাষার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান দেখালো অনাদর, করলো উপেক্ষা। তখন যুবক মুজিবর গর্জে উঠলেন, এই চক্রান্ত তোমাদের চলবে না। প্রাণ দেবো, রক্ত দেবো, তবু মাতৃ-ভাষার অপমান বরদাস্ত করবো না। বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। যতদিন বাঙালী আছে, যতদিন বাঙালী থাকবে, যতদিন আকাশে উঠবে চন্দ্র সূর্য তারকা, ততদিন কেউ মাতৃ ভাষা বাঙলাকে কেড়ে নিতে পারবে না পূর্ববঙ্গের কোল থেকে।

উনিশ শো আটচল্লিশ, শুরু হল ভাষা আন্দোলন। তৈরী হল সংগ্রামের পটভূমি, ভাষার রাজপথে দাঁড়িয়ে তারা নেবেন আলো, নেবেন বাতাস, নেবেন শ্বাস-প্রশ্বাস। সেই বছরে এগারোই সেপ্টেম্বর, হলেন তিনি কারারুদ্ধ। রাখা হল তাঁকে কয়েদ খানায়, রইলেন তিনি ছ'দিন।

এলো সেই স্বর্ণ রাঙা দিনটি। একদিকে উদ্ধত বেয়নেটের ক্রুদ্ধ আস্ফালন, অন্য দিকে বারুদের ফুলকি।

ঢাকার রাজপথ উনিশটি তাজা প্রাণের তপ্ত রুধিরে হল লালে লাল। শেখ মুজিবর এসে দাঁড়ালেন আন্দোলনের প্রথম সারিতে।

উনিশ শো চুয়ান্ন সাল, গঠিত হল ফজলুল হক মন্ত্রীসভা। টগবগে প্রাণ নিয়ে, চোখে নতুন যুগের আশা নিয়ে, চিবুকে সাহসের দৃঢ় বনিয়াদ নিয়ে, হক মন্ত্রীসভায় যোগদান করলেন মুজিবর, হলেন তিনি বাণিজ্য মন্ত্রী। ভিতরে ভিতরে মুসলীম লীগ চালাতে লাগলেন ষড়যন্ত্র। নারায়ণগঞ্জের আদমজী মিলে ঘটানো হল বাঙালী অবাঙালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জ্বালানো হল আগুন। ফজলুল হকের নির্দেশে মুজিবর ছুটলেন সেখানে, নেভালেন আগুন। সরেজমিনে তদন্ত করে দিলেন রিপোর্ট। সেদিন মুজিবর ছুটে না গেলে জ্বলতো আরো আগুন, পুড়তো অনেক ঘর-বাড়ি, জান যেতো অসংখ্য নিরীহ মানুষের। কিন্তু মুজিবরের অদ্ভুত দূরদর্শিতা, নেতৃত্বের অসাধারণ ক্ষমতা, সর্বোপরি উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি আনলো শান্তি, রক্ষা পেল নিরীহদের ধন-জান-মান।

কিন্তু মুসলীম লীগের প্রেতাত্মা তখনো ঘুরছিল আকাশে বাতাসে, বপন করছিল ঘৃণা-বিদ্বেষ-হানাহানির কুটিল রাজনীতি। ওই বছর-ই মিথ্যা ছলনার চক্রান্তে করা হল হকের মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত। দিনটি ছিল তিরিশে মে, বছরটি ছিল উনিশ শো চুয়ান্ন। কায়েম করা হল সেখানে গভর্নরী শাসন, কয়েদ করা হল মুজিবরকে।

আবার উঠলো কয়েদ খানার দরজা। মুক্ত করা হল মুজিবরকে। যোগ দিলেন তিনি আতাউর রহমানের মন্ত্রীসভায়। উনিশ শো পঞ্চান্ন সালে গেলেন তিনি পিকিং, করলেন নেতৃত্ব। চীন সফর হল সমাপ্ত। মুজিবরের দৃষ্টি এখন অন্য দিকে, মন্ত্রীত্ব করলে থাকবে না জনগণ, বপন করা যাবে না সংগ্রামের বীজ। মন্ত্রীত্ব দখল তো তাঁর লক্ষ্য নয়, আদর্শ তাঁর অন্য। সংগ্রাম তাঁর ভিন্ন। ছেঁড়া কাঁথার মত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মন্ত্রীত্বের দখলদারী সত্ত্ব। আওয়ামী

লীগকে দেবেন তিনি শক্তি, চলে এলেন তাঁর দলীয় সংগঠনে। হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

উনিশ শো পঞ্চান্ন সাল, হেথা নয়, হোথা নয় বঙ্গবন্ধু এলেন ভারত তীর্থ পরিক্রমায়। নিয়ে এলেন শুভেচ্ছার বাণী, করলেন হৃদয়ের অর্ঘ্য বিনিময়। বললেন, 'ভারতকে ভুলিনি, ভুলবো না। ভারতের প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আমার চলার পথের মাঙ্গলিক।'

উনিশ শো আটান্ন সাল, পিণ্ডির ক্ষমতার তখ্‌তে এলেন ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁন। জবরদস্ত শাসক এবার দেখবেন, পূর্ববঙ্গের বুকে কত রক্ত কত সংগ্রামের বাসনা। তাই প্রথমেই পূর্ববঙ্গের শেরকে পুরতে হবে খাঁচায়। সর্বনাশের আগুনকে আগে কয়েদ খানায় না পুরলে নেই শান্তি, নেই চোখে ঘুম।

বারো-ই অক্টোবরের উনিশ শো আটান্ন সাল, এলো পূর্বপাকিস্তানের নিরাপত্তা অর্ডিন্যানস্, বিস্তার করলো বাহু, নিয়ে এলো মুজিবরকে কয়েদ খানায়। বিনা বিচারে রাখা হলো তাঁকে দেড় বছর কয়েদ খানায়। দেখতে দেওয়া হল না আকাশ, নিতে দেওয়া হল না মুক্ত বাতাস। শুধু তাঁর সঙ্গে রইলেন আল্লা আর কোরান। তারপর আনা হল অভিযোগ, করা হল ফৌজদারী মামলা রুজু। অপরাধের ফিরিস্তি ছ'টি। কিন্তু হল না কিছু প্রমাণ, বিচারের নামে রাখা হল তাঁকে বিনা কারণে কারাগারে। এরপর হলেন তিনি বেকসুর খালাস। কিন্তু কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত রইলেন সাদা পোষাকের পুলিশ, তাঁর গতির সঙ্গে বিধিকে করা হল নিয়ন্ত্রণ।

জেলের পর জেল, অত্যাচারের পর অত্যাচারের উদ্ধত মুষ্টি। গভর্ণর মোনেম খাঁ তাঁর শক্তির দম্ভোক্তি করলেন মুজিবর বন্দনা করে, 'আমি যতদিন আছি এবং থাকবো ক্ষমতার মনসদে, মুজিবরের ভাগ্য ললাট ততদিন নিয়ন্ত্রণ করবো আমি। আমি দেবো তাকে কারাগারের স্বাদ।'

দেশকে শাসন ও শোষণের মুষ্টি যন্ত্র থেকে মুক্তি দেওয়া, আর স্বায়ত্ত শাসনের চাবি-কাটি আদায় করা হল যাঁর জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ; ত্যাগ, সংগ্রাম, কষ্টবরণ ও নির্যাতন সহ্য যাঁর জীবনের ব্রত তাঁকে করা হল দেশদ্রোহী। কিন্তু কি করে, তার পিছনের যুক্তি কি? কোন যুক্তি নেই, আছে শুধু মিথ্যার অভিযোগ, শয়তানী। মুজিবরকে করা হল আসামী, আনা হলো কাঠগড়ায়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিনি হলেন প্রধান পুরোহিত, ষড়যন্ত্রের তিনি-ই উচ্চারণ করেছেন মন্ত্র, করেছেন মাঙ্গলিক—এই ছিল জঙ্গীশাহীর বক্তব্য।

এই মন্ত্রোচারণের মাঙ্গলিক আসরে হাজির ছিলেন পঁয়ত্রিশ জন ব্যক্তি, নিয়েছেন তাঁরা মন্ত্রপাঠ, করেছেন শপথ। কিন্তু ছিল কি এঁদের মন্ত্র? কি ছিল এঁদের শপথ? পূর্বঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন এই ছিল মন্ত্র ও শপথ, ওঁদেব এই মন্ত্রণাকক্ষের প্রহরী হয়েছিলেন ভারত। জুগিয়েছেন তাঁরা মদৎ, দিয়েছেন অস্ত্র শস্ত্র, দিয়েছেন গোলা বারুদ। তাই দুজন হিন্দু ও তিনজন সি, এস, পি অফিসারকে এই ষড়যন্ত্রেব সংগে মোহব্বৎ করার জন্য করা হল গ্রেফ্তার।

মিথ্যের এই ষডযন্ত্রে সাজানো হল যাঁদের, তাঁদের মুক্তির জন্য অধীর হয়ে উঠলেন পূর্বঙ্গ। হলেন অধীর ছাত্র-যুবক-বৃদ্ধ, হলেন অধীর কৃষক, মজুব ও সাধারণ মেহনতী মানুষের দল। সকলেই করলেন প্রতিবাদ, বার করলেন মিছিল, গেল ডেপুটেশন।

সেই আন্দোলনের চাপে অবশেষে আয়ুবশাহী চক্রান্ত ব্যর্থ হল, গুনলো প্রমদ, হল দিশাহারা, করলো নত মস্তক। উনিশে জানুয়ারীর উনিশ শো একষট্টি সাল, বীর যোদ্ধা মুজিবর বেরিয়ে এলেন কয়েদখানাব প্রকোষ্ঠ থেকে। বাইরে তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জমায়েৎ হয়েছিল শুধু মানুষের মিছিল। যাঁরা তাঁকে এতো ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, দেয় প্রীতির আসন, তাঁদেরকে আলিঙ্গন করে তাঁর মুখ হয়ে উঠলো আলো, চোখের কোণ হয়ে উঠলো অশ্রু-সজল।

জনগণ দিলেন তাঁকে এক সম্বর্ধনা। সেই গণ-সম্বর্ধনার রূপ শুধু চেয়ে দেখার মত, আর মনের পটে অবিস্মরণীয় পাতায় অক্ষয় করে রাখবার মত। ক্ষমতার তক্‌তে বসা, প্রতিটি মুহূর্তে কড়া পাহারায় বন্দী জীবনযাপন করা শাহেন-শা-রা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। শুধু কালো মাথার সারি, শুধু মিছিলে মিছিল, শুধু সমুদ্রের মত আছড়ে পড়া জনসমুদ্রের ঢেউয়ের তুমুল উচ্ছাস। যথার্থ দেশদ্রোহী না হলে মুজিবর এমন গণ-সম্বর্ধনা পাবেন কি করে! আর যাঁরা মুকুটহীন সম্রাটকে দিতে এসেছেন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, তাঁরাও আলবৎ দেশদ্রোহী! কিন্তু সেই দেশদ্রোহীদের সংখ্যা কত? তা গোনা চলে না, হিসেব-নিকেশ করা চলে না, কারণ তা সংখ্যাতীত, অসংখ্য, খুব কম করে হলেও, অনুমান করা চলে দশ লক্ষ লোকের সমাবেশ। ঢাকার ইতিহাসে এমন উত্তাল করা স্বতঃস্ফূর্ত সামুদ্রিক গণ-সম্বর্ধনা আর কখনো জুটেনি কোন বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর ললাটে।

অবস্থা বেগতিক দেখে চোখ খুললো শায়েন-শা-র। চোখ হল তাঁদের ছানা-বড়া। বলে কি, যাকে সাজানো হল দেশদ্রোহী, বলা হল ভারতের গুপ্তচর, যে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল পূর্ব বাংলাকে, তার জন্য এত লোকের এত দরদ, তার জন্যে সর্বসাধারণ দিচ্ছে মান, দিচ্ছে জান! অদ্ভুত! ষড়যন্ত্রের সব উদ্দেশ্য হয়ে গেল ফাঁস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহবুদ্দিনকে কড়া নির্দেশ দিলেন ফিল্ড মার্শাল আয়ুব, ছোট ঢাকায়, মুজিবরকে দাও আদাব, বল পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আয়ুব খান চান তোমার সংগে দোস্তী, করতে চান মোলাকাৎ।

যিনি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন, করতে চেয়েছেন দেশদ্রোহীর সংগে দোস্তি, তখন তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া কর্তব্য, এই হল মুজিবরের যুক্তি। কিন্তু আয়ুব যদিও প্রকাশ্যে মুখ করলেন আলো, অপ্রকাশ্যে বুক রাখলেন কালো। কিন্তু উপায় নেই। এই বেগতিক অবস্থা থেকে তাঁকে একমাত্র মুক্তি দিতে পারেন দেশদ্রোহী মুজিবর। অতএব

জোর করে ঠোঁটের কোণে আনলেন হাসি, করলেন বিগলিত অভ্যর্থনা। বললেন, "দেশের কথা ভাবলে রাতে নিদ আসে না তাঁর, দিনের বেলা থাকে না কোন সোয়াস্তি। দোস্ত, আপনি একবাব বেতাব ভাষণ দিন, তাতে আমার প্রতি করা হবে বহুৎ মেহেরবাণী।"

মুজিবর বললেন, "তুমি যখন ডেকেছো আমাকে দোস্ত বলে, কবতে চেয়েছ জনগণের কল্যাণ, তখন সাহায্য করবো বৈকি। কিন্তু তাব আগে কথা দাও, কববে না তুমি জনগণেব সংগে বেইমানী, হবে সৎ, হবে দবদী।"

"তোবা, তোবা। খোদার কসম খেয়ে বলছি, আর কখনো আমি হবো না [illegible]ন। হাতের কাছে এই নিচ্ছি কোর-আন্, করছি শপথ।"

ঢাকা তখন গণ-বিক্ষোভে উত্তাল। আয়ূবের বিরুদ্ধে তাঁদের হাত মুষ্টিবদ্ধ, কণ্ঠে তাদেব ঘুম ভাঙার গান। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণেব নিষ্পেষণ যন্ত্র থেকে জনগণ চায় মুক্তি, চায় নিস্তার। বিদ্রোহেব সেই জণ-জাগবণে—

"করাচীর প্রাসাদ কূটে
হোথা বাব বার শাহজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে।"

তাই আয়ূবেব এই দোস্তি, তাই এই শপথ। একমাত্র মুজিবরই পারেন তাঁকে অভেদ্য দুর্গেব মধ্যে অক্ষত রাখতে।

ভদ্রলোকের এক কথা। মুজিবব বাৎ দিয়েছেন, করেছেন অঙ্গীকাব। তাই তিনি বিদ্রোহী জনগণকে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে দিলেন আদেশ, "তামাম বাংলার ভায়েরা, তোমরা অশান্ত হয়ো না, শান্ত থাকো। আয়ুব কথা দিয়েছেন, আমাদের দাবী তিনি বিচাব কববেন, করবেন বিবেচনা। জনগণকে উৎপীড়ন করবেন না, কববেন না অত্যাচাব। ভদ্রলোক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অতএব, আমরাও ভদ্র। তাই আমরা বিশ্বাস কবি ও বিশ্বাস রাখি মহমান্য প্রেসিডেন্ট তাঁর কথা রাখবেন।"

তাঁর তো কথা নয়, যেন বাণী, নয় বাণী, যেন মন্ত্র। সেই

মন্ত্রোচ্চারণের স্তব-গাথায় জনগণ হলেন নিশ্চুপ, হলেন স্তব্ধ। সমস্ত প্রতিবাদের ভাষা মুজিবরের কথায় হল নিঃশব্দ।

কিন্তু আয়ুব রেখেছিলেন কি তাঁর কথা, পালন করেছিলেন কি তাঁর প্রতিশ্রুতি? আলবৎ নয়। তিনি যে ভদ্র, তিনি যে ফিল্ড মার্শাল, তিনি যে পাকিস্তানের তখ্‌তে বসা সর্বেসর্বা, তাঁর কি সাজে কথার মান রাখা, প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার পালন করা?

দেশদ্রোহীরই সাজে, মানীর মান রাখা, ভদ্র কথায় ভদ্র থাকা। কিন্তু তা কাঁহাতক? ধৈর্য্যেরও আছে সীমা, ভদ্রতারও আছে নির্দিষ্ট ভৌগলিক রেখা, সেই সীমার গণ্ডী পেরুলেই, রক্তে লাগবে সর্বনাশের নেশা।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতির খোয়াবে জনগণ হয়ে উঠলেন ক্ষিপ্ত, হাতের পেশী হয়ে উঠলো সবল, মুখের ভাষা হয়ে উঠলো সোচ্চার। জনগণ নামলেন আবার পথে, আরম্ভ করলেন গণ-সংগ্রাম। এবার আর মিথ্যার স্তোকবাক্যে মানুষ হবে না বিভ্রান্ত। মানুষকে বিশ্বাস করা চলে একবার, বড় জোর দুবার, শেষ তিনবার। কিন্তু তারপরেও যারা বিশ্বাস করে, তাদের বলতে হবে বেয়াকুব, মস্তিষ্ক যন্ত্রটি তাদের অচল. অথবা তারা বাস করছে মূর্খের বেহেস্তে।

কাজেই মোহ এবার হল ভঙ্গ, হাতের পাঞ্জা হল শক্ত। শত্রুর বিরুদ্ধে করতে হবে লড়াই। আন্দোলনের পর আন্দোলন, লড়াই-এর পর লড়াই, সংগ্রামের পর সংগ্রাম, আত্মত্যাগের পর আত্মবিসর্জন। দাবী আদায়-এর কতগুলো আছে অস্ত্র, একে একে সবগুলোকে নামানো হল কাজে।

আয়ুব পড়লেন মহা ফাঁপরে। কি করেন, কি করেন, কেমন করে রাখেন জান, রাখেন মান। বে-ইজ্জতের একশেষে আর কি! ভদ্রলোকদের সামনে মুখ বার করেন, সে উপায়ও নেই। ক্রোধে, ক্ষোভে, আক্রোশে ওরা ফুটছে যেন টগবগ করে। জবরদস্ত ফিল্ড মার্শাল আয়ুবও বুঝলেন, হাওয়া খুব সুবিধের নয়। এই হাওয়ায় নিশ্বাস নিলে তাঁর প্রাণ নিয়েও হতে পারে টানাটানি। এমনই এই হাওয়া সংক্রামক!

অতএব, দরকার নেই, জানে-মানে সরে পড়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বেয়নেটের চাবুকে আর বাগে আনা যাবে না জনসাধারণকে। কারণ, পিঠে অনেক পড়েছে তাদের বেয়নেটের চাবুক, পিঠ তাই হয়ে গেছে শক্ত, হয়ে উঠেছে অভ্যস্ত।

অতএব, হাত ধরে নিয়ে চলো সখা আমাকে রাজনৈতিক বাণপ্রস্থে। বাকী জীবনটা খোদাতাল্লাব নাম করেই কাটিয়ে দেবো। খোদাতাল্লার নাম উচ্চারণ করবাব এতদিন ফুরসৎ ছিল কোথায়! এবাব আল্লা, এসেছি তোমাব দববাবে, অনেক পাপ করেছি, অনেক কবেছি অকাজে কুকাজ, তাব কি কোন মাফ হবে না খুদা?

ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের বাণপ্রস্থ গ্রহণ করার দিনটি ছিল উনিশ শো উনসত্তর সালেব পঁচিশে মার্চ।

আয়ুবতন্ত্রকে সাড়ম্বরে বিদায় কববাব জন্য প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ ভাবে যিনি সর্বাধিক দায়ী হয়ে রইলেন, তিনি হলেন শেখ মুজিবর রহমান।

সবে গেল ছায়া, বয়ে গেল কাযা। আয়ুব চলে গেলেন, কিন্তু এবার বাজনৈতিক বঙ্গ-মঞ্চে আসব জমালেন ইয়াহিয়া খাঁ। আয়ুবেব-ই যিনি নবসংস্করণ, ফারাক শুধু পয়সার এ-পিঠ আর ও পিঠ।

কাজেই তাঁব আবির্ভাবে হল না কিছু ফায়দা। আসল যে সমস্যা, তা সে রয়ে গেল যে তিমিবে সেই তিমিরেই। হল না কোন সূর্যোদয়, পেল না কোন আশাব সংকেত।

যে মুজিবরকে লড়তে হয়েছিল, পাঞ্জা কষতে হয়েছিল আয়ুবের সংগে, তাঁকেই আবাব লড়তে হচ্ছে ইয়াহিয়ার সংগে। হচ্ছে, হয়েছে এবং হবে।

ইয়াহিয়ার সংগে পাঞ্জা লড়াই-এর ইতিহাস আলোচনা করেছি এর আগের অধ্যায়ে, এবং আবো করবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

মুজিবর-জীবনের এই হল সংক্ষিপ্তসার। শুধু কয়েকটি টানা হয়েছে আঁচড়, ঠিক মত লিখতে গেলে হবে বিরাট এক মহাভারত।

*　　*　　*　　*

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন কি অভিশাপ না আশীর্বাদ ? হিন্দুস্তানে যখন প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল, পাকিস্তানের শাসকেরা তখন নির্বাচনের কথা ভাবতেই পারেন নি। আবার যখন অনেক রক্তের বিনিময়ে জনগণ লাভ করলেন ভোটাধিকারের ক্ষমতা, তা-ও আবার ছ'মাসের বেশী টিকতে পারলো না।

ইস্কান্দার মির্জার পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মার্শাল আয়ব খাঁ, তাঁর নয়া উদ্ভাবিত নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র মারফত পাকিস্তানে একটি নির্বাচনের প্রহসন করলেন। তার-ও ললাটে কি জুটেছিল, পাকিস্তান ঘটনাপঞ্জীর ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা জানেন।

শেষ পর্যন্ত ফিল্ড মার্শাল আয়ব বিদায় নিতে বাধ্য হলেন, এলেন আরেক জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়া খাঁ। তাঁর সুর নরম, তবে বুকের রক্ত গরম। ভালো কথার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে বৈষ্ণব সেজে তিনি এলেন তখ্‌তে, ডাকলেন সংবাদিক বৈঠক। জমানা বদলিয়ে অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে না জড়ালে, দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই, তারা রটাবে অনেক কথা, ছড়াবে অনেক গুজব বাইরে বৈষ্ণব বিনতা থাকলেই হল, আলো না কালো, গণতন্ত্র না একনায়কতন্ত্র, রাইফেল না সাঁজোয়া, তা কে দেখতে পাচ্ছে !

ক্ষমতার মসনদে এসে খাঁ সাহেব প্রথমেই শোনালেন সেই বৈষ্ণবী স্তোত্র : জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে তিনি ক্ষমতা তুলে দেবেন। সেই নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা-ই রচনা করবেন

পাক-গঠনতন্ত্র অর্থাৎ সংবিধান। যে সংবিধান ভারতবর্ষে প্রায় দু' যুগ আগে, স্বাধীনতার পরই রচিত হয়েছিল, তাই রচনা করতে এখন পর্যন্ত পারলেন না পাকিস্তানের উজিরে আজমেরা। কেননা, গণপ্রতিনিধি তাঁরা খুঁজে পান নি। গত তিরিশ বছরের মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতির মর্যাদাকে-ও তাঁরা যথাযোগ্য মর্যাদায় কুর্নিশ্ করেন নি।

দেখা যাক, এবারে ইয়াহিয়া খাঁনের দল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কবে হবে সেই বহু প্রত্যাশিত নির্বাচন? এ-ব্যাপারে-ও খাঁ সাহেবের দিল খুব দরাজ। তিনি ঘোষণা করলেন, উনিশশো সত্তর সালের সাত-ই ডিসেম্বর প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হবে নির্বাচন।

এই রায় শুনে জনগণ হলেন উল্লসিত, হলেন পুলকিত। কিন্তু চকিতে তাদের সামনে ভেসে উঠলো গত নির্বাচনের সর্বহারা চেহারা, সেই নির্বাচনকে উজিরে আজমেরা কি বে-ইজ্জত-ই না করেছিলেন। গণতন্ত্রকে নির্বাসন দিয়েছিলেন সাগরের গর্ভে। তাঁদের কি বিশ্বাস করা চলে, রাখা চলে আস্থা? বেইমানির ইতিহাসে তাঁরা পৃথিবীতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

তবু উপায় নেই, সাগর পারের লোক, নদী-নালায় ভীত হলে কি চলে? জনগণের চোখে মুখে আবার দেখা দিতে লাগলো আশার সবুজ সংকেত, নব সৃষ্টির দুর্বার প্রেরণায় তাঁদের সর্বাঙ্গে দেখা দিলো অপূর্ব হিল্লোল।

কিন্তু তার আগেই পূর্ববঙ্গের বুকে ঘটে গেল মর্মান্তিক এক ট্রাজেডি, প্রকৃতির এক তাণ্ডব, পৃথিবীর ইতিহাসে যা বিরল। কেউ হারালেন সন্তান, কেউ হারালেন তাঁর পুত্রকে, কেউ হারালেন তাঁর পিতা-পত্নী, হারালেন কেউ আত্মীয় স্বজন-পরিবারকে। শুধু মৃত্যু, শুধু মৃত্যুর মিছিল, শুধু শব, শুধু শবের স্তূপ। আকাশে-বাতাসে উঠলো সর্বহারার ক্রন্দন রোল। মর্মান্তিক সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত

হলেন জনগণ। লাখ লাখ লোক মারা গেলেন সেই প্রকৃতির নিষ্ঠুর নির্মমতায়। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? প্রশাসন যন্ত্রের অবিচক্ষণতা, অদূরদর্শিতাই কি মৃত্যু-মিছিলকে নিয়ে এলো না?

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান তীব্র ক্ষোভের সংগে গর্জন করে উঠলেন ছাব্বিশে নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে। তিনি বললেন, "সরকারের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ও ত্রাণ কার্যে সম্পূর্ণ অক্ষমতা ক্ষমার অযোগ্য। সুপারকো ও আবহাওয়া বিভাগের মাধ্যমে পুরো দুই দিন আগে ঘূর্ণি-ঝড়ের খবর পেলেও উপকূলবর্তী মানুষদের তাঁরা সতর্ক করার প্রয়োজন-মাত্র অনুভব করেননি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও যদি ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা হতো হয়তো হাজার হাজার মানুষ রক্ষা পেত।

আমাদের রক্তে পরিপুষ্ট সেই বাইশটি (ধনী) পরিবারের কেউ ত্রাণ-কার্যে কোনই উল্লেখযোগ্য সাহায্য এখনো করেননি। পশ্চিম পাকিস্তানের যে কাপড়ের মিলগুলি বাংলাদেশকে তাদের প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে শোষণ করছে তারা নগ্নদেহ মানুষ বা শবাবরণের জন্য এক গজ কাপড়ও দেয়নি। এই জন্যেই কি আমাদের ৭১ ভাগ সম্পদ গত দুই দশক ধরে তাদের শোষণ করতে দিয়েছি? এই জন্যেই কি প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের ৬০ শতাংশ বাজেট মঞ্জুর করেছি? এই জন্যেই কি বাংলাদেশের পাট চাষীরা নিরন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। আর করাচী ও লায়ালপুরের পুঁজিবাদীরা আমাদের শোষণ করে উন্নততর সোপান বেয়ে উঠবে?

আজ কোথায় সেই জাতীয় সংহতির খিলান, ইসলামের স্বনিযুক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ, মৌলানা যাওদুদি খান, আবদুল কায়ুম খান, মিঞা মমতাজ দৌলতনা, নবাবজাদা নসরুল্লা খান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতা?

আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা তীক্ষ্ণ স্পষ্ট আলোকসম্পাতে সেই নিদারুণ মৌলিক সত্যই এই বাংলাদেশের প্রতিটি বাঙালীর কাছে

উদ্‌ঘাটিত করেছে যে, সরকারের দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গ একটি কলোনী এবং পণ্যকেন্দ্র ছাড়া আর কিছু নয়।

রাওয়ালপিণ্ডি ও ইসলামাবাদই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। ইসলামাবাদের বিলাস বহুল অট্টালিকা নির্মাণের জন্য ২০০ কোটি টাকার জোগাড় হতে পারে, ঘূর্ণিবার্ত্যা থেকে স্থায়ী আত্মরক্ষাবাস নির্মাণের জন্য ২০ কোটি টাকার বেলাতেই অর্থাভাব। বন্যানিয়ন্ত্রণের একটা পরিকল্পনাও তৈরী হয় না—পশ্চিম পাকিস্তানের মঙ্গলা ও তারাবেলা ড্যাম নির্মাণের জন্য এক কোটি ডলারেরও বেশী খরচ হতে পারে।

আজ আর কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে ৬ দফা—১১ দফা দাবীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা আজ আমাদের হাতেই তুলে দিতে হবে।”

এই কারণে অনেকে বললেন, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু এ যুক্তি কতটা বাস্তব সম্মত? একে উজিরে আজমেরা নির্বাচনের মুখ দেখতে চান না, অনেক সংগ্রাম ও রক্তের মূল্যে, অনেক টাল-বাহানা করে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন নির্বাচন করতে। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা, যাঁরা লাখ লাখ লোকের জীবন নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে খেলা করতে অনুমাত্র দ্বিধা করেন না, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই তার জ্বলন্ত প্রমাণ, তাঁদের হাতে ক্ষমতা থাকা আর এক মুহূর্তের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গকে অর্থনৈতিক শোষণের দেউলিয়ার কোন্ প্রান্তে নিয়ে গেছেন তার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছে দৈনিক 'পূর্ব দেশ', সত্তরের এপ্রিলে: “পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার চিহ্ন ঢাকা পড়েনি। পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দর বিগত ২২ বছর ধরে প্রায় অপরিবর্তনীয় রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের। ভোগ্য পণ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় সিংহ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য নিয়ে মেটাতে হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের গুটি কয়েক একচেটিয়া শিল্পপতির হাতে এসব উৎপাদন কুক্ষিগত থাকায় তাঁরা এসব পণ্য বাবদ বিপুল মুনাফার পণ্যদ্রব্যের পাহাড় রচনা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের ভোগ্যপণ্য শিল্প গড়ে না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে একদিকে যেমন চড়া মূল্যে জিনিষপত্র কিনতে হয়, অন্য দিকে সে অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তানী সাবান বিক্রেতাকে সাবানের কাঁচা মাল হিসেবে লাহোর থেকে কষ্টিক সোডার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। কোরিয়া থেকে সিমেণ্ট আমদানি করলে প্রতি টনে পড়ে ৮০·০০ টাকা; ঐ একই জিনিষ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করলে খরচ পড়ে ১৮০·০০ টাকা।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, এ প্রদেশ থেকে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার পুঁজি পাকিস্তানে পাচার হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রফতানী দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি চাহিদা মেটানো হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানে শুধু এই খাতেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০০·০০০০,০০০কোটি টাকা চলে গেছে। খয়রাতি সাহায্যের ৭০ ভাগই গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে।”

তাই এই নির্বাচন বিলাস নয়। এই নির্বাচন জনগণের মুক্তি মন্ত্র, শোষণ থেকে মুক্তি, দারিদ্র থেকে মুক্তি, উৎপীড়ন থেকে মুক্তি। পূর্ববঙ্গের বুকে জোঁকের মত চেপে বসা সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশ-বাদীদের হাত থেকে মুক্তি, যাঁরা পূর্ববঙ্গকে একটি কলোনীতে পরিণত করবার চক্রান্তে মেতেছেন তাঁদের বজ্র নিষ্পেষণের হাত থেকে মুক্তি। এই নির্বাচনকে তাই করতে হবে জাতীয় ব্রত, মুক্তি-পাথেয়।

ইতিহাসের তাই মোড় ফেরাতে হবে, পূবে আনতে হবে সূর্যোদয়। তাঁরা যে এগারো দফা দাবী ও স্বায়ত্বশাসনের অধিকার চাইলেন, সেই সনদে বলা হল—

১। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো হবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক। পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলগুলি পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাবে।

২। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা— এই তিনটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য সকল বিষয়ে আঞ্চলিক সরকারগুলি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করবে।

৩। রাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকতে পারবে বটে কিন্তু পূর্বাঞ্চলের মুদ্রা যাতে পশ্চিমাঞ্চলে পাচার হয়ে যেতে না পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়াও দুই অঞ্চলের জন্যে দুইটি ভিন্ন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে এবং পূর্ব বাংলাব একটি পৃথক অর্থনীতি চালু করতে হবে।

৪। ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রতিটি আঞ্চলিক সরকার নিজ নিজ বহির্বাণিজ্যের হিসাব পৃথক পৃথক ভাবে রাখবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা তাদেরই এখ্‌তিয়ারে থাকবে।

৫। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। সমস্ত প্রকার ট্যাক্‌স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ে সকল ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। তবে আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সাথে সাথেই ফেডারেল তহবিলে জমা পড়বে।

৬। পূর্ব বাংলাকে মিলিটারী বা প্যারা মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। অস্ত্র কারখানা ও নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব বাংলায় স্থাপন করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধু অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে হবে এবং তাদের নিয়ে একটা সাব ফেডারেশন গঠন করতে হবে।

৭। ব্যাঙ্ক, বীমা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ করতে হবে।

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা সহ তাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকস্বার্থ-বিরোধী কালাকানুন বাতিল করতে হবে এবং ধর্মঘটসহ ট্রেড ইউনিয়নের সকল অধিকার দিতে হবে।

৮। কৃষকের উপর থেকে খাজনা ট্যাকসের বোঝা হ্রাস করতে হবে। বকেয়া খাজনা ও ঋণ মকুব করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি চল্লিশ টাকা এবং আখের জন্য ন্যায্য মূল্য ধার্য করে দিতে হবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার করতে হবে। নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নিবর্তনমূলক আটক আইন বাতিল করতে হবে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। সমস্ত গ্রেফতারী পরওয়ানা ও মামলা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

১০। সিয়েটো সেন্টো ত্যাগ করতে হবে। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করতে হবে। পাকিস্তানের জন্য এক জোট-বহির্ভূত স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

১১। পূর্ব বাংলার জন্য পরিকল্পিত এবং স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরি উক্ত এগারো দফা দাবীর প্রথম ছয়টি আওয়ামি লীগের স্বায়ত্বশাসনের ছয় দফা দাবীও বটে।

প্রাক্ নির্বাচনের এই ইস্তাহার জাতীয় জনগণকে যে মুক্তির পদক্ষেপ ও আশার বাণী শোনাল আওয়ামী লীগের বিপুল নিরঙ্কুশ জয়লাভ তার-ই ফলশ্রুতি। সেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ এবং গণ-পরিষদে যথাক্রমে ২৬৮টি ও ১৫১টি আসন দখল করল। অর্থাৎ এক কথায়, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল।

কিন্তু এই বিপুল জয়লাভ সত্ত্বেও তাঁরা কি তাঁদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলেন, পারলেন কি স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে, পারলেন কি পাক গঠনতন্ত্র রচনা করতে?

সাত-ই ডিসেম্বর, উনিশশো সত্তর, সারা পাকিস্তান জুড়ে হবে প্রাপ্ত-বয়স্কদের নিয়ে সাধারণ নির্বাচন। সুদীর্ঘ বছর খাঁচার মধ্যে বন্দী জীবন যাপন, সে এক দুঃস্বপ্নের মত। কিভাবে, কি নরক যন্ত্রণায় দিনের পর দিন জ্বলে পুড়ে মরতে হয়েছে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনসাধারণকে, তা একমাত্র তারা-ই জানে। নিজের বুকের যন্ত্রণা কাউকে বোঝানো চলে না। যদি না থাকে উপলব্ধিময় হৃদয়, যদি না থাকে সজাগ চেতনা ও সহৃদয় দৃষ্টি।

শ্মশানের প্রান্তরে বসে জনগণ কেবল তাকিয়েছে আকাশের দিকে, মুক্তির নিশ্বাস নিতে চেয়েছে বাতাসে, আর আল্লার দরবারে নত মস্তকে প্রার্থনা জানিয়েছে, আল্লা, মেঘ দে, পানি দে।

সেই মেঘও দেখা গেল আকাশে, ঝড় ও বজ্র বিদ্যুৎও হল কিন্তু বহু আকাঙ্খিত পানি বর্ষণ হল না। ইয়াহিয়া খাঁ আবার টালবাহানা সুরু করলেন।

বিপুল ভোটাধিক্যে, নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় মুজিবর বেরিয়ে এলেন বীরের মত। এবার খাঁ সাহেব, তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, করো তা রক্ষা। বসাও পাক জাতীয় অধিবেশন। ইয়াহিয়া খাঁ-ই বলেছিলেন, একশো কুড়ি দিনের মধ্যে রচনা করতে হবে সংবিধান, এবং সেই সংবিধান রচনা করবেন গণ-পরিষদ। এই গণ-পরিষদ কারা? এই গণ-পরিষদ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত আগেকার জাতীয় পরিষদ চালিয়ে যাবেন গণ-পরিষদের কাজ, যতদিন না সংবিধান রচিত হয় ততদিন।

কিন্তু সংবিধান তৈরীর সময়-সীমা কোনক্রমেই একশো কুড়ি দিনের চেয়ে বেশী হওয়া চলবে না। এর চেয়ে বেশি দেরী যদি হয়, খাঁ সাহেব চোখ রাঙিয়ে শাসানি দিয়েছেন, তা হলে তিনি বাতিল করে দেবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দাবী-দাওয়া, বাতিল করে দেবেন সংবিধানের মাতলামো।

বেশ ভালো কথা, ভদ্রলোকের কথা। কিন্তু কোথায় গেলেন

সেই ভদ্রলোক, আর কোথায় বা গেল তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি? নির্বাচন শেষ হয়ে কেটে যেতে লাগলো একটির পর একটি দিন। কিন্তু ভদ্রলোকের তরফ থেকে কোন সাড়া আসছে না কেন?

ভদ্রলোককে যথেষ্ট ভদ্রই বলতে হবে কারণ যথেষ্ট ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ এমন অসাধারণ ভদ্র হয়ে গেলেন কেন? দুষ্টু লোকেরা বললেন, এর পেছনেও আছে ইয়াহিয়ার সুকৌশল চক্রান্ত। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনর্থক উত্তেজনা বাড়িয়ে দেবার জন্য করছেন বৃথা কালক্ষরণ। প্রত্যেকটি দলকে দিচ্ছেন তিনি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের সুযোগ, দিচ্ছেন সুবিধা।

কিন্তু এতে খাঁ সাহেবের কি সুবিধা হবে? খাঁ সাহেব দাবার চালে অত কাঁচা নন। কারণ আছে বলেই তাঁর এই সহৃদয়তা, কারণ আছে বলেই তাঁর এই বিরাট উদারতা। খাঁ সাহেব সংবিধান প্রণয়নের উপর কয়েকটি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, সংবিধান এমন হবে, যাতে থাকতে হবে দুই প্রান্তের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। এ ছাড়া খাঁ সাহেব সংবিধানের উপর তাঁর অনুমোদনের আঁচড় কাটবেন না।

কিন্তু এই কথার দ্বারা তাঁর বক্তব্য কি পরিষ্কার হয়েছে? বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই রায় দেবেন, নিশ্চয়ই না। কারণ, এই বক্তব্যের দ্বারা ব্যাপারটি তিনি পরিস্কার করার পরিবর্তে করেছেন ঘোলাটে, জটিল ও দুর্বোধ্য। কারণ, এটা খুব ভালো করেই জানেন ইয়াহিয়া খাঁ, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস্ পার্টির সংগে আওয়ামী লীগের ফারাক আসমান জমীনের মত। আওয়ামী লীগ বলেন সাধারণ মানুষের কথা, চেষ্টা করেন তারা সমস্যা সমাধানের। তাই তাদের সংগে আছেন জনগণ। কিন্তু ভুট্টো সাহেবের ব্যাপারই আলাদা। সাধারণ লোক তাঁর কাছে অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, তাঁদেরকে তিনি দু'চোখে বরদাস্ত করতে পারেন না। চোখে তাঁর জ্বলে আগুন, ঠোঁটের কোণে ঘৃণা আর অবজ্ঞা লেগে থাকে দারুণ। ওদের দিকে

তাকাবার মত তাঁর না আছে ফুরসৎ, না আছে কোন উৎসাহ। রাজা উজির নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন সর্বক্ষণ। তার দোস্তরা হলেন বড়ো বড়ো জমিদার, বৃহৎ পুঁজিপতি, ব্যবসাদার, শিল্পপতি। এঁরাই তাঁর দোস্ত, এঁদের মো-সাহেবী করতেই কেটে যায় তাঁর সময়।

কাজেই আওয়ামী লীগের খসড়া সংবিধান ও ভুট্টোর খসড়া সংবিধান, দুটোর মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। মুজিবরের সংগে আছে জনগণ, আর ভুট্টোর সঙ্গে আছে বিরাট ধনী ব্যক্তিরা। মুজিবরের সংবিধান হবে সমস্ত মানুষের, ভুট্টোর হবে এক বিশেষ শ্রেণী স্বার্থের। ভুট্টো ও তার দল যে কোন উপায়ে ক্ষমতার তখ্‌তে বসতে ব্যস্ত, আর আওয়ামী লীগ ও মুজিবরের লক্ষ্য, তাঁদের আদর্শ ও লক্ষ্যকে স্বর্ণ-সিংহাসনে অভিষেক করার। তাঁদের দাবী ছ' দফা। এই ছ' দফার দাবীর একটু এদিক-ওদিক হলে চলবে না। আর এই ছ' দফা শুধু তো বাংলাব জন্য নয়, প্রত্যেকটা অঙ্গরাজ্যই আসবে এর আওতায়।

কিন্তু খাঁ সাহেব অন্য আশায় দিন কাটাচ্ছেন। প্রত্যেকটা দলই তৈরী করবে এক একটা খসড়া সংবিধান। সুতরাং, একটি দলের সংগে অন্য দলের তৈরী সংবিধানের ফারাক থাকবে অবশ্যই। এবং স্বাভাবিক কারণেই সেখানে গড়ে উঠবে বিরোধ। আসল ক্ষমতা নির্ভর করছে তারই এ টা টিপ সই-এর উপর। সুতরাং, জাতীয় পরিষদে গৃহীত সংবিধান মানা না মানা, কর্তার স্বেচ্ছাচারীতার উপর নিভর করছে। /

যদিও খাঁ সাহেব অনেক চেষ্টায় তেশরা মার্চ পাক জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকতে রাজী হলেন, কিন্তু বাদ সাধলেন জনাব ভুট্টো। তিনি যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ নন, মুজিবরের চেয়ে ভোট পেয়েছেন অনেক কম, কিন্তু কে বলবে তাঁকে সে কথা! পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি মেজরিটি অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও কি অস্বীকার করা চলে, বালুচিস্তান আর সীমান্ত প্রদেশ

তাঁর হাত ছাড়া ? কিন্তু পূর্ব বাংলার গোটা দলমত আজ মুজিবরের নেতৃত্বের পতাকা তলে, পূর্ব বাংলার সাত কোটি বাঙালীর সুর বাঁধা পড়েছে একই তন্ত্রীতে।

জনাব ভুট্টো ভুলে গেছেন সেসব কথা। তিনি তাঁর সর্বশেষ বয়ানে বললেন, জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে তিনি যাবেন না। কিন্তু এই গোঁসা করবার কারণ কি ? তিনি সাফ কথার মানুষ, তাই তিনি স্পষ্টই বললেন, মেজরিটির দাবী মানতে তিনি প্রস্তুত নন। মুজিবর যে বায়না ধরেছেন তা তাঁর পছন্দ নয়। মুজিবরের দাবী ছ' দফা পাক ফেডারেল সরকারের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা ছাড়া আর কিছুর উপর খবরদারী করা চলবে না। বাকী সব ব্যাপারে পূর্বঙ্গ বুঝবে তার ভবিষ্যৎ, বুঝবে তার ভাগ্য। সেই ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের দাদাগিরি করবার দরকার নেই।

ভুট্টোর এই কারণেই গোঁসা। গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল বলে একটি কথা আছে, ভুট্টো তারই একটি নিখুঁত প্রতীক। মেজরিটি না পান, কিন্তু মোড়লি করতে ক্ষতি কি ? তাই তিনি ফর্মান জারী করেছেন, ছ' দফা দাবীর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত তেশরা মার্চ তারিখে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদান করতে তিনি অসমর্থ। তবে কি একতরফা-ভাবে সংবিধান তৈরী হবে ? ভুট্টো সাহেব বলেছেন, না তাঁর দলকে শরিকানা না দিলে সংবিধান হবে অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য এবং সেই কারণেই ব্যর্থ।

গোটা রামায়ণ মন্থন করে, সীতার কে বাপ্ গোছের অবস্থা। সব কিছু জেনে শুনেও তবে কেন এই ন্যাকামি ? শহীদদের স্মরণে আয়োজিত সভায় মুজিবরের ভবিষদ্বাণী দেখা যাচ্ছে মিথ্যে হয় নি। তিনি বলেছিলেন, "সুবিধেবাদীরা সত্যকে সহজভাবে বুঝতে চায় না। সুতরাং, এই সত্যকে বোঝানোর জন্য আরো ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গত্যন্তর যে নেই তা বোঝা গেল আগের ও পরের কতকগুলো ঘটনায়। মেঘ দেখলে বোঝা যায় ঝড় আসবে কিনা, বৃষ্টি আর বজ্রপাত হবে কিনা।

সুতরাং আলোচনার গতি ও প্রকৃতি বুঝিয়ে দিল, গতিক সুবিধের নয়। কারণ যতই দিন এগুতে লাগলো তেশরা মার্চের দিকে, ততই পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম পাকিস্তানের, মুজিবর ও ভুট্টোর মধ্যে পার্থক্য বেড়ে যেতে লাগলো। মুজিবরের দাবী, তাঁকে পররাষ্ট্র দপ্তর দিতে হবে। কেননা, পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে বৈদেশিক ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের স্বার্থ যাতে পুরোপুরি বজায় থাকে, সেজন্যই এই দপ্তরটি আওয়ামী লীগ নিজের হাতে রাখতে চান। মুজিবর এর অনুকূলে জোরালো যুক্তি দেখিয়ে বললেন, "পশ্চিম পাকিস্তান বাংলা দেশের সাত কোটি জনগণের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ চালাচ্ছে। কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের ক্ষমতা থাকায় এখানকার সম্পদ ওখানকাব কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে লাগানো হচ্ছে। এর ফলে ওখানকার পুঁজিপতিরা গড়ে তুলছেন মুনাফার পাহাড় আর বাঙালীরা পরিণত হয়েছে ভিখিরীতে।"

শুধু তাই নয়, মুজিবর রহমান আরো বলেন, "আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত কববে। ন্যায়সঙ্গত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আওয়ামী লীগকে তার লক্ষ্যপূরণের জন্য রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত তেইশ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব বাংলাকে শোষণ করতে পেরেছে। তার কারণ শোষণের সবগুলো যন্ত্রই তারা নিজেব হাতের কব্জায় রেখে দিয়েছিল। এই কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় শিল্পপতিরা পূর্ব বাংলার ছোট ও মাঝারি শিল্প-পতিদের প্রচুর ক্ষতি করে তাদের রাস্তায় বসিয়ে দেয়।"

মুজিবর আরও বলেন, "আমরা কামানের গুলির মুখেও ছয় দফা ছাড়া অন্য কোন শাসনতন্ত্র মানবো না। ঘরে ঘরে আপনারা প্রস্তুত

থাকুন। পশ্চিম পাকিস্তান এবারও যদি আমাদের কোন যুক্তি না শোনে তবে তার জন্য দায়ী থাকবো না আমরা। তার মূল্য অবশ্যই দিতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানকে।”

এই সব সাংঘাতিক, সাংঘাতিক কথা বললেন মুজিবর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। কাজেই, ভুট্টো সাহেব কেমন করে এই সব প্রস্তাবকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন করবেন? এর সঙ্গে আবার আছে ছ' দফা দাবীর বায়না।

পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো সাহেব মুজিবরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁর কঠিন পণ থেকে নিবৃত্ত কবতে চাইলেন। বসলেন আলোচনার টেবিলে। মুজিবর সেই ডাকে সাড়া দিতে ইতস্তুতঃ করলেন না।

কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। মুজিবর বললেন, আলোচনা করতে একশোবার রাজি আছি। কিন্তু ছ'দফা দাবীর কোন নড়চড় হবে না। ছোট-খাট বিষয় নিয়ে মত বিনিময় চলতে পারে। কিন্তু ছ'দফা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে, তার কোন নড়চড় হবে না, এক চুলও না। জনগণকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভোটে সংখ্যাধিক্য পেলে, শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে জনগনের হাতে তুলে দেবেন স্বায়ত্তশাসন। জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন না তিনি, তার চেয়ে বরং মৃত্যু-ই শ্রেয়।/

কিন্তু ভুট্টো বললেন, ছ'দফা দাবীর মধ্যে কয়েকটি তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও কর ধার্যের ব্যাপাব নিয়ে তার কিছু বক্তব্য আছে। এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকা উচিৎ। তা যদি না হয়, তবে কম করেও ছ সাতটি পাকিস্তানের সৃষ্টি হবে অর্থাৎ এক কথায়, স্বায়ত্তসাসনের মূল দাবীকেই তিনি বরবাদ করে দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি আব্দার ধরলেন, তেশরা মার্চ জাতীয় পরিষদের যে আলোচনা বসবার কথা আছে, তার তারিখ পিছিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ রাঙিয়ে

হুমকি দিলেন, তাঁর দাবী যদি মানা না হয়, এবং নির্ধারিত তারিখেই জাতীয় অধিবেশন বসে, তবে তিনি খাইবার থেকে করাচীর স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা স্তব্ধ করে দেবেন।

বাকী কথা শেষ করলেন একটু নরম সুরে, 'তাঁর দল পিপলস্পার্টি শাসনতন্ত্র রচনায় যদি অংশ গ্রহণ না করে, তবে সেটা ডেনমার্কের যুবরাজ ছাড়াই হ্যামলেটের অভিনয়ের মত হবে। ছ'দফা গ্রহণের জন্য আমি আওয়ামী লীগের দিকে এক মাইল এগিয়ে গিয়েছি। তিনি কি আমার দিকে এক ইঞ্চিও এগোবেন না?'

এগোনো পেছনোর কথা নয় খাঁ সাহেব, সমস্যা একটি জাতির জীবন মরণের, আত্মহত্যা অথবা আত্মবিকাশের, অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখা অথবা বীরের মত বেঁচে থাকা, শোষণ শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকতাবাদের গোলাম হয়ে থাকা অথবা স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে আলো বাতাস নেওয়া। ভুট্টো সাহেব. তুমি বুঝবে না এর মূল্য। তাই দর-কষাকষি করছো। কিন্তু আমরা দর-কষাকষিতে বিশ্বাস করি না, আমরা পাঞ্জা লড়াই-এ বিশ্বাসী। অনেক রক্ত দিয়েছি, দরকার হলে আরো রক্ত দেবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার আগুনের সর্বনাশা ক্ষুধা মেটে।

অতএব, কোন কিছুর বিনিময়ে মুজিবর নতি স্বীকার করলেন না।

অথচ, একটু নরম সুরে কথা বললে, দাবীর ফিরিস্তি একটু কমিয়ে দিলে, পাতা ছিল তোমার জন্য সোনার সিংহাসন, ছিল স্বর্গ সুখের ব্যবস্থা, ছিল কত কি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না মুজিবর। কিন্তু তার বিপরীতে কি পাবে তুমি? পাবে সুখ, পাবে স্বাচ্ছন্দ, পাবে মসনদ? তাকিয়ে দেখ সামনের দিকে। সে পথ কি ভয়াল, কি দুর্গম, কি কণ্টকাকীর্ণ। প্রতি পদে পদে কাঁটা, প্রতি পদে পদে বাধা। অন্ধ তুমি, কি হারাতে চলেছো, তা তুমি বুঝতে পারছো না মুজিবর। এখনও সময় আছে, এখনও আছে ভাববার সময়। পরে পস্তাতে হবে নিজের বোকামীর জন্য।

মুজিবর হাসলেন মনে মনে। মসনদ খ্যাতি, স্বাচ্ছন্দ্য ! "ডুবিছে সন্তান মোর মার" আর তিনি থাকবেন স্বাচ্ছন্দ্যের সাম্রাজ্যে ? বোকারাই এরূপে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, দামাল ছেলেরাই চিরকাল যুদ্ধ করেছে, দিয়েছে প্রাণ। তাদেরকে দেখেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে প্রথম কারাগারের। কিন্তু কোন শৃঙ্খল তারা মানে নি, কোন বন্ধন তাদের পথ রোধ করতে পারেনি।

সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য, সে তো সুবোধ বালকের জন্য। সুবোধ বালকেরা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে নি। না পেরেছে ইতিহাস সৃষ্টি করতে, না পেরেছে যুদ্ধ করতে। তুমিই বলো না জুলফিকর, তুমি তো একজন সুবোধ বালক, তুমি কি করতে পেরেছ ? অতএব, হে সুবোধ বালক, ভুট্টো সাহেব, তোমার জন্য থাক সুখ, থাক স্বাচ্ছন্দ্য, থাক মসনদ। তুমি তা নিয়ে উপভোগ কর তাকিয়া ঠেস দিয়ে, আঁখি ঢুলু ঢুলু করে নিদ যাও, আমি এই নির্বোধ ছেলে ততদিন ইতিহাস সৃষ্টি করি। তোমার থাক সুখ, আমার থাক দুঃখ, তোমার থাক ভোগ, আমার থাক ত্যাগ, তোমার থাক লক্ষ্য, আমার থাক আদর্শ, তোমার থাক মোহ, আমার থাক মমতা, তোমার থাক বিলাস, আমার থাক সংযম, তোমার থাক মসনদ, আমার থাক কণ্টক, তোমার থাক আলো আঁধারীর পথ, আমার থাক শুধু পথ, অন্তহীন পথ। তোমাকে জানাই আমার লাল সেলাম।

তেশরা মার্চ, একাত্তর সালে বসবার কথা জাতীয় সভার ঐতিহাসিক অধিবেশন, যার উদ্বোধন করবেন প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ। আঠারো লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকার এ্যাসেমব্লি হাউসের গায়ে আনা হচ্ছে যৌবনের অফুরন্ত প্রবাহ। দৈনিক তিনশো কর্মী তার পেছনে দিনরাত ঘাম ফেলে চলেছেন।

কিন্তু সব-ই আশার ছলনা, তা কেমন করে আগে থেকে বোঝা যাবে ? এদিকে গোপনে গোপনে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ জুলফিকর আলি ভুট্টোর ফর্মান শিরোধার্য করেছেন, মেনে নিয়েছেন তাঁর বায়নাক্কা।

এত কিছু ঢাক-ঢোল পেটানোর পরও পর্বতে প্রসব করলো মূষিক। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অকস্মাৎ ঘোষণা করলেন, পূর্ব নির্ধারিত তেশরা মার্চের জাতীয় সভায় অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য শিকেয় তোলা হল।

কিন্তু কি এমন অনিবার্য জরুরী কারণ, যার জন্য খাঁ সাহেব এই ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন? কানু বিনা গীত হয় না। তেমনি কারণ ছাড়া যুক্তি হয় না, সে যুক্তি যতই অবাস্তব, উদ্ভট ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হোক না কেন। ইয়াহিয়া খাঁ বললেন, আমি জাতীয় অধিবেশন স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি দলের কড়া দাবী এবং হিন্দুস্তান এমন এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যাতে অধিবেশন স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নেই।

খাঁ সাহেব যে অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তার বয়ান কিছুটা উদ্ধার করি।

"প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ 'গভীর দুঃখের সংগে' তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছেন যে, তিনি মনে করেন, পশ্চিম পাকিস্তানের অতজন জন-প্রতিনিধি জাতীয় সভার অধিবেশন পরিহার করায় স্বয়ং জাতীয় সভাই ভেঙে যেতে পারত এবং তাঁরা যদি তরা মার্চ উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য এগিয়ে যেতেন তাহলে স্বচ্ছন্দ ক্ষমতা হস্তান্তরের সমগ্র চেষ্টাই নষ্ট হয়ে যেত।

সুতরাং তিনি মনে করেন, সংবিধান রচনায় একটা যুক্তিসঙ্গত বোঝা-পড়ায় আসার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের আরও সময় দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

তিনি আশা করেন, রাজনৈতিক নেতারা অবস্থা উপলব্ধি করে সমস্যা সমাধান করে ফেলবেন।

তবে জেনারেল ইয়াহিয়া এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, সংবিধান রচনার পক্ষে 'অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই' জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বানে তিনি ইতস্ততঃ করবেন না।

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি 'সমান ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে' তাঁর ক্ষমতানুসারে রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্যের জন্য সবকিছু করবেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, বরাবর তিনি ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়ে এসেছেন।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তার উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, একটা মতৈক্যে পৌঁছুনোর বদলে তাঁদের কেউ কেউ 'কঠোর মনোভাব' অবলম্বন করেছেন।

তিনি বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের আব পশ্চিম পাকিস্তানেব নেতাদেব মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ অত্যন্ত পরিতাপজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এবং এটা সমগ্র জাতির উপর একটা বিষাদের ছায়া ফেলেছে।

জেনাবেল ইয়াহিয়া খাঁ 'স্বচ্ছন্দ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য' গত বছব যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, সেইসব ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটেছে দেশে 'অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুসংগঠিত' সাধারণ নির্বাচনে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদেব তিনি বলেছিলেন, নির্বাচন আর জাতীয় সভার প্রথম অধিবেশনের মাঝখানের সময়টাতে তাঁরা যদি পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের প্রধান প্রধান ধারা সম্পর্কে একমত হওয়ায় ব্যয় করেন তাহলে খুবই উপকার হবে।

এই কাজে তাঁদের যথেষ্ট সময় দেবার জন্য তিনি ৩রা মার্চ জাতীয় সভার উদ্বোধনী অধিবেশনের দিন ধার্য করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দল পিপ্‌ল্‌স্‌ পার্টি এবং আরও কতকগুলি দল ৩রা মার্চ জাতীয় সভার অধিবেশনে যোগ দেবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। এছাড়া ভারত যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তার ফলে সমগ্র ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং আমি পরবর্তী এক তারিখের জন্য জাতীয় সভায় অধিবেশন আহ্বান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

কিন্তু পর্দার আড়ালে নেপথ্যের নাটকটি কি? কেন ইয়াহিয়া খাঁ তড়ি-ঘড়ি এমন একটা সিদ্ধান্ত নিলেন? অনেকে বলেন, এর পেছনে জুলফিকর আলি ভুট্টোর হাত আছে। ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী তারিখে খাঁ সাহেব ও ভুট্টোর দোস্তি একটু বেশী রকম জমে উঠেছিল, যা নাকি অনেকেই ভালো চোখে দেখেন নি।

ভুট্টো সাহেব বুঝিয়ে ছিলেন তাঁর দোস্ত্‌কে, মুজিবরের পায়ের তলার মাটি খুব শক্ত নয়। তা যে কোন মুহূর্তে সরে যেতে পারে। তারপরেই তিনি গিয়ে পড়বেন অন্ধকারের অতল গহ্বরে। উগ্রপন্থীদের কার্য-কলাপে মুজিবর সর্বদাই হয়ে থাকেন শঙ্কিত, ভয়ার্ত, চিন্তিত। আর উগ্রপন্থীরা তাদের সংগঠনকে বেশ জোরালো করে গড়ে তুলেছে পূর্ব বাংলায়।

অতএব, জাতীয় পরিষদের বৈঠকের দিন পিছিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখে নিন, মুজিবরের দলের কত জোর। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সাহস ওর বড্ড বেশী বেড়ে গেছে। কাউকেই আর পরোয়া করে না, যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

ভুট্টোকে বোকা বলেই জানতেন ইয়াহিয়া খাঁ। কিন্তু এখন মনে হল, বুদ্ধিটা তো নেহাৎ মন্দ দেয় নি ভুট্টো। ভুট্টোর মাথায়-ও তাহলে কূটনীতির দাবা খেলে! একবার দাবার ছকে বোড়ে সাজিয়ে দেখাই যাক না কেমন জমে।

তার-ই ফলশ্রুতি, ইয়াহিয়ার ঘোষণা—কিছু দিনের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাক।

কিন্তু আগুন নিয়ে খেলার ফল যে কি, তা বোধহয় এঁদের জানা ছিল না। ইতিহাসের পাঠ-ও বোধহয় এগোয় নি এঁদের। তাহলে আগুন নিয়ে খেলার হাত থেকে নিবৃত্ত থাকতেন ওঁরা। এমন সর্বনাশার উৎসবে মেতে উঠতেন না।

মুজিবর মেনে নিতে পারলেন না প্রেসিডেন্টের এই অদ্ভুত আচরণ। অধিবেশন মুলতুবি রাখার আগে তাঁর উচিৎ ছিল, মেজরিটির নেতার সংগে এ-ব্যাপারে একবার আলোচনা করা। অন্তত, ভদ্রতার সৌজন্যে-ও একবার উচিৎ ছিল তাঁকে ডাকা।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হলেন মুজিবর। তার চেয়ে-ও বড়ো কথা, তিনি তাঁর জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'চন্দ্র-সূর্য যতদিন থাকবে, ততদিন কারুর ক্ষমতা নেই আমাদের ছ' দফা দাবী থেকে বিচ্যুত করে। সেদিন, চৌঠা জানুয়ারীর ঢাকার পলটন ময়দানের সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন লক্ষ লক্ষ জনতা কোর-আন স্পর্শ করে আর আকাশে আল্লার দিকে তাকিয়ে মুজিবর করেছিলেন সেই দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। সেই কথা ভুলে যান নি মুজিবর।

সেই মুজিবর ডাক দিলেন জনগণকে, আগামী দোসরা মার্চ আপনারা পালন করুন হরতাল। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাবানেরা আমাদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও আমাদের দাবীর দেন নি তাঁরা কোন মূল্য।

মুজিবর আরো বললেন, আগামী রবিবার তিনি লীগের ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা ঘোষণা করবেন। আর তারপরের দিন সোমবার পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সংগে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা ও তার থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। যে সব দলের সংগে কথাবার্তা বলবেন, তার মধ্যে আছে পিকিংপন্থী ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানী, পাকিস্থান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা নুরুল আমিন, পূর্ব পাকিস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী গোষ্ঠী) নেতা মুজফফ্‌র আমেদ।

মুজিবর ডাক দিয়েছেন, অতএব কে সে, যে ঐ ডাকে না সাড়া দিয়ে পারবে? গোটা জাতির আত্মা একই সুরের ঐক্যবন্ধনে

এসে মিলিত হল। নদী থেকে সৃষ্টি হয় সাগর, সাগর থেকে সৃষ্টি হয় সমুদ্র, সমুদ্র থেকে সৃষ্টি হয় সপ্ত সমুদ্র।

মাত্র একদিনের হরতালে ঢাকা শহরের অবস্থা হল ঠিক এমন-ই— যে রাস্তা লোকজন, বাস-গাড়ী-লরী ট্যাক্সী ইত্যাদিতে গমগম করতো, সেই ঢাকা রাজপথ শূন্যতায় খাঁ খাঁ করতে লাগলো। একটাও বাস নেই, ট্যাক্সি নেই, গাড়ী নেই, অর্থাৎ কোন যানবাহনই নেই। শহরের অবস্থা একটা চাপা উত্তেজনায় থম্‌থম্ করতে লাগলো। স্কুল কলেজ, দোকানপাট, হাট-বাজার, অফিস-আদালত সবই স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে স্তব্ধ। এক কথায়, গণজীবন পরিণত হয়েছিল একটি শান্ত, নীরব প্রতিবাদে মুখর।

তার মধ্যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। সরকারী ভাবে যাকে বলা হয়েছে ঢাকা শহরে ব্যাপক লুঠ ও অগ্নি-সংযোগ, এবং তার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ঢাকায় রাত্রি আটটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত কার্ফু জারী করলেন।

কয়েকটা অংশে জনতা প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে সিনেমা হাউসে, বিলাসবহুল দোকানপাটে আর আইসক্রীম তৈরীর কারখানায়। জনতার চোখে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে আর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ছে এবং শ্লোগান হচ্ছে : জয় বাংলা, চাই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার। মুজিবর অমর রহে—

অবস্থা বেগতিক দেখে রেডিও পাকিস্তান চিঁহি, চিঁহি সুরে বলতে লাগলো ; সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ – সামরিক সরকার সামরিক আইনের ২৫ ধারা মতে সমস্ত প্রদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের সংহতির পরিপন্থী কোন সংবাদ, মতামত, ছবি, মন্তব্য বা প্রবন্ধ প্রকাশ নিষিদ্ধ করছেন। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে।

শুধু এই ঘোষণাই নয়, রাস্তায় রাস্তায় টহলদারী সৈন্যরা সঙ্গীন

উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। টেলিভিশন, বেতার প্রভৃতি স্থানে এক দিন আগে থেকেই সৈন্যদের কসরৎ-প্রদর্শনী আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তার জোবালো জের চললো হরতালের দিন। রাজপথের ধুলো উড়িয়ে, বন্দুক তাক করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো সৈন্যরা।

কিন্তু এতদ্ সত্বেও চিরকালের সেই ছাত্র-সমাজ, যারা যুগে যুগে সৃষ্টি করেছে ইতিহাস, তারা নেমে পড়লো জনতার রাজপথে। হাতে তাদের নিশান, মুখে তাদের শ্লোগান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অনেক আন্দোলনের স্মৃতি-তীর্থ প্রাঙ্গনে সমবেত হতে লাগলেন ছাত্র-অধ্যাপক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা। খুব কম করেও সেই জমায়েতের সংখ্যা হবে দশ হাজার।

এই সব খবর যতই পৌঁছুতে লাগলো ইসলামাবাদের প্রাসাদ কূটে, ততই তাঁদের ঘুম যেতে লাগলো ভেঙ্গে। শুরু করলেন বিমানে করে একের পর এক সৈন্যদের পাঠাতে ঢাকার বেয়াড়াদের শায়েস্তা করতে। ঢাকা পরিণত হতে লাগলো এক যুদ্ধ শিবিরে।

অনেক রাজনৈতিক নেতা, জমায়েত-এ ইসলামী দলের নেতা মৌলানা এম. মাস্থদি, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলের প্রধান মিঃ মুরুল আমিন ও আরো অনেক নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের সুবুদ্ধির কাছে আবেদন জানালেন। তাঁরা বললেন, অনর্থক বিলম্ব না ঘটিয়ে আপনার উচিৎ অবিলম্বে ঢাকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা।

কিন্তু তাঁদের সেই আবেদন অরণ্যের রোদনে পরিণত হল।

পরের দিন দোসরা মার্চ আবার ডাকা হল হরতাল। এবার আর শুধু ঢাকায় নয়, গোটা পূর্ববঙ্গে। সেই ডাকের চেহারা কি? বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠান যে সংবাদ পাঠালেন, তার থেকে জোড়া লাগালে এই হরতালের স্বরূপ দেওয়া যায়।

"হাজার হাজার জনতার বিক্ষোভে আলোড়িত পূর্ববঙ্গের কয়েকটি শহর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। সামরিক আইন ও কার্ফু অমান্য করে

জনগণ বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, পথে-ঘাটে সর্বত্র। প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও সামরিক বাহিনীর গুলি বর্ষণে ঢাকার গণ-জীবন হয়ে ওঠে উত্তাল।"

"কার্ফু সামরিক আইন ও মেশিনগানবাহী টহলদার ফৌজ উপেক্ষা করে লক্ষাধিক মানুষ আজ শেখ মুজিবরের আহ্বানে পল্টন ময়দানে সমবেত হন।"

সেই বিশাল জনসভায় দৃপ্তকণ্ঠে শেখ মুজিবর ঘোষণা করেন, "জনগণের স্বাধিকারের দাবী কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হবে না।

তিনি বলেন, সংখ্যালঘুর অন্যায় জেদে সংখ্যাগুরুর কণ্ঠরোধ পাকিস্তানের জনগণ কখনও মেনে নেবে না। ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের জনগণ যে রায় দিয়েছে তা মেনে নিতে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ বাধ্য।

তিনি জানান যে—চারদিনের জন্য রোজ সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হবে। ঐ সময় সমগ্র প্রদেশে অফিস, আদালত, কারখানা বন্ধ থাকবে, ট্রেন, ও বিমান চলবে না।

তারপর যদি রবিবারের মধ্যেও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পাওয়া যায় তবে কর বন্ধ আন্দোলন শুরু হবে।

তিনি বার বার জনগণের কাছে অহিংস থাকার আবেদন জানান। তিনি বলেন, হিংসা তাঁদেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করবে।

শেখ মুজিবর রহমান জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাবার অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁকে বলেন, অবিলম্বে তিনি যেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতের ক্ষমতা তুলে দেন।

তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভ আন্দোলন চলবে।"

অতএব ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও অনির্দিষ্টকালের জন্য শিকেয় তোলা রইলো।

এই ঘোষণার বয়ান শুনে জনগণ হলেন ক্ষিপ্ত। ইয়াহিয়া খাঁ

সাহেব ভেবেছেন কি, জনগণের ভাগ্য নিয়ে তিনি খেলবেন ছিনিমিনি ? আর যখন তিনি যা বলবেন, জনগণ 'জো-হুজুর' বলে তাকে কুর্ণিশ জানাবে ? অনেক শোষণ করেছো, অনেক রক্ত চুষেছো, অনেক করেছো নির্য্যাতন, আর সেই কালির কথা, তার কথা বলে তোমার মুখে আরো কালো কালি লেপে দিতে চাই না।

সেই ঘোষণা একটি বিক্ষুব্ধ, আশাহত জাতির গায়ে ছিটিয়ে দিল জ্বালার আগুন। আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়লো গোটা বাঙালী জাতি। প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরই দলে দলে জনতা প্রতিবাদের মিছিল বের করে মুখর করে তুললো জনপথ, রাজপথ। ইয়াহিয়া খাঁর স্বৈরতন্ত্র চলবে না, চলবে না, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে ডাকতে হবে, মুজিবর রহমানকে দিতে হবে যোগ্য সম্মান—এইসব শ্লোগানে আকাশ বাতাস ভরে উঠলো।

মুজিবর রহমান অগ্নি-ক্ষরা ভাষায় বললেন, জাতীয় পরিষদের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খাঁর স্বেচ্ছাচার আমরা মেনে নেবো না। প্রতিবাদ জানাবো আমরা স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা বন্ধ করে, ট্রেনের চাকা স্তব্ধ করে, অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে স্তব্ধ করে।

মুজিবরের ডাক আজানের ডাক। গোটা জাতি এসে দাঁড়ালো তাঁর পাশে। আরম্ভ হল হরতাল। একের পর এক হরতাল, তাও স্বতঃস্ফূর্ত, কয়েকদিনের এই হরতালে গণ-জীবন হয়ে পড়লো সম্পূর্ণ স্তব্ধ। এই কদিন ধরে পূর্ব বাংলায় অগ্নি পরীক্ষা চলেছিল। সেই অগ্নি-পরীক্ষায় বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালীরা নির্মাণ করলো সাফল্যের তোরণ। দ্বিতীয় দিনের ধর্মঘটেও ঢাকা হয়ে ওঠে উত্তাল-সমুদ্র। ঢাকা শহর যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে চললো।

জাতীয় পরিষদ অবিলম্বে ডাকার দাবী জানিয়ে বিক্ষোভকারীরা কার্ফু তুচ্ছ করে শহর প্রদক্ষিণ করলো ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানালো।

ই. এন. এ-র নিজের অফিসেরই একতলা জনতার আক্রমণে

তছনছ হল। বহু শৌখিন দোকান অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল। পুলিশের জন্য আবেদন জানিয়েও কোন সাড়া পাওয়া গেলনা।

আয়ুব খাঁ উৎখাতের সংগ্রামে যে ছাত্র-জনতা এগিয়ে আসে আজ তাদেরই আবার আরও বেশী সংখ্যায় ও অনেক বেশী বলদর্পী ভঙ্গীতে জিন্না এভিনিই মুখর করে তুলতে দেখা গেল।

রাস্তায় স্কুলের ছেলেরা ভুট্টোর কুশপুত্তলিকা দাহ করল এবং এক এক জায়গায় ড্রেন ও ডাষ্টবিনের ময়লা কাদা জমিয়ে তার গায়ে লিখে রাখলো ভুট্টোর কবর।

পাকিস্তানের ইংরেজি সংবাদপত্র 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকা থেকে জানা যায় আগের দিনের সংঘর্ষে অন্তত ৬৮ জনের গায়ে বুলেটের আঘাত লেগেছে এবং নিহতের সঠিক সংখ্যা অজানিত।

আরও জানা যায় যে, বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষের উত্তেজনায় আগের দিন সারা রাত ঢাকার মানুষের ঘুম হয়নি।

স্বতঃস্ফূর্ত এই হরতালে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও অকেজো হয়ে পড়ে। ট্রেন, ষ্টিমার, মোটরগাড়ি বা অন্য কোন যানবাহন চলাচল করেনি। ডাকঘর, কলকারখানা বন্ধ থাকে।

এদিকে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবরকে দশই মার্চ তারিখে ঢাকায় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তা তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সংগে প্রত্যাখ্যান করলেন। মুজিবরের দাবী: আগে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হোক, রক্তপাত বন্ধ হোক, তারপর দেখা যাবে, কারণ বেয়নেটের ঘা মেরে কোন আলোচনা চলতে পারে না।

মুজিবর আরও বললেন, এই নিষ্ঠুর পরিহাসের দরকার কি? যাঁরা ঢাকা, চট্টগ্রামে ও অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র নিরীহ লোকেদের নির্বিচারে

গুলি চালাচ্ছে, মেতে উঠেছে শব সাধনায়, তাদের সংগে কোন বৈঠক নয়।

এদিকে তৃতীয় দিনের হরতালেও জন-জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে এবং ফৌজী শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে উত্তাল। গত দু দিনে সেনাদল এবং ক্রুদ্ধ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষে প্রায় একশো লোক নিহত এবং কয়েক শো আহত হয়েছেন। রাস্তায় রাস্তায় ঐ লড়াই চলে। ঢাকার দৈনিক 'ইত্তেফাক' গণ-বিক্ষোভে হতাহতের ঐ সংখ্যা জানিয়েছিল। এদিকে মরনিং নিউজ পত্রিকায় দুদিনের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা ৬০ বলে ছাপানো হল।

মুজিবর রহমান বললেন, এই হরতাল চলছে, এই হরতাল চলবে। সাতই মার্চ পর্যন্ত চলবে হরতাল। তারপরও যদি অবাধ্য শাসকেরা শির নত না করে, আরম্ভ হবে কর-বর্জন আন্দোলন।

চতুর্থ দিন অর্থাৎ মার্চের ছয় তারিখ হরতালে অবস্থা হয়ে ওঠে আরো চরম। মেসিনগানের গুলিতে কত জনকে যে লুটিয়ে পড়তে হল, তার কোন হিসেব নেই। কোন কোন সংবাদ সংস্থার মতে, মৃতের সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশী হবে।

পাকিস্তান যে গভীর সংকটের আবর্তে পড়ল, গত কয়েক বছরের মধ্যে তা ঘটেনি। স্থানীয় এক সংবাদ এজেন্সির খবরে বলা হল যে, ঢাকায় অন্ততঃ দু' হাজার লোককে মেশিনগানের গুলীতে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু সংবাদটা প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। উভয় পাকিস্তানই এখন কড়া সেন্সর শিল্পের কবলে।

ওয়াকিবহাল মহলের খবরে বলা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে এখন ক্রমাগত সৈন্য আমদানী করা হচ্ছে। সমস্ত বিমানবন্দর ও বিধানসভা ভবনে কড়া পাহারা বসেছে। বহু বিমানবন্দরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে কামান দাগার আওয়াজ।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ঢাকায় আসতে অসম্মত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ সোমবার গণ-পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখায় পূর্ব পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয়। উত্তেজিত জনতা জাতীয় পতাকা এবং মহম্মদ আলি জিন্না সমেত অন্যান্য নেতাদের ছবিতে আগুন লাগায়। তারা নতুন পতাকা উড়িয়ে দেয় এবং শেখ মুজিবরকে 'বাংলাদেশের' প্রতিষ্ঠাতারূপে অভিনন্দিত করে।

কয়েকদিন বন্ধ থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকেও জানা যাচ্ছে না সেখানে কি পরিমাণ লোক মরেছে। অবশ্য অসমর্থিত খবরে প্রকাশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানে বহু লোককে গুলি করে মারা হয়েছে। করাচী ও হংকং থেকে ঢাকার সঙ্গে কোন টেলিফোন যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

করিমগঞ্জ থেকে পি, টি, আই-র এক খবরে বলা হল যে সীমান্তবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের জেলা শ্রীহট্টে আজ তৃতীয় দিনও পূর্ণ হরতাল চলছে। যানবাহন, দোকানপাট, অফিস সব বন্ধ।

৩রা মার্চ বাঙালী ও অ-বাঙালীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর ইষ্টপাকিস্তান রাইফেলসের সৈন্যরা কয়েক রাউণ্ড গুলী চালায় ও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করে। শহরে কার্ফু ও জারী করা হয়, অষ্ট্রেলীয় বেতারের সংবাদে প্রকাশ যে, সর্বাত্মক হরতালের সময় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্ততঃ ৩০০ জন মারা গেছেন।

অষ্ট্রেলীয় বেতারের সংবাদে আরও প্রকাশ, আজ (শুক্রবার) ঢাকার ডাক-তার ও টেলিফোনসহ সমস্ত অফিস বন্ধ হয়ে রয়েছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগের সকল স্বাভাবিক ব্যবস্থাই বিচ্ছিন্ন। এমনকি বেতার যোগাযোগও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান গত বুধবার রয়টরের প্রতিনিধিকে বলেছেন যে, সৈন্য বাহিনীর

সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষে গত ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ ৩০০ জন নিহত হয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, সৈন্যবাহিনী দখলদার বাহিনীর মতো আচরণ করছে। তারা নিরস্ত্র জনতার উপর মেসিনগান থেকে গুলী বর্ষণ করেছে।

রয়টারের সংবাদদাতা বলেছেন, নিহতের যে সংখ্যা মুজিবর দিয়েছেন তা যাচাই করা সম্ভব না হলেও মুজিবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে ছাত্ররা রয়টারের প্রতিনিধিকে ৮টি মৃতদেহ দেখিয়েছেন: এদের সকলেই বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে এই মৃতদেহগুলি রক্ষিত আছে। ছাত্ররা রয়টারের প্রতিনিধিকে আরও বলেছেন যে, এই ৮টি মৃতদেহ ছাড়া আরও অনেক নিহত ও আহতদের আত্মীয়-স্বজন তাদের বাড়ী নিয়ে গেছেন অথবা সৈন্যবাহিনীর হেফাজতে রয়েছে।

সাতাই মার্চ মুজিবর ডাক দিলেন গোটা বাংলার ঘরে ঘরে যত মুক্তিকামী মানুষ আছে, তাদের সকলকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। এই দিনটি ঐতিহাসিক, এই দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসের মুক্তির এক পবিত্র সন্ধিলগ্ন।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দান। গোটা জাতিকে অগ্নি আসরে লিখে যাবার আহ্বান জানালেন মুজিবর। তার আগে থেকে দলে দলে, কাতারে কাতারে লোক আসতে লাগলো মুক্তির এই মহোৎসবে মিলিত হবার জন্য—ছাত্র, যুবক, কেরানী, শিক্ষক। আসতে লাগলো বৃদ্ধ, যুবতী, তরুণী, সকলেই। মুখে তাদের শেকল ভাঙার গান, রক্তে তাদের বিদ্রোহের আগুন। মুক্তির উষ্ণবেদনায় কাপতে লাগলো গোটা বাংলা দেশ। সকলের মুখে মুখে মন্ত্রের মত, স্তবগাথার মত বেরিয়ে আসতে লাগলো মুক্তির সংগীত।

পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে
আলোকে আলোকময়
জয় জয় জয় বাংলা জয়।

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসী
বেরিয়ে এস সবে
বর্গী যদি আসে তাদের
তাড়িয়ে দিতেই হবে।
তাড়িয়ে দেব তাড়িয়ে দেব
বুলবুলিকে ধান দেব
আদর সোহাগ করে
সেই তো আমার খাজনা দেওয়া
ভালবাসায় ভরে।
দস্যুগুলো পালিয়ে গেছে
আঁধার হল ক্ষয়।
জয় বাংলা জয় জয় জয়।

আর নয়। অনেক রক্ত দিয়েছি, অনেক নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা তোমরা মিলিটারীদের দেহ-রক্ষী সাজিয়ে, অঙ্গে চামর দুলিয়ে হাওয়া খাবে আর পূর্ববঙ্গের লাখ লাখ মানুষেরা তাজা খুনের হোলি উৎসব করবে, তা আর হবে না।

আটই মার্চ, বঙ্গাল শের মুজিবর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, পঁচিশে মার্চ আমরা অবশ্যই জাতীয় পরিষদে যোগদান করবো। কিন্তু একদিকে বেয়নেট উঁচিয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর একদিকে ডাকা হচ্ছে জাতীয় সভার অধিবেশন, তা চলবে না।

ঢাকার উদ্বেলিত এক বিশাল জনারণ্যে মুজিবর এসে দাঁড়ালেন। রক্ত-বাগের শেষ সূর্য এসে অভিনন্দন জানাতে লাগলো তাঁর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে। তিনি মাইক টেনে নিয়ে বললেন, জাতীয় পরিষদে আমরা যোগদান করতে পারি। কিন্তু তার আগে আমাদের চারটি দাবী পূরণ করতে হবে। এই চারদফা দাবী হল:

১। সামরিক আইন তুলতে হবে অবিলম্বে।

২। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৩। সৈন্যদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ব্যারাকে।

৪। সৈন্যদের গুলিতে নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে দিতে হবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং এই বর্বরশাহী নারকীয় পাইকারী হারে নরহত্যার বসাতে হবে তদন্ত কমিশন।

ভদ্রভাবে এই দাবীগুলি যদি না মানা হয়, তবে বন্ধ থাকবে সব কিছু। বন্ধ থাকবে আইন-আদালত, বন্ধ থাকবে আফিস, বন্ধ থাকবে স্কুল-কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাতে মুখে অন্ন তুলতে না পারে, সেজন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে কর ও খাজনা দেওয়া।

মুজিবর বললেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত নন। যা তিনি চান তা হল, জনতার রায় যথোচিত মর্যাদা লাভ করুক। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তিনি ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য প্রেসিডেণ্ট খাঁনকে ইতিপূর্বে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট তাঁর দাবী মেনে নেন। তবে অধিবেশন আহ্বান করেন ৩রা মার্চ। পরে তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য এই অধিবেশন স্থগিত রাখেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেননি। শুধু তাই নয়, ২৫শে মার্চ যে অধিবেশন ডাকা হয়েছে, গতকাল সে ঘোষণা প্রচার করার পূর্বেও তাঁর সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হয়নি। এইসব ঘটনায় এই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে আমল দিতেই চান না।

তাঁদের দাবী না মানলে ইয়াহিয়া ইতিহাসের ডাষ্টবিনে কবরস্থ হবেন। অবিনশ্বর হয়ে থাকবে জয় বাংলা, অবিনশ্বর হয়ে থাকবে তার সংগ্রামী জীবনের গৌরবময় জীবনের জয়-টীকা। সপ্তকোটি মানুষের

হৃদয়-তীর্থ থেকে নির্ঝরিত সংগ্রামের অপরাজেয় শক্তি যুগে যুগে দুনিয়ার মুক্তিকামীদের জোগাবে প্রেরণা, দেবে উৎসাহ।

সেই ইতিহাস সৃষ্টির শপথ নিতে এলেন জনতা রেসকোর্সের ময়দানে। শপথ নেবার এমন উপযুক্ত স্থান কোথায়-ই বা আছে? এই ময়দানের অদূরে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বাংলা ভাষাকে প্রাণের ভাষা করবার জন্য ছাত্রেরা হয়েছেন শহীদ, করেছেন সেই স্থানকে স্মরণ-তীর্থ। উনিশ শো তেত্রিশ সালে সেখানেই অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে একাধিক মুক্তি-পাগল হয়েছেন শহীদ। সেখানে সাতকোটি বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রোচ্চারণ করতে এসেছেন। সেই মুক্তি-রক্তের পুরোহিত হয়েছেন জন-গণ-মন-অধিনায়ক শেখ মুজিবর রহমান। তিনি-ই করবেন মন্ত্রোচ্চারণ, তিনি ই করবেন মাঙ্গলিক।

মুজিবর মঞ্চে এসে উঠলেন। সমস্ত মানুষ উদ্বেলিত হয়ে ফেটে পড়লো উত্তাল তরঙ্গে। জয়, সোনার বাংলার জয়, জয় মুজিবরের জয়। সেই ধ্বনি তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো আকাশে বাতাসে। মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে তা উঠতে লাগলো গ্রাম-গ্রামান্তরে, পূর্ববাংলার এ প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

মুজিবর তাঁর মন্ত্র-বাণী উচ্চারণ করবার আগে পবিত্র কোর-আন নিয়ে শপথ নিলেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লার কাছে নতজানু হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। তারপর এলেন জনতার স্বাধীনতায় পৌরোহিত্য করতে। অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে, জোরালো ভাষায় মুজিবর শুভ উদ্বোধন করলেন মন্ত্রোচ্চারণের। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঝলসাতে লাগলো, মুখ হয়ে উঠলো কঠিন। তিনি বললেন, "শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে আমি এ্যাসেম্ব্লিতে যেতে চাই না। যত রক্ত দিতে হয় দেব, কার্পণ্য করবো না। কেননা, এ আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এ ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, বাঙালীর অস্থি

দিয়ে গড়া ইতিহাস। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁকে বলেছিলাম, "গরীববাঙালীর উপর গুলি করা হয়েছে। আমাদের হত্যা করা হয়েছে। আপনি এখানে আসুন, দেখুন। কিন্তু তিনি এলেন না।"

মুজিব তাঁর ৩৫ মিনিটের ভাষণে জনগণকে সব সময়েই 'ভায়েরা আমার' বলে সম্ভাষণ জানান। তিনি কখনো 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি উচ্চারণ করেননি, বলেছেন 'আমার বাংলা'। ভাষণের শেষে মুজিবর দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনি দেন, 'জয় বাংলা'।

গত এক সপ্তাহে ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য জায়গায় সৈন্য-বাহিনীর গুলিতে নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পর মুজিবর তাঁর ভাষণ সুরু করেন।

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কাজ ব্যর্থ করে ইসলামাবাদ এবং কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী যে সব চক্রান্ত করেছে, একে একে সেগুলির উল্লেখ করে মুজিবর বলেন, "গত ২৩ বছর ধরে আমরা শোষিত হয়ে আসছি এবং জনগণের সরকারকে নির্বাচিত করার ন্যায্য ও মৌল অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এই দীর্ঘসময়ে আমাদের অনেক রক্ত আর অশ্রু ঝরাতে হয়েছে। আমার বাংলার জনগণকে তাঁদের অধিকার অর্জনের জন্যে অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। এবার আমরা জনগণের সরকার গঠনের জন্য জনগণের রায় পেয়েছি। কিন্তু জঙ্গীশাহী আমাদের সরকার গঠনে বাধা দিচ্ছে।

কিন্তু বাংলার মানুষ বিনাবাধায় এই শোষণ বরদাস্ত করবে না। আমাদের অধিকার অর্জন এবং সাত কোটি বঙ্গবাসীকে বাঁচানোর জন্যে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, ত্যাগস্বীকার করতে হবে। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত জনগণকে অবিচ্ছিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে।"

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাঁর পরামর্শ না নিয়েই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখার বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনকে

দমন করার জন্য যে পৈশাচিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তার সমালোচনা করে মুজিবর বলেন, "খুবই দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের শ্রমে অর্জিত অর্থে কেনা অস্ত্র আমাদের নির্বিচারে হত্যা করার কাজে লাগানো হচ্ছে। পৃথিবীর কোনখানেই দেশের জনগণের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর এই নৃশংসতা দেখা যায়নি।"

শেখ মুজিবর জঙ্গীশাহীকে হুঁশিয়ার করে বলেন, "আবার যদি একটি বুলেটও ব্যবহার করা হয় তাহলে বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলা হবে।"

তিনি বলেন, "ঢাকার পথে-ঘাটে নিহত আমার ভাইদের রক্ত এখনও শুকোয়নি। তারা কি অপরাধ করেছিল?"

মুজিবর বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি প্রেসিডেন্টকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। এরপর প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতার পরামর্শে প্রেসিডেন্ট পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখার কথা ঘোষণা করেন। এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার মতামতের কোন মূল্যই নেই।"

শেখ মুজিবর আরো বলেন, "একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য তিনি সবকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তিনি এই আশ্বাস দেন যে, জাতীয় পরিষদের কোন সদস্য যদি কোন প্রস্তাব আনেন তাহলে তিনি তা বিবেচনা করে দেখার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ৬ দফা কর্মসূচী আমি কি করে পরিত্যাগ করবো? ৬ দফা কর্মসূচীর সঙ্গে আমাদের বেঁচে থাকার প্রশ্নটি জড়িত। এ ব্যাপারে কোন আপোষ চলতে পারে না।"

শেখ মুজিবর দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য তাঁর কোনও আকর্ষণ নেই। আমরা শুধুমাত্র আমাদের গণতান্ত্রিক

অধিকার চাই। আমরা মানুষ হিসাবে বাঁচতে চাই, দাস হিসাবে নয়।

শেখ মুজিবর বলেন "ঐক্য ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। আপনাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না।"

জয় বাংলার মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত মুজিবরের নয়-ই মার্চের তারিখের ঘোষণার পর স্থষ্টি করলো এক নয়া ইতিহাস। গণতন্ত্র ও ন্যায়াধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাত কোটি বাঙালী হলেন একতাবদ্ধ। পারলো না ইয়াহিয়ার পাশবিক শক্তির নগ্ন আস্ফালন নিরস্ত্র বাঙালীর বিদ্রোহী চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে। এবং মুজিবরের নয়-ই মার্চের ঐতিহাসিক ঘোষণা, জাতিকে উদ্ভুত এক উন্মাদনায় নিয়ে গেল সূর্যের উদয়-দিগন্তে। গোটা জাতি গর্জে উঠলো বিপুল বিক্রমে। শুধু 'জয় বাংলা', আর কিছু নয়, শুধু 'জয় বাংলা' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ইয়াহিয়ার বজ্র শিকল ভেঙে জনগণ ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে জয় বাংলাকে। অতি বাস্তব সত্য, ইয়াহিয়ার করায়ত্তে আর বাংলাদেশ নেই। পূর্ব বাংলা এখন স্বয়ং শাসিত। পূর্ব বাংলার গোটা জাতিই চালাচ্ছেন এখন সরকার। স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়েছেন শান্তি আর শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব। পুলিশ থেকে আরম্ভ করে সরকারী-বেসরকারী, রক্ষা বাহিনী সবাই এখন মুক্তি যুদ্ধের সারথি, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসন রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী।

এদিকে ছয়-ই মার্চ প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবরকে কুর্ণিশ করতে বাধ্য হলেন। তিনি পঁচিশে মার্চ জাতীয় পরিষদের সভা ডাকতে রাজি হয়েছেন। তার তের মিনিট ব্যাপী বেতার ভাষণে অনেক নরম ও গরম কথা শোনালেন। তিনি বললেন, সশস্ত্র ফৌজ পাকিস্তানের 'পূর্ণ ও নিরঙ্কুশ অখণ্ডতা' বহাল রাখবে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেই গঠনমূলক সাড়া পাবে বলে ইয়াহিয়া খাঁ বিশ্বাস করেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের

অধিবেশন স্থগিত রাখ'র ব্যাপারে তাঁর আদেশ জারীর পর পূর্ব পাকিস্তানে যে ব্যাপক হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ সুরু হয়েছে, তা উল্লেখ করে বলেন, আইন ভঙ্গকারীদের লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে সর্বনিম্ন বল-প্রয়োগের আদেশ দিয়েছেন।

সর্বনিম্ন বলপ্রয়োগের অর্থ কি অসংখ্য লোককে বুলেট ও রাইফেলের গুণ্ডামীতে কবরে পাঠানো? এর নামই কি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, না এর নাম মানুষ মারার রাজনীতি?

কাঁদুনি গেয়ে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তিনি আরো বললেন, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে যথাসম্ভব সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করাই তাঁর উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য এখনও বহাল রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা জাতীয় পরিষদ স্থগিতের আদেশটি ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ ১৩ মিনিট রেডিও মারফত বিবৃতিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থাগুলি বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি বলেন, 'ঐ বিবৃতিতে আমি আরও বলেছিলাম, ক্ষমতা হস্তান্তরের সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে নির্বাচিত নেতাদের যথাসম্ভব সাহায্য করব।'

'এই উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে আমি ১০ই মার্চ ঢাকায় সংসদীয় দলগুলির নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম, দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন মতপার্থক্যের অবসান ঘটানোর জন্য আমার সঠিক ও আন্তরিক চেষ্টা উপেক্ষা করা হয়েছে এবং আমার এই আহ্বানে যে সাড়া আমি পেয়েছি, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা আমার এই চেষ্টাকে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গ্রহণ করেছেন, তা খুবই নৈরাশ্যজনক। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এই নেতাই আমাকে আমার ঐ বেতার ঘোষণার পূর্বে আমার এই ধারণা জন্মিয়েছিলেন

যে, তিনি এইরূপ একটি সম্মেলনের পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করবেন না।'

অর্থাৎ, প্রকারান্তে যে কথা তিনি বলতে চাইলেন, তার অর্থ দাঁড়ায়, মুজিবর রহমানই হলেন যত নষ্টের গোড়া। তিনি এসব ব্যাপারে অনাবশ্যক নাক না গলালে সব নিরিবিলিতে ও নির্বিঘ্নে হয়ে যেত। পূর্ব বাংলা পরিণত হত সোনার বাংলায়। মুজিবরের ডাক জনগণকে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানের রক্তাক্ত প্রান্তরে, সর্বনাশের শেষ ধাপে। আর সুবোধ বালকের মত ইয়াহিয়া খাঁর কথা শুনলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে কতটুকুই আর সময় লাগবে! তিনি বার বার তাঁর ভাষণে মুজিবরের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে বললেন, 'এরূপ অবস্থায় আমার ঐ প্রস্তাবকে সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান আমাকে বিস্মিত ও নিরাশ করেছে।'

'আপনারা এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে, নির্বাচন শেষ হওয়ার সময় থেকে আমি ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি গ্রহণ করলেও আমাদের কোন কোন নেতা তাতে বাধা সৃষ্টি করেছেন।'

জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ বললেন যে, ২৭শে জানুয়ারী নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ঢাকায় তিনি দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার পর তিনি একাধিকবার উদ্দেশ্য সাধনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের সঙ্গে এখানে আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু মুজিবর এই প্রস্তাবকে কোন পাত্তা দেন নি, তা আগেই বলা হয়েছে। মুজিবর বলেছিলেন, রক্ত হোলিতে যে জাতিকে তিনি স্নান করিয়েছেন, শহীদের খুনে ভেজা বাংলার সেই রূপকে তিনি একবার দেখে যান। পাইকারী হারে যে গণহত্যা চালানো হয়েছে, তার জবাব দেবে কে? পাঞ্জাবী বীর পুঙ্গবেরা ব্যারাকে ফিরে গেছে ঠিকই। কিন্তু রেখে গেছে তারা তাজা রক্ত, যা চুঁইয়ে চুঁইয়ে এখনো বাঙালীর গা দিয়ে ঝরে পড়ছে। বাঙালীর ঘরে ঘরে জ্বলছে তুষের আগুন। পুবের আকাশ নবসূর্যে লাল হয়ে গেছে।

এখনো সময় আছে, এখনো ইয়াহিয়া খাঁ, মেনে নাও আমাদের চার দফা দাবী। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করো, তুমি ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করো, যে রক্ত-গঙ্গা বহিয়েছি, তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করবো চার দফা দাবী মেনে নিয়ে।

মুজিবর রহমান ঢাকা বেতারে বললেন, সামরিক আইন প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সর্বনাশা রীতিই বাংলাদেশে ভীতির সৃষ্টি করেছে এবং সেখান থেকে বৈদেশিকদের পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করার মত অবস্থা সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রসংঘের কর্মীরা চলে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন প্রকল্প অনুযায়ী কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের কর্তব্য হবে এদের অপসারণ বন্ধ করা। তাঁকে এ কথাটা বুঝতে হবে যে, বর্তমান সামরিক শাসকদের নীতি গণতন্ত্রের পরিপন্থী এবং মানবিক অধিকারকে পুরোপুরি অস্বীকার করা।'

কড়া ভাষায় শেখ মুজিবর রহমান বললেন যে, বাঙালী কারুর হুমকির কাছে মাথা নত করবে না। তা সে কর্তৃপক্ষ যত জবরদস্ত হোক না কেন।

বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীন দেশের নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্যে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছে। ইতিহাস তাঁদের পক্ষে। তিনি বলেন যে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে জনগণ যে সাড়া দিয়েছেন তাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ একথা বুঝতে পারবেন যে, বাংলা দেশের এই কথাই শেষ কথা। তাদের এখন বুঝতে হবে যে বাঙালীর ওপর তাদের ইচ্ছে খাটান যাবে না। সারা বিশ্বের ন্যায়পরায়ণ চিন্তাধারায় মানুষের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে নিরস্ত্র বাঙ্গলাদেশের মানুষের ওপর যে পশুসুলভ শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু শাসকরা এটা উপলব্ধি করতে পারেনি এবং তারা জনবিরোধী নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সৈন্য ও অস্ত্র এখানে পাঠান হচ্ছে। মদমত্ত

শাসকরা ২৩ বছর ধরে বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণ করে চলেছে এবং এই শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহকে খতম করার ষড়যন্ত্র করছে।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খাঁ ইতিহাসের লিখনকে পড়তে পারলেন না। তিনি নিজেকে বেশী চালাক মনে করেন, তাই তাঁর এত দম্ভ। গোটা পাঞ্জাবী ও বেলুচিস্তানের কিছু ফৌজ তাঁর কথায় নড়াচড়া করে, তাই তাঁর আর ভাবনা কি! তাঁর মসনদ তো কেউ দখল করতে পারবে না।

কিন্তু বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, অতি চালাকের গলায় দড়ি। কিন্তু কাফেরী ভাষা তো তিনি শেখেননি, তাতে তাঁর ইসলামিত্ব চলে যাবে, এই আশঙ্কায়। তাঁব ভাষা রাজভাষা, ইসলামের ভাষা, তাঁব সংগে তাঁর আছে পহচান। কিন্তু বাংলায় আরেকটা কথা আছে, ওস্তাদেব মার শেষ মার এবং তাতেই শেষ হয়ে যায় বিরোধীর বায়নাক্কা।

সেই শেষ মার-ই দিলেন ওস্তাদ মুজিবর। কবে ইয়াহিয়া খাঁ অনুগ্রহ করে ভিক্ষার ঝুলিতে ভিক্ষে দেবেন, তারই আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে সাত কোটি বাঙালী জাতি, এতোটা উদার মন নয় বাঙালীর। বাঙালী আর যাই হোক, ভিখারী নয়, তার পরিচয় সে মানুষ, তার মানবিকতা মনুষ্যত্বে। কিন্তু যেখানে শয়তানের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য, সেখানে উদারতার সুযোগ কতটুকু?

গোটা জাতি এতদিন যে উদয়-সূর্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে, সংগ্রাম করেছে, আত্মত্যাগের প্রতিকূলতার শরশয্যা বহন করেছে, সেই জাতির স্বায়ত্তশাসনের বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিলেন শেখ মুজিবর রহমান। পনেরই মার্চ মুজিবর পূর্ব বাংলার শাসনভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। পঁয়ত্রিশটি শিরোনামার একটি সবকারী ঘোষণায় বঙ্গাল শের বললেন, প্রাদেশিক বিধানসভায় আমার আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, জাতীয় পরিষদেও আমার দলের জয়-জয়কার। বৃহৎ জাতি আমার উপর একটি গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

এমতাবস্থায় একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে দীর্ঘ দিন শিকেয় তুলে রেখে দেওয়া যেতে পারে না। তাই সাড়ে সাত কোটি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য দেশের শাসনভার আমি তুলে নিলাম। বাংলাদেশের প্রশাসন ভার নিজের হাতে নিচ্ছি এই উদ্দেশ্যে যে তাদেরকে আমি মুক্তি দেবো।

মুজিবর রহমান সামরিক অফিসারদের অগ্রাহ্য করে তাঁর আদেশ পালনের যে নির্দেশ দেন সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর হয়। তিনি বললেন, ইসলামাবাদের সরকারের এই অবস্থা মেনে নেওয়া উচিত। নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। 'আমরাই সংখ্যাধিক্যের দরুন সারা দেশের প্রকৃত ক্ষমতার উত্তরাধিকারী।'

পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক জীবনের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে ৩৫টি নির্দেশনামা জারি করে শেখ মুজিবর রহমান দেশের প্রশাসন ভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার 'স্ব-শাসন' ব্যবস্থা পূর্ণ হল।

এই নির্দেশনামার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের ফেডারেল সরকারের সচিবালয়, প্রাদেশিক এবং আধাসরকারী অফিস ও আদালতে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল।

অফিস না খুলে, ডেপুটি জেলা কমিশনারদের এবং মহকুমা অফিসারদের কাজ চালাতে বলা হল।

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হল। প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রে রহমানের আওয়ামী লীগ কর্মীরা পুলিশকে সাহায্য করবেন।

নির্দেশনামায় আরও বলা হল যে বন্দর কর্তৃপক্ষরা বন্দরে জাহাজ আসা এবং বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার বিষয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কোন সামরিক বাহিনীর অবতরণ অথবা সামরিক দ্রব্যাদি উঠানো নামানো সম্পর্কে কোন প্রকার সহযোগিতা করবেন না।

ডাক ও তার বিভাগ কেবলমাত্র 'বাংলা দেশ'-এর অভ্যন্তরে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাফ এবং মণি অর্ডার বিলি করার জন্য কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। বিদেশে চিঠিপত্র এবং তারবার্তা সরাসরি পাঠানো চলবে।

তিনটি সামরিক ছাউনিকে মুজিবের ঘোষণার আওতা থেকে বাদ দেওয়া হল। এই তিনটি ছাউনি হল ঢাকা, কুমিল্লা এবং যশোর।

শেখ মুজিবর সকল পূর্ব পাকিস্তানীকে সর্বশক্তি দিয়ে সম্ভাব্য সকল আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানান।

যে ৩৫টি নির্দেশনামা জারী করা হল তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আয়কর আদায় স্থগিত, কেন্দ্রীয় শুল্ক বাবদ সকল অর্থ পাঠানো বন্ধ করবার কথা বলা হল। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের রাজস্ব খাতে সকল প্রাদেশিক কর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হল।

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের টেলিপ্রিণ্টার লাইন সোমবার. মঙ্গলবার, ও বৃহস্পতিবার বেলা ২৷৷টা থেকে ৩৷৷টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা খোলা রাখার জন্য আদেশ জারী করা হল। এই সময়ে ব্যাঙ্কগুলি তাদের বার্তা বিনিময় করতে পারবে।

রেডিও ও টেলিভিশনকে নির্দেশ দেওয়া হল যে, 'সকল বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ এবং জনগণের আন্দোলনের সংবাদ' পরিবেশন করতে হবে। অন্যথায় যাঁরা এই সব সংস্থায় কাজ করেন তাঁরা সহযোগিতা করবেন না।

নির্দেশে বলা হল, খাদ্যশস্যের আমদানি, বণ্টন, গুদামজাত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সকল প্রাদেশিক ও স্থানীয় কর সংগ্রহ করে "বাংলা দেশ সরকারে"র রাজস্ব খাতে জমা দেবার নির্দেশ জারি করা হল। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সংগৃহীত পরোক্ষ কর প্রদেশের দুটি বাঙালী

ব্যাঙ্ক—দি ইস্টার্ন মারকেন্টাইল এবং দি ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন-এ জমা দিতে হবে।

পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আয়কর আদায় স্থগিত থাকবে। ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা করে খোলা রাখতে বলা হল।

সকল বেসরকারী বাণিজ্য ও শিল্প-সংস্থাগুলিকে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালাতে বলা হল। কিন্তু শিক্ষায়তনগুলি বন্ধ থাকবে। নির্দেশনামার ভবন-শীর্ষে কালো পতাকা ওড়াবার আদেশ বলবৎ রাখা হল।

শেখ মুজিবর, সারা বিশ্বের স্বাধীনতা-প্রেমিকদের কাছে এবং স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন বিশ্বের সেই সকল মানুষের সমর্থন কামনা করে আবেদন জানালেন।

তিনি বললেন, "যারা ষড়যন্ত্র করে শক্তির দ্বারা আমাদের শাসন করতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণ সংঘবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে কীভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয় তার প্রমাণ রেখেছেন। বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার এই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা যাবে না।

আমাদের পদানত করা যাবে না ; কারণ, প্রয়োজন হলে আমরা মরণকে বরণ করতে প্রস্তুত। কারণ, আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে, আমাদের বংশধররা মর্যাদার সঙ্গে এক স্বাধীন দেশে, স্বাধীন নাগরিকের জীপন যাপন করতে পারবেন।"

রহমান আরও বলেন, "বাংলাদেশের প্রতিটি নর, নারী ও শিশু আজ উন্নত শিরে দাঁড়াতে পারছেন। যাঁরা ভেবেছিলেন চরম শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আমাদের দাবিয়ে রাখা যাবে তাঁরা ভুল করেছেন। আজ বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষ—অফিসের কর্মী, কারখানার শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র—সবাই নির্দ্বিধায় এটা প্রমাণ করেছেন যে আত্ম-সমর্পণের পরিবর্তে তাঁরা মৃত্যুবরণে প্রস্তুত।

আজ সারা দেশবাসী সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। তাঁরা জানাচ্ছেন,

তাঁরা সামরিক শাসনের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। অতএব আমি সকলের কাছে, বিশেষ করে যাঁদের কাছে সর্বশেষ সামরিক হুকুম জারি করা হয়েছে তাঁদের বলছি, তাঁরা যেন ভীতিপ্রদর্শনের কাছে নত না হন। সারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের পিছনে রয়েছেন।"

ঘোষণার এই বয়ান শুনে ইয়াহিয়ার প্রাণ যায় আর কি! গোঁফে তা দিয়ে বসে, দিব্যি পাঁয়তারা কষছিলেন। ভেবেছিলেন, কখনো শাসানি, কখনো নরম সুরে কথা বলে কালহরণ করবেন। ততোদিনে টোপ ফেলে যদি কাউকে নিজের দলে ভেড়ান যায় তো মুজিবের জনপ্রিয়তাকে ম্লান করে দেবেন।

ইয়াহিয়া কোন্ স্বপ্ন-বিলাসে মত্ত ছিলেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু এবাবের বাঙালী, অন্য বাঙালী, চিরকালের সংগ্রামী বাঙালী, নিজের অধিকার বুঝে নেবার বাঙালী। ইয়াহিয়ার খাঁ সেই সত্য যখন বুঝলেন, তার আগে মুজিবর স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্খা পূরণ করলেন নিজের হাতে শাসন ভার নিয়ে।

এতদিন পর ভুল ভাঙলো ইয়াহিয়ার। ইসলামাবাদে বসে বসে এতদিন শুধু নরম গরম বাণী বিতরণ করেছেন, তাতেই তিনি ভেবেছিলেন, জনগণের দিল খুশ হবে। পূর্ব বাংলা তার যেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর সেই সাম্রাজ্যের মানুষগুলো তার অনুগত প্রজা, বেয়নেটের জোরে তাদের উপর শাসন আর শোষণ চাসিয়ে যাবেন তিনি চিরকাল। কিন্তু বিদ্রোহের গণ-অভ্যুত্থান তাঁর চোখ কিছুটা খুলে দিলো। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পড়ি কি মরি করে ছুটে এলেন ঢাকায়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নাটের গুরু মুজিবরের সংগে মোলাকাৎ করা, বাবা-বাছা বলে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করা।

কিন্তু মুজিবর কর্তব্যে কঠিন, সংকল্পে অটল, ব্যক্তিত্বে অবিচল। ইয়াহিয়ার ঢাকার আসবার খবর শুনে মুজিবর বললেন, ভালোই কথা। তিনি এসেছেন যখন, দেখে যান পূর্ব বাংলাকে আর কয়েক

দিন, অতিথি হয়ে থেকে যান। আর যাই হোক বাঙালী কারুর সংগে অভদ্রতা করে না।

সেই অতিথি কিন্তু জনগণের কাছে পেলেন শুধু ঘৃণা আর অবজ্ঞার থুতু। আসে-পাশে, চতুর্দিকে রাইফেল উচিয়ে ট্রাকের পর ট্রাক মিলিটারী ফৌজ, আর তার মধ্যে একটা ধুক্‌পুক্ করা প্রাণ কোন রকমে গিয়ে উঠলেন রাষ্ট্রপতি নিবাসে। সেখানে তাঁর ধুক্‌পুক্ করা প্রাণকে রক্ষা করার জন্য মেসিনগান বাহিনী সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সেখানেও যদি কোন কারণে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, তাহলে তেজগাঁও বিমানঘাটির কাছে পূর্বপাকিস্তানের জি ও সির বাসভবনও তৈয়ার। আর অবস্থা যদি আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে, তাহলে হেলিকপ্টর করে যাতে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে পারেন, তারও ঢালাও ব্যবস্থার এদিক-ওদিক হল না। কিন্তু নিজের জান বাঁচানোর জন্য ইয়াহিয়ার কেন এত বিপুল বিশাল আয়োজন? কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছেন, এখানের শক্ত মাটি তাঁর পায়ের তলায় নেই। তিনি যে কাঁচা মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাতে যে-কোন মুহূর্তে ধ্বস্ নামতে পারে। কেন্দ্রের সামরিক বাহিনীও তাঁর নির্দেশে চালিত হচ্ছে না, পূর্ববাংলার জনগণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, সরকারের উপর, যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর, পুলিস বাহিনীর উপর কোন হাত নেই তাঁর। সব কিছুর উপরই তিনি তার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। এমনকি বিচারপতিরা পর্যন্ত ইয়াহিয়া খাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন। সামরিক প্রথামত তাঁরা ঢাকার নব-নিযুক্ত টিক্কা খানকে কোন পাত্তা দেন নাই, শপথ পাঠ পর্যন্ত করান নি। যারা প্রতি মুহূর্তে শপথ ভঙ্গ করে চলেছেন, তাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে কি লাভ? একজন জবরদস্ত শাসককে প্রধান বিচারপতি শপথ পাঠ করাতে অস্বীকার করেছেন, ইতিহাসে এর নজীর কোথায়? এখন ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে মুজিবরের ভাষণ শোনাবার সময় সামরিক

কর্তৃপক্ষ বাধা দিলে, কয়েক ঘণ্টার জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে যায়।

আন্দোলন ক্রমশ দুর্বার গতিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগুতে থাকলো। তিন দিন ধরে চলল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। অহিংস আন্দোলনে বন্ধ স্কুল, কলেজ, বন্ধ সরকারী ও আধা সরকারী অফিস। পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে তার যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন।

এ এক অভুতপূর্ব ব্যাপার। গোটা জাতি নিজের বুকের রক্ত নিয়ে ইতিহাসের একটি শাশ্বত অধ্যায়কে রচনা করতে চলেছেন। পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসী এক মন এক প্রাণ হয়ে মুজিবরের পতাকা তলে এসে দাঁড়িয়েছেন, শুধু নয়ন মেলে দেখবার মত ব্যাপার। পরবর্তী বংশধরদের এই কীর্তি গাথা গৌরবের সংগে বলবার মত। আরো গৌরবের কথা, এই জাতি ভাবে ও ভাবনায়, বাঙালীত্ববোধে উদ্দীপিত তাঁরা যে ইতিহাস রচনা করতে চলেছেন তা বাঙালীর, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির। সপ্তকোটি প্রাণ এই ভাষায় কথা বলে, গান গায়, সুখ-দুঃখের ইতিহাস রচনা করে, এর চেয়ে বড়ো গৌরব আর কি হতে পারে?

পূর্ব বাংলার বিদ্রোহী প্রাণ যখন সৃষ্টির বেদনায় কাঁপছে, তখন ঢাকায় আসা ইয়াহিয়ার পক্ষে একটু বিপদজনক বৈকি! তবু, তাঁর সাধের সংসারে আগুন লেগেছে, একবার আসতে হবে বৈকি! না হলে সেই আগুনে নিজেরও তো পুড়ে মরবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু এসে কি করলেন? মুজিবরের সঙ্গে বাৎচিৎ করার জন্য প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে এলেন কেন ঢাকাতে? প্রথম দিন আলোচনা শুরু হল মুজিবর আর ইয়াহিয়ার মধ্যে। সংবাদপত্রে তার যা বিবরণ বেরুল, তাতে জানা গেল, ইয়াহিয়া নাকি শেখ মুজিবরকে বলেন: ২৫ তারিখ 'জাতীয় পরিষদ' বসলে ইনশাল্লাহ, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তো 'অটোম্যাটিক্যালি' 'মারশাল ল' উঠে যাবে। জবাবে মুজিবর প্রেসিডেন্টকে বলেন: নির্বাচনের পরেও যা ঘটলো তাতে যতদিন না

তিনি তাঁর কূট 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়াক'—আইনের কাঠামো বাতিল করে দিচ্ছেন, কুখ্যাত 'সামরিক আইন' তুলে নিচ্ছেন ততদিন 'বাংলা দেশের' মানুষের তাঁর মতিগতির উপর কোন আস্থা রাখবে না।

বৈঠকের প্রথমেই নাকি প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবরের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন জানান যে, শেখ সাহেব যেন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নেতা হিসাবে এই 'নিদারুণ জাতীয় সংকটের' একটা সমাধান খুঁজতে তাঁর সঙ্গে সহায়তা করেন।

শেখ মুজিবর জবাব দেন : বর্তমান সংকটের জন্য প্রেসিডেণ্ট দায়ী। পয়লা ও ছয়ই মার্চ তাঁর হঠকারী ঘোষণা ও তারপরের নির্মম গণহত্যাই পরিস্থিতিকে এত জটিল করে তুলেছে। আওয়ামী লীগের নয়া চারটি শর্ত প্রেসিডেণ্টেরই সৃষ্টি।

এদিকে জনতার দাবী কি ছিল? জনতার দাবী, চাই স্বাধীন বাংলা। তাঁরা রাষ্ট্রপতির বাসভবনের বৃত্তাকাব পথ পরিক্রমা করে আর উত্তাল তরঙ্গের মত গর্জন করতে থাকে, চাই স্বাধীন বাংলা, ইয়াহিয়া সাবধান।

শুধু পুরুষেরাই নয়, মুক্তি যুদ্ধেব সেনানী হয়েছে নারী-যুবতী-কিশোরীরাও। নবজাগরণেব ঢেউ তাঁদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায়। পূর্ব বাংলায় গড়ে তোলা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী। তাঁরা নিজেদের মধ্যে শরীর চর্চা, কুচকাওয়াজের অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। মিলিটাবী শাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে গোটা দেশ।

আওয়ামী লীগের জেনাবেল সেক্রেটাবি শ্রীতাজউদ্দিন আমেদ জনগণের কাছে এক আবেদনে বললেন, দেশের স্বার্থ, জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য শেখ মুজিবব রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গ ছাত্র ইউনিয়নের সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করেছেন, পূর্ব পাকিস্তান একটি সার্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র, যার

নাম 'বাংলা দেশ'। বাংলা দেশের নামে এই ঘোষণা সহ একটি ছাপানো ইস্তাহারও বিলি করা হল।

প্রথম দিনের অর্থাৎ ষোলই মার্চের আলোচনার পর আবার দ্বিতীয় দিনে আলোচনা বসলো। আলোচনার গতি দেখে মনে হল, কিছুটা আশার রোশনাই দেখা দিয়েছে। ইয়াহিয়া খাঁ বারো দফা দাবীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন, মুজিবর ব্যাখ্যা করেছেন।

যেমন প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ফৌজ সরিয়ে নেওয়া বলতে শেখ সাহেব ঠিক কী চাইছেন?

শোনা যাচ্ছে, শেখ মুজিবর জবাব দেন: (ক) বর্তমান সঙ্কটের পূর্ববঙ্গে যে ফৌজ ছিল তার অতিরিক্ত 'আমদানি করা' সৈন্য ও অফিসারদের প্রত্যেককে অবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠাতে হবে। (খ) পূর্ববঙ্গের প্রসাশনে সামরিক বাহিনীর বিন্দুমাত্র অংশ থাকবে না।

ইয়াহিয়া প্রশ্ন করেন: 'গণহত্যার' তদন্ত কিভাবে হতে পাবে?

মুজিবর নাকি সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্ট-এর বিচারপতি এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশনের কথা বলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাখ্যা প্রেসিডেণ্ট চেয়েছেন তা নাকি হোল 'মারশাল ল' তুলে নেওয়া বিষয়ে—(ক) ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াহিয়া তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলে কী মুজিবর সন্তুষ্ট হবেন? অথবা, (খ) মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা হাতে নেবার আগে দেশে যে ধরণের বুনিয়াদ 'গণতান্ত্রিক' অবস্থা ছিল আপাতত তাতে প্রত্যাবর্তন কি আওয়ামী লীগের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে?

শেখ মুজিবর উত্তর দেন: অত আইনের মারপ্যাঁচ তিনি জানেন না। সামরিক আইন তুলে নেওয়া বলতে তিনি বোঝেন দেশের দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে ফৌজীবাহিনীর সম্পূর্ণ

নির্বাসন। ফৌজের একমাত্র কর্তব্য হবে, প্রয়োজনে বাইরের শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষা।

সেদিন ছিল মুজিবরের বাহান্নতম জন্মদিন। বিশেষ আড়ম্বরের সংগে জনগণ তাঁদের প্রিয় নেতার জন্মদিন পালন করেন। মসজিদে মসজিদে এই মহান নেতার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করেন জনগণ।

তৃতীয় দিন-ও আলোচনা চলে। মুজিবর সাংবাদিকদের বলেন, তিনি আশাবাদী। কিন্তু সেই সংগে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলায় তিনি প্রস্তুত।

এদিকে মুজিবর অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে ইয়াহিয়ার সর্বশাহী বাহিনী যে নিষ্ঠুরতম গণ-হত্যা চালিয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যে গ... তদন্ত কমিশন তাঁরা বয়কট করেছেন।

সামরিক প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিশন প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে পারবে না—এই যুক্তিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তদন্ত কমিশনে আপত্তি জানিয়ে শেখ মুজিবর স্বয়ং 'চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জায়গার সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণ ও অন্যান্য ঘটনা' তদন্ত করে দেখার জন্য তিনজন সদস্যের এক তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

সামরিক প্রশাসনের তদন্ত কমিশনে যেখানে সৈন্যবাহিনী, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী, পুলিশ ও সিভিল সার্ভিস প্রতিনিধিদের নেবার কথা হয়েছিল, সেখানে শেখ মুজিবর তাঁর কমিটিতে নিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে বিধানসভার আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীমনসুর আলি ও আওয়ামী লীগের একজন উপ-সভাপতি শ্রীমুস্তাক আমেদকে। তৃতীয় সদস্যের নাম তখনও জানা যায় নি।

ঠিক হয় সামরিক প্রশাসনের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসনের কাছে পেশ করা হবে, সেখানেই শেখ মুজিবরের কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হবে।

শেখ মুজিবর রহমন ঘোষণা করেন, "বাংলা দেশের মানুষ সরকারের কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না।' তদন্তের বিষয়গুলি

নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়ায় পাঁচজন সদস্যের ঐ প্রস্তাবিত কমিশন 'সত্যিকারের নৃশংসতা' সম্বন্ধ তদন্ত করে দেখতে পারবেন না এবং এটা জনগণকে বিভ্রান্ত করার একটা কৌশল মাত্র, কেউ যেন এই কমিশনে কোনো সদস্য মনোনীত না করেন এবং সদস্য হিসাবে কাজও না করেন।" কারণ এই কমিশনের তদন্তের পরিসীমা এতই ক্ষুদ্র যে. কমিশন কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকারের পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে পারবে না।

মুজিবর বলেছেন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তেব দাবীতে আমরা অটল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ন্যায্য দাবীব জন্যে সংগ্রাম করছেন এবং এই ব্যাপারে কোন সমঝোতা সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, শেষ পর্যন্ত জনগণই জয়ী হবেন।

ঢাকা বেতাব কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, গতকাল মুজিবর তাঁর বাড়ীর বাইরে সমবেত এক বিশাল জনতার সামনে বক্তৃতা দান কালে বলেছিলেন যে, তাঁদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত জনগণ যেন যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন। নিজে তিনি শেষরক্ত বিন্দু দিতে প্রস্তুত আছেন।

আলোচনা এগিয়ে চলেছে এই ছিল পরবর্ত্তী দিনের সংবাদ পিপলস্ পার্টির চেয়্যারম্যান ভুট্টো সাহেবও এই আলোচনায় যোগদানের জন্য ঢাকায় এসেছেন। তিনি নাকি আলোচনায় মদৎ জোগাবেন। ইয়াহিয়া ও মুজিবরের আলোচনা চলে তিন ঘণ্টার-ও বেশী। সেদিনের আলোচনায় তাঁকে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর দলের ৬ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ, শ্রীকামরুজ্জমান, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, খণ্ডকার মুস্তাক আমেদ, শ্রীমনসুর আলি এবং ডঃ কামাল হোসেন। আর প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়াকে সাহায্য করেন পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রী এ আর কর্ণেলিয়াস-সহ তিনজন উপদেষ্টা।

কিন্তু একদিকে আলোচনা, অন্যদিকে বন্দুকেরগুলি এই হল

ইয়াহিয়া খাঁয়ের ভদ্রতাব নমুনা। একদিকে ভালো কথা, অন্যদিকে চোখ রাঙানী, একদিকে ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে সোহাগ, এই হল পশ্চিম পাকিস্তানের উজীরে আলমদের চিরন্তন শাশ্বত বাণী। সামরিক ফৌজ ঠাণ্ডা মাথায় কেমন করে মানুষ হত্যায় পিছ-পা হয় না, তার নজীব একটি ছোট ঘটনাতেই বোঝা যায়।

ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে জয়দেবপুরে পাকিস্তানী ফৌজেব গুলিতে ৩০ জন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঢাকা বেতার কেন্দ্র এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

জয়দেবপুব লেভেল ক্রসিংএব কাছে ঘটনাটি ঘটে। ওই সময় একজন সামরিক কম্যানডাব তাঁব পরিদর্শন সফর শেষ করে ফিবে আসছিলেন। এই কম্যানডাবের সশস্ত্র রক্ষীরা দেখেন যে, ট্রেন দাঁড় করিয়ে লেভেল ক্রসিং-এ অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন এই অবরোধ সবিয়ে ফেলতে বলা হয়, তখন স্থানীয় অধিবাসীরা তা করতে অস্বীকার কবেন। সরকারী বর্ণনায় বলা হয় যে, ফৌজরা যখন ট্রেনটিকে সবিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল তখন কয়েকজন লোক সৈন্যদেব উপর গুলি ছোঁড়েন। ফলে ৩ জন সৈন্য আহত হয়। সৈন্যরা তখন পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। তিনজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হন জনতা তখন সৈন্যদেব কাছ থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়। সৈন্যরা দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ে। এই সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন নিহত এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোক আহত হন। পাঞ্জাব রেজিমেণ্টাল ইউনিটেব ফৌজরা তখন প্রহরারত ইস্ট পাকিস্তান বাইফেলসের বক্ষীদেব নিরস্ত্র করে ফেলে। সৈন্যরা আবাসিক ভবনগুলির ভিতর ঢুকে পড়ে এবং বাসিন্দাদের নিগৃহীত করে। এমনকি নারী ও শিশুরাও ফৌজী নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন শেখ মুজিবর রহমান বলেন—"এরূপ বর্বর শক্তির দ্বারা বাঙালীদের দমন করা যাবে, সেদিন চলে গেছে। বাংলাদেশেব সাড়ে সাত কোটি মানুষ রক্ত ঝরাতে শিখেছে।

বাঙালীরা লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য কোনো ত্যাগকেই বড়ো বলে মনে করবে না।

কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে থাকেন যে, এইরূপ নৃশংসতায় তাঁরা জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবেন, তবে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। দেশ বর্তমানে যে রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন, তার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে। কিন্তু ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে।"

সেই চিরকালের ছাত্র-সমাজ, যুগে যুগে যারা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁরাও এলেন আগ্রহী ভূমিকা নিয়ে। আলোচনা চলুক ক্ষতি নেই। কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁর মতি-গতি বোঝা বড়ো দায়। তাই প্রতি মুহূর্তে হুঁশিয়ার থাকতে হবে, সতর্ক হতে হবে, জীবনের যে কোন মূল্যে লাভ করতে হবে স্বাধিকারকে। পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-সমাজ মঙ্গলবার প্রতিরোধ দিবস পালন করা হবে বলে ঘোষণা করেন। ওই দিনই হল পাকিস্তান দিবস। ওঁদের দাবি ওই দিন ঢাকার প্রতিটি বাড়িতে নতুন পতাকা তুলতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র নেতারা বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি অধিবাসী মুক্তির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত। যাঁরা স্বাধীনতাকে মনে প্রাণে ভালবাসেন এবং যাঁরা সর্বদাই যুক্তিসঙ্গত কারণে পিছনে থাকেন তাঁরা এই মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করবেন। ৭ কোটি নিরস্ত্র বাঙালী সেনাবাহিনীর মেশিনগানের ও নাপাম বোমার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এ লড়াই মুক্তির লড়াই। ৭ কোটি মানুষের ন্যায্য দাবিকে পর্যদস্ত করার উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনীকে বহু মাইল দূর থেকে নিয়ে এসে কাজে লাগানো হচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের এই সংগ্রামকে আমেরিকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়, এখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধিকারের দাবি তুলেছে। যে কোন মূল্যেই হোক, এ অধিকার অর্জন করতেই হবে।

আলোচনা তবু চলতে লাগলো। কিন্তু ইয়াহিয়া এত টাল-বাহানা করছেন কেন? তার পর কয়েক দিনই তো আলোচনা চললো। কিন্তু ভদ্রলোক কি করতে চান, তা বোঝা গেল না। শুধু যাঁরা রাজনৈতিক ভাষ্যকার. তাঁরা আশার বাণী শোনালেন। একটা সম্মানজনক আপোষরক্ষার পথে এগিয়ে চলেছে আলোচনা. এই হল সংবাদ-ভাষ্য। কিন্তু কোন ভিত্তিতে?

'পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক সরকার ঐ উভয় অংশের প্রতিনিধি সভার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

দেশ বিভাগের সাত বছর আগে অল ইণ্ডিয়া মুস্লিম লীগ লাহোরে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তারই ভিত্তিতে দুটি স্বতন্ত্র সংবিধান পরিষদ ডাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে বলা হয়।

—লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বে অবস্থিত মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন মুস্লিম রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং ঐ রাষ্ট্রগুলি হবে স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম।'

সেইরূপ দুটি স্বতন্ত্র সংবিধান পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করবে বলে সকলে আশা করেন।

১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুস্লিম লীগের অধিবেশনে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের যে নক্সা করা হয়েছিল, তাতে কি ছিল? ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ভৌগলিক ইউনিটগুলিকে এমন কয়েকটি অঞ্চলে গঠন করতে হবে, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী আঞ্চলিক পূনর্বিন্যাস করে সীমান্ত প্রদেশের মত মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের পূর্বাঞ্চলগুলিও ইনডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটস হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ঐ অঞ্চলগুলি হবে স্বায়ত্তশাসিত, তাদের সার্বভৌম অধিকার থাকবে। মুস্লিম লীগের ঐ প্রস্তাবে একদিকে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে এমন একটি ফেডারেশন করার কথা বলা হয়েছে যাতে ঐ ফেডারেশনের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম অধিকার

থাকবে। পূর্বাঞ্চলেও ঠিক অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী ফেডারেশন করার কথা বলা হয়েছে।

শেখ মুজিবর পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করে কেবল পূর্ববাংলার নয়, সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জন্যও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করতে চলেছেন বলে মনে হল।

মুজিবর রহমান ঢাকায় জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন এবং তার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সামগ্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন দাবী করেছেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত পুস্তক আমাদের বাঁচার দাবী : ৬ দফা কর্মসূচীতে ঐ পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর এই বর্তমান আন্দোলনও ঐ কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিচালিত।

ঐ কর্মসূচীর ১ নম্বর দফায় তিনি বলেছেন যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনরূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার থাকবে। কর্ম-সূচীর ২নং দফায় তিনি বলেছেন যে, ফেডারেশন সরকারের অধীন কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ বিষয় দুটি থাকবে। এছাড়া পূর্ব-বাংলাকে প্রদেশ না বলে 'ষ্টেট' বলতে হবে।

৩নং দফায় তিনি বলেছেন, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। ৪নং দফায় বলা হয়েছে, সকল প্রকার ট্যাকস খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে থাকবে। ৫নং দফায় বলা হয়েছে যে, পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্বের আয় ও ব্যয়ের হিসাব আদালা আলাদা থাকবে। পূর্ববাংলার অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পূর্ববাংলার এক্তিয়ারে থাকবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারে থাকবে। ৬নং দফায় পূর্ববাংলার জন্য এক পৃথক মিলিশিয়া গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

ওদিকে শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বাসভবনের সম্মুখে এক

জনসমাবেশে বললেন, "বাংলাদেশের মানুষ যে রক্ত বিসর্জন করেছে তা বৃথা যাবে না। প্রয়োজন হলে আমরা আরও দুঃখবরণ করবো, আরও প্রাণ দানের জন্য প্রস্তুত হবো। কারণ আমরা জানি যে, স্বাধীনতার দাবিকে অস্বীকারের ক্ষমতা বিশ্বের কোন শক্তির নেই। শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই।"

জয় হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তাই জঙ্গী বাহিনী মরিয়া হয়ে উঠেছে। ছাব্বিশে মার্চ তারিখে, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ববাংলায় নূতন করে আবার সন্ত্রাসের রাজনীতি আমদানি করলো। রংপুর, চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুরে সেনাদের বেপরোয়া গুলি চালনায় নিহত হয় অন্ততপক্ষে একশো দশজন।

চট্টগ্রাম বন্দরে একটি জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাস করতে ডক কর্মীরা অস্বীকার করেন। তাই সেনাবাহিনীর লোকেরা ওই জাহাজ থেকে মাল খালাস করতে গেলে হাজার হাজার লোক তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। জনসাধারণের দিক থেকে প্রতিরোধ এলে সেনাবাহিনী বিনা প্ররোচনায় নিরস্ত্র লোকদের ওপর গুলি ছোঁড়ে।

রংপুরের ডেপুটি কমিশনার এই বলে অভিযোগ করেন যে, 'তার সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করেই সেনাবাহিনী ওই এলাকার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়েছেন। এখানে অন্ততপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছে।

রংপুরে রাত ৭টা থেকে ২৪ ঘণ্টার কার্ফু জারি করা হয়। বিকালে চার ঘণ্টার জন্য কার্ফু শিথিল করা হয়। বিকাল ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কার্ফু পুনরায় বলবৎ করা হয়।

খবরে জানা যায়, এই হাঙ্গামায় সেনাবাহিনীর লোকেরাই বস্তুতপক্ষে এখানে 'বিনা প্ররোচনায়' গুলি চালায়।

রংপুরে জনসাধারণ সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িকে আক্রমণ করে। ফলে সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক আহত হয়। বেতারে প্রচারিত খবরে বলা হয়, অন্তত ৫০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং সেগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

মুজিবর এই ঘটনায় তীব্র মর্মবেদনা প্রকাশ করে বলেন, "এ ধরণের নির্লজ্জ বর্বরতার ঘটনায় যে-কোন সভ্যদেশের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে আসবে। আমরা কি কোন সভ্যদেশে বাস করছি? এই দুঃসহ ঘটনার প্রতিবাদে আগামীকাল হরতাল পালন করা হবে। শহীদদের রক্তধারা আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না।"

আরও খবর ছিল, ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবরের দাবী মেনে নিয়েছেন। জনগণ ভাবলেন, যাই হোক, বিলম্বে হলেও তাঁর সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন, কোন জাতিকে চিরকাল দাবীয়ে রাখা চলে না। শায়ত্বশাসনের দাবী তিনি মেনে নিয়েছেন, এবার জনগণের হাতেই তুলে দেবেন তাঁদের সার্বিক কল্যাণের রথ-চক্রকে।

কিন্তু রক্তের স্বাদ একবার তিনি পেয়েছেন। গোটা পাকিস্তানের তিনি শায়েন-শা, এ কি চাট্টিখানি কথা? শয়তানীর রক্ত তাঁর হাড়ে-মজ্জায় বাসা বেঁধেছে, শঠতাই তাঁর জীবনের ব্রত, শপথ-ভঙ্গ ই তাঁর জীবনের আদর্শ, সামরিক ফৌজ-ই তাঁর শক্তির মূলধন। সেই মূলধনকে সম্বল করে তিনি বসালেন পূর্ববাংলার বুকে এক কামড়। বুলেট বিদ্ধ মরণোন্মুখ বাঘ মরার আগে বসায় যেমন শেষ কামড়, ঝরায় অনেক রক্ত, দেহকে করে ক্ষত বিক্ষত।

সেই মরণ কামড়-ই বসালেন ২৬শে মার্চ পূর্ব বাংলার বুকে। কিন্তু তিনি হয়তো বুঝতে পারেন নি, পূর্ব বাংলার কলজী অনেক শক্ত, বুক অনেক জোরালো। অনেক রক্ত, অনেক যন্ত্রণা, অনেক জীবনের বিনিময়ে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা বুঝিয়ে দিয়েছে তা বারবার। যে দুর্ধর্ষ প্রাণ-শক্তিকে বিনষ্ট করতে পারে নি রাইফেলের গুলি, অরাজকতার ছুরি, মহামারীর তাণ্ডব, তাকে কি খতম করতে পারবেন ইয়াহিয়া খাঁ? সেই তাকৎ কি আর তাঁর আছে?

পূর্ব বাংলার ইতিহাস কি সেই কথা বলে? ইতিহাসের গতিকে স্তব্ধ করবার ক্ষমতা যদি ইয়াহিয়ার থাকতো, তবে কেন এই বিদ্রোহ, কেন এই জন জাগরণ, কেন এই আত্মলাঞ্ছনার কণ্টকাকীর্ণ পথকে বরণ?

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া খাঁ চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে পূর্ব বাংলা থেকে গা ঢাকা দিলেন। তারপর বেইমান অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ঘোষণা করলেন, 'গোটা পূর্ব বাংলায় জরুরী অবস্থা বলবৎ হল'।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান পুরোহিত, গোটা জাতির যিনি হৃৎপিণ্ড, তিনি পেয়েছেন 'দেশদ্রোহী' খেতাব, তিনি হলেন পাকিস্তানের দুষমণ। তিনি নাকি পাকিস্তানকে ভাঙতে চান, তিনি নাকি পাক জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান করেছেন। এটা তার গুরুতর অপরাধ। সেই গুরুতর অপরাধের শাস্তি কি ?—মুজিবরের গর্দান নেওয়া। কিন্তু তিনি মুজিবরের গর্দান নিতে পেরেছেন কি ?

তবে এ কথা সকলে বিশ্বাস করে, বর্বরতার অনেক কু-কীর্তি রেখে যাবার ক্ষমতা তাদের আছে। তারা যে মানুষ মারার নিপুণ কারিগর, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। শুধু মানুষ কেন, ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে ভেঙে চুরমার করে করবস্থ করতেও ওদের কোন কুণ্ঠা নেই। কারণ, ওসব ওদের ধাতে সহ্য হয় না। ওরা বোঝে শুধু রাইফেল, মেসিনগান আর ট্যাঙ্ক। ওরা বোঝে এই সব বিপুল রণ-সম্ভার নিয়ে নিরীহ শান্ত লোকের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং রক্তের হোলিতে নিজের হাত রঞ্জিত করা। এতেই ওদের গৌরব, এতেই ওদের আনন্দ।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে, শহরে, প্রতিটি মানুষেরা আজ মুক্তির উৎসব পালন করে চলেছে। কোথায় গেল জিন্না সাহেবের সেই দ্বি-জাতিতত্ত্বের বড় সাধের সাধনা, যার উপর ভিত্তি করে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন ? আজ তাঁর থিয়োরী ব্যুমেরাং হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করে চলেছে। সেই কবরের উপর দিয়েই পরিপূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে বাঙালী জাতি। ধর্মকেই একমাত্র দ্বি-জাতি তত্ত্বের হাতিয়ার হিসেবে মেনে নেওয়া বলে না, তাঁর নির্ভুল নিখুঁত প্রমাণ রাখলেন পূর্ব বাংলার বাঙালীরা। তার অর্থ অবশ্যই এই নয়, ধর্মকে তাঁরা অস্বীকার করেছেন। পশ্চিমাঞ্চলের যে কোন

একনিষ্ঠ মুসলমান অপেক্ষা বাঙালী মুসলমান কোন অংশে নিকৃষ্ট নয় যেহেতু তাঁরা আরবী হরফ গ্রহণ করেননি, উর্দ্দু ভাষাকে একতরফা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে চাননি, সেই কারণে কি? কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা ভুলে গিয়েছিলেন, ধর্ম ও সংস্কৃতি এক বস্তু নয়, দুটির মধ্যে ফাবাক আছে। সংস্কৃতি একটি ভৌগলিক এলাকাব মানুষের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নৃতত্ত্ব, জলবায়ু, তাদের জীবন যাত্রাব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর দিয়ে তৈরী হচ্ছে থাকে সংস্কৃতির শক্ত বনিয়াদ। একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী আরবেও থাকতে পারে, আবার চীনেও থাকতে পারে। কিন্তু চীনের মুসলমান যেহেতু ইসলামাবলম্বী, সেই হেতু আরবের সংস্কৃতিতে তাকে মগজ ধোলাই করতে হবে, এই যুক্তি যাঁরা দেন, তাঁদের বুদ্ধিব সুস্থতায় সন্দেহ জাগে।

কিন্তু সেই আজব যুক্তির দোহাই পেড়ে, দ্বি-জাতি তত্ত্বেব ধুয়া তুলে আদায় করে নিলেন পাকিস্তানকে। আমরা তাঁর সেই পাগলামিতে সায় দিয়েছিলাম অথবা দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কিন্তু মানুষের মোহ যেদিন কেটে যায়, ধর্মান্ধতার কালো চশমা যখন খুলে ফেলে, তখন মানুষ লাভ কবে সত্য দৃষ্টি। এই সত্য দৃষ্টি, বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টি পরিচিত করায় বাস্তব পৃথিবীকে। সেই সাংস্কৃতিক দৃষ্টি যখন লাভ কবে তখন একটি জাতিকে কোন কিছুর মূল্যে-ই আর ধবে রাখা যায় না। সৃষ্টিব উন্মাজনায় সে লাভ করে নবজীবন, চোখে মুখে জ্বলতে থাকে কঠিন শপথের জ্যোতি।

কিন্তু সেই জেগে ওঠা জাতির ওপর বর্বরশাহী বাহিনীর যে তাণ্ডব লীলা চলেছে, তা যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁদের ভাষাতেই কিছুটা তুলে ধরি। ঢাকার বিশিষ্ট লেখক শ্রীমেসবাহুল হক লিখেছেন দৈনিক আনন্দবাজারে:

"আশ্চর্য। হঠাৎ যেন পৃথিবী দ্রুতগতিতে পিছিয়ে গেল এক লোমহর্ষক বর্বরতম যুগে। শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, সাহিত্য নেই,

সংস্কৃতি নেই, নেই কোন বিদ্যার চর্চা। আছে শুধু হত্যা আর ধ্বংস। বর্বরতার চরম প্রকাশ।

যে চেঙ্গিস খাঁ আর নাদির শাহের হত্যালীলা আর বর্বরতার কাহিনী বহন করে আজও ইতিহাস লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে ওঠে, সভ্যতার মধ্যাহ্ন লগ্নে পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর বর্বরতা তার তুলনায় খুবই নগণ্য

বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ জঙ্গীশাহীর দুর্বিসহ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন একজোট হয়ে একটা সুন্দর উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ছিল ঠিক তখনই ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী ফৌজ অতর্কিত নিদ্রার কোলে সুপ্ত ঢাকাবাসীর উপর চালালো বিশ্বের জঘন্যতম আক্রমণ। নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা করতে লাগলো পাইকারি হারে। জ্বালিয়ে দিল বস্তির পর বস্তি নিরীহ মানুষের শান্তির নীড়। ধ্বংস করে দিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল আর মন্দির। ঘরে ঘরে ঢুকে হত্যা করতে লাগলো জ্ঞানী পণ্ডিত, অধ্যাপক আর সাহিত্যসেবীদের। হত্যা করতে লাগলো ছাত্র, যুবক, আর শ্রমিকদের। এমন কি মসজিদের মিনারে দাঁড়িয়ে আজানরত মোয়াজ্জিমও বাদ পড়ল না।

লক্ষ লক্ষ আতঙ্কিত মানুষ ছুটলো গ্রামের পথে। মরতে লাগলো পথে-বিপথে। না খেয়ে, পথ-কষ্টে অথবা পথ আগলে রাখা জঙ্গী ফৌজের হাতে।

গত তেইশ বছর ধরে শুনে আসছি আমরা উভয় পাকিস্তানের অধিবাসী পরস্পর ভাই ভাই। যেহেতু তারা মুসলমান। ভাইকে হত্যা করছে পথে ঘাটে শিয়াল কুকুরের মত! হাজার পাকিস্তান! হায়রে মুসলমান!

ইয়াহিয়া খান সাহেব ঘোষণা করেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশদ্রোহী। আওয়ামী লীগ বেআইনী। অর্থাৎ এ-দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ বেআইনী আর দেশদ্রোহী। তাই হয়তো এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে হত্যার এই চেষ্টা। বাংলা

দেশের মানুষ আজ শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে বিশ্বাসী। সমগ্র দেশের অর্ধেক মানুষও যদি হত্যা করা হয় বাকী অর্ধেককে জঙ্গী ফৌজ মেসিনগান আর ট্যাঙ্ক-এব ভয় দেখিয়ে চুপ করাতে পারবে না। এ দেশের মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। জয় আমাদের হবেই হবে। আমরা হতে চাই না বেইমান কুচক্রী মুসলমান, আমরা হতে চাই সত্যিকার মানুষ। বাঁচতে চাই স্বাধীন মানুষের মত।

হত্যা আব হত্যা। হত্যার চরমতম-লীলাক্ষেত্র ঢাকানগরী। নগরীতে বিচবণ করে বেড়াচ্ছে পশ্চিমা হিংস্র পশুগুলো, যাদের উল্লাসে ঢাকানগরী মহাশ্মশান হতে চলেছে। নির্বিবাদে চলছে ওদের পাশবিকতা—বর্ণনা করতে গিয়ে শরীর শিউরে ওঠে—ইতিহাস লজ্জায় মুখ লুকোয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে আজ একই শপথ নিতে বাধ্য করেছে যে যেমন করেই হোক, যত রক্তের বিনিময়েই হোক আমবা স্বাধীনতা আনবই এবং সে শপথে কোন আপস নেই।

২৫ মার্চ রাতে কোনরকম উসকানি ছাড়াই পাঞ্জাবী হানাদাররা, কোনরূপ সংকেত ছাড়াই চালায় অতর্কিত আক্রমণ, যে আক্রমণের শিকার হল হাজাব হাজাব পুলিশ, ই পি আর, ছাত্র, শিক্ষক আব শ্রমিক। রোমেব আগুন কদিন জ্বলেছিল আমার জানা নেই, কিন্তু ঢাকায় ২৫ মার্চ থেকে জ্বলছে পথেপ্রান্তরে আগুনের লেলিহান শিখা এবং তার সাথে চলছে যুদ্ধাস্ত্র, বুলেট—আত্মবলি দিচ্ছে অগণিত বঙ্গ সন্তান। কী অপরাধ এদের ছিল, কী পাপ এদের ছিল!

মা-বোনেরা আজ আর কাঁদছে না। ছেলেদেব জীবনের মায়া ছেড়ে তারা এই বলে পাঠিয়ে দিচ্ছে: শত্রু খতম করে যদি আসতে পারো তবে আবার দেখা হবে। পাঞ্জাবি হানাদাররা পাইকারি হারে যুবকদের ধরে নিয়ে হত্যা করছে। পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছে ছাত্র যুবকরা, চোখেমুখে তাদের দুর্জয় শপথ—প্রতিশোধ আমরা নেবই নেব। বাংলা দেশের স্বাধীনতা আমরা আনবই। পশ্চিমা ঐ বর্বর পশুদের

সাথে আপস নেই। এ সংগ্রাম আমাদের আপসহীন সংগ্রাম। মরতে হয় সবাই আমরা মরব তবু আপস করতে যাব না।

দিনের পর দিন ওরা ব্যাপক হত্যা আর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহায়তায় পশ্চিমা অবাঙ্গালীরা করছে লুঠতরাজ আর অত্যাচার। তাদের সে লোমহর্ষক অত্যাচারের কথা বর্ণনার বাইরে চলে গিয়েছে। সেনাবাহিনী ছাত্রী হলে হানা দিয়ে করেছে ধর্ষণ, হত্যা আর কিছু সংখ্যক ছাত্রীকে ধরে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে। সান্ধ্য আইন জারি করা হয় বটে, তবে বিরতি সময়ে চলে ওদের হত্যা-যজ্ঞ আর অগ্নিসংযোগ। সান্ধ্য আইনের সময়ে চলে মৃতদেহ পাচার। শুধু তাই নয়, সংলগ্ন এলাকাগুলো থেকে গরু-বাছুর ছাগল মুরগি ওরা নিয়ে যায়, দোকানে দোকানে চালায় লুঠতরাজ। মানুষ নিধন করে ওরা হাসে আর তামাসা দেখে। বাঙ্গালীর রক্তস্রোতে ঢাকা রাজধানীর জনপথ ভেসে যাচ্ছে, যারা বেঁচে আছে, তারাও মৃত্যুর দিন গুনছে। আওয়ামী লীগ কর্মী, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক আর হিন্দুই ওদের আক্রমণের লক্ষ্য। ওরা বলে অফিসে আসতে, নিজের নিজের বাসস্থানে ফিরে আসতে আর রাত দিন চলে ওদের হত্যালীলা। আজ ছাত্র ও যুবকেরা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে গ্রামবাংলার পথে প্রান্তরে ঘুরছে। মা বোনেরা অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছেন। যুদ্ধের ইতিহাস আমরা পড়েছি, কিন্তু এমনি নিরাহ জনসাধারণকে হত্যার কোন ইতিহাস আমরা জানি না। রাতে দেখেছি যেন ঝাঁকের পর ঝাঁক অগ্নিবাণ আকাশের বুক বেয়ে উড়ে আসছে আর নিধন করছে অগুনতি নারীপুরুষকে। বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের আবেদন, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর এই ন্যায্য সংগ্রামে সমর্থন দিয়ে তারা যেন সর্বপ্রকার সাহায্য পাঠান। নইলে বাঙ্গালীর কাছে, মানবতার কাছে, গণতন্ত্রের কাছে তথা ইতিহাসের কাছে তাঁরা অপরাধী থেকে যাবেন।”

পাকিস্তান সৃষ্টির আদিকথা

পাকিস্তান সৃষ্টির আদিকথা কি? মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন কি? তা জানতে হলে ইতিহাসের গতিকে নিয়ে যেতে হবে পিছিয়ে সেই তখন, যখন ভারত সচিব লর্ড মর্লি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, “তিনি চান ভারতে প্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসন রিফর্ম করতে।”

সেই সংস্কার ভারতে পয়দা করলো অশ্বডিম্ব। কিন্তু ভাবিয়ে তুললো মেহেদি আলি খানকে, নবাব মহসিন-উল-মুল্ক নামেও যিনি পরিচিত। করা যায় কী ঘোড়া ডিঙিয়ে কী করে ঘাস খাওয়া যায়, এই হয়ে উঠলো তাঁর দিবারাত্রির কাব্য। অবশেষে পেলেন তিনি পথ, দেখলেন আশার আলো। চাই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের ফতোয়া, চাই লর্ড মর্লির ঘোষণা দ্বারা মুসলমানদের মোল্লাতন্ত্রের ছায়াকে কায়েম করতে।

কিন্তু কেমন করে করেন সেই আব্দার? কেমন করে তোলেন লীগের সাম্প্রদায়িকতায়? কেন, আছেন আলিগড় মুসলিম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইংরেজ সাহেব ডব্লিউ এ. জে. আর্কিবল্ড। আর ভাবনা কি, যেই চিন্তা, সেই কাজ। পোঁ ধরলেন সাহেবের কাছে, রাজ প্রতিনিধি লর্ড মিন্টো ও গভর্ণর জেনারেলের সংগে করাতে হবে আলাপ, বলতে হবে বাৎচিৎ, করে দিতে হবে তার বন্দোবস্ত।

অধ্যক্ষ দেখলেন, অন্যায় কি, ভেদনীতির সূর্যোদয় ঘটাবার

এই তো সুযোগ, এই তো সময়। অতএব, লিখলেন চিঠি, করলেন আবেদন, ধরলেন আব্দার।

লর্ড মিন্টো এখান থেকে দিলেন সবুজ সংকেত। সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এলো স্বাগত বাণী, বসলো আসর, জমলো বাসর। পঁয়ত্রিশ জন মুসলমান ভদ্রলোক হলেন বরযাত্রী, তাঁদের বর হলেন মহামান্য আগা খান। মিললো জামাই, চললো খানাপিনা। লর্ড মিন্টো করলেন তাঁদের অভ্যর্থনা।

তারপর ভাঙলো আসর, এলো বিদায়ের পালা। মহামান্য আগাখান নিকা করা বধূকে নিয়ে এলেন শয্যা বাসরে। বরপণ বাবদ লর্ড মিন্টোর হাতে তুলে দিলেন এক যোজন ব্যাপী লম্বা এক বিরাট ফিরিস্তি। সেই বরপণ আদায়ের ফুসমন্তর কানে কানে দিয়ে ছিলেন নবাব মহসিন-উল-মুলক সাহেব ও তার কাঁধার ছায়া নবাব ইমাজুল মুলক সাহেব।

বরপণের সেই স্মরণীয় বয়ানটি ইতিহাসে আজও কুখ্যাত হয়ে রয়েছে। কী সেই বরপণ, তাদের ভাষাতেই উদ্ধার করি সেই অবিকৃত দলিল :

"A community in itself more numerous than the entire population of any first class European Power except Russia may justly lay down adequate recognition."

অর্থাৎ বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় :

রাশিয়াকে মানচিত্রের বাইরে রাখলে, যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ইউরোপের যে-কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে বহুৎ জবরদস্ত, সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা আলবৎ দাবী করতে পারে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের।

এই সহজ বাৎটি তোমাদের মস্তিষ্কে ঢুকছে না কেন, বাপু হে। অতএব, করো ব্যবস্থা বরপণ মাফিক স্বতন্ত্র নির্বাচনের অঙ্গীকার।

বরপণ দাবীর সেই দিনটি ছিল ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর।

দাবীর সেই সনদ মানলেন না তাঁরা একবাক্যে। একটু দরকষাকষি করলেন তাঁরা। একেবারে একবাক্যে দাবীর সব ফতোয়া মেনে নিলে ভদ্র সমাজ বলবে কি! আর বর কর্তারাও কি ভাববেন! তাছাড়া স্বভাব নেই বদলাবের-ও। তারা নিশ্চয়ই [illegible] বদনামে পাছড়ে পড়বে, মেয়ে নিশ্চয়ই কান-ঘোড়, নাইলে [illegible]-এর সব অসম্ভব উদ্ভট আব্দার মেনে নেবে কেন।

অতএব, বন্ধু, যাঁরে আনবেন চিতা-শয্যা প্রস্তুত হলে তাঁরাই হবে একচ্ছত্র উত্তরাধিকারী। তার মধ্যে একটু [illegible], তবে সাধ মেটানো হবে বৈকি!

বরকর্তা দেখলেন, মন্দ কি বহুৎ না মিলে তো থোড়া থোড়া, তাতেই [illegible] দিল খুশ্। আগে তৈরী হোক [illegible], [illegible] অপরের দাবী করলেই চলবে।

অতএব [illegible] চলতে লাগলো তারই তদ্বির, [illegible] নতুন [illegible] যেমন [illegible]। বরপণ প্রথা একেবারে যাতে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়, তারই চেষ্টা চালাতে লাগলেন [illegible]। সনদ [illegible] আসে [illegible] মধ্যস্থ [illegible] সাহেব গড়লেন সেখানে একটি সংস্থা, চালাতে লাগলেন [illegible]।

বৃটিশ সরকারের মাথায় তখন চিন্তা বহুৎ। তবে কাজের আগে ভাবেন অনেক, করেন তৈরী নির্দিষ্ট লক্ষ্য, থাকে একটা আদর্শ। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে রাজনৈতিক বাদ্ধ বিভ্রাট ঘটেনি এখনো তাদের সাম্রাজ্যের অস্ত। ওটা তাঁদের অভিধান বহির্ভূত। সেই আফ্রিকার কালো অরণ্য থেকে আমেরিকার সাদা-কালো আদমীদের দেশেও চালিয়েছেন একচ্ছত্র আধিপত্য।

অতএব লাফাবার আগে ভাবেন তাঁরা, লাফিয়ে হাতপা ভাঙতে চান না। তাই সাজান হল ছক, তৈরী হল দাবী। মেনে নিলেন দাবী। ভারতের শাসন সংস্কারের আইনে দেওয়া হল সুযোগ, করা হল সুবিধা। ভারতীয় মুসলমানেরা করবে তোমরা 'সেপারেট' নির্বাচন, রাখতে পার তোমরা দাবী। ১৯০৯ সালের শাসন সংস্কার আইনে দেওয়া হল তাদের ওই অবাধ অধিকার।

এইভাবে হিন্দু মুসলমানদের ঐক্যের বন্ধনে এলো ফাটল, জ্বালান হল আগুন। করলেন ভেদ, আনলেন বিভেদ। অশিক্ষার সংগে দিলেন কুশিক্ষা, ধর্মের সংগে দিলেন গোঁড়ামী, আচারের সংগে দিলের কুসংস্কার। এইভাবে গোটা মুসলীম সমাজকে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁরা আলো থেকে অন্ধকারে, সংস্কার থেকে কুসংস্কারে, ধর্ম থেকে ধর্মান্ধতায়।

তার আগেও আছে একটা ইতিহাস। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মুসলিম সমাজে আনতে চাইলেন পরিবর্তন। অচলায়তন সমাজের বুকে আনতে চাইলেন নূতন যুগের ভাবধারা, নূতন যুগের আলো। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মহৎ, লক্ষ্য ছিল তাঁর অচল। সমাজে লাগবে ঢেউ, আসবে জাগরণ, পাবে মুক্ত পথের আলো, এ তো ভাল কথা।

কিন্তু গোড়াতেই রয়ে গেল গলদ ফাঁক থেকে আসে ফাঁক গলদ থেকে হয় গোলমাল। সৈয়দ সাহেব দিলেন ডাক, শোনালেন নবজাগরণের বাণী করবেন তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্কার, ফিরিয়ে আনবেন লুপ্ত সবস্ব জাতির হৃত ঐশ্বর্য। কিন্তু আদব-কায়দায়, চাল-চলনে পুরো মাত্রায় তিনি হলেন ইংরেজদের নবসংস্করণ, চোস্ত ইংরাজি বাৎচিতে দক্ষ কারিগর।

এদিকে ভারতবর্ষের বুকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব কায়েম করবার সময় রাজার চেয়ে উজীরদের দিকেই ইংরেজ বাহাদুরের

ছিল প্রখর দৃষ্টি। তাই বাহাদুরদের বাহাদুরীতে কাবু হতে লাগলেন নবাব বাদশা। সরকার করলেন তাঁদের রাজ্য দখল, চালাতে লাগলেন লুঠপাট। তাই ইংরেজ শাসনের গোড়াপর্বে মুসলীম সাধারণ তাঁদের প্রতি হয়ে উঠলেন বিরূপ, করলেন বিদ্রূপ। চোখে আনলেন আগুন, মনে ধরালেন বারুদ।

ইংরেজের প্রতি তাই রইলো না তাঁদের কোন জান, রইলো না কোন পহচান। ইংরেজদের থেকে রইলেন তাঁরা সাত হাত দূরে। তাঁদের ভাষার প্রতি হল না কোন শ্রদ্ধা, রইলো না কোন আকর্ষণ।

অতএব কি করেন আহমেদ সাহেব? অতঃকিম্? একহাতে নিলেন তরবারি, আরেক হাতে তুললেন কোর-আন। মুখে আনলেন মিষ্টি হাসি, বুকে রাখলেন বিষ বহ্নি। কথায় রইলেন শান্ত, কাজে হলেন অশান্ত।

উঠলো জিগির, বইলো ঝড়, নবজাগরণের সুস্থ হাওয়ায় এলো অসুস্থ বাতাস। ইংরেজরা দিলেন তাতে জল, করলেন ভেদনীতির বীজ বপন। পেল আলো, পেল জল। ধীরে ধীরে হল অঙ্কুরোদগম। একদিন ফলে ফুলে পরিণত হল তা বৃহৎ বীষ-বৃক্ষে। সেই গাছের ছায়ায় এলেন লীয়াকৎ আলি খান, এলেন সেখ আবদুল্লা। সেই বিষকে জেনে-শুনে করলেন তাঁরা পান।

এইমাসে আলিগড় কলেজকে কেন্দ্র করে বাতাস হতে লাগলো তপ্ত। আরম্ভ হল আলিগড় আন্দোলন। সাম্প্রদায়িকতার ব্যধিতে জর্জরিত হল কলেজের সর্বাঙ্গ। তাই দেখা যায়, ভারত-রাজনীতির আকাশে যাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই মাথা নত করেছিলেন মুসলীম ধর্মান্ধতার কাছে। কারণ, তাঁদের অনেকের শিক্ষার প্রথম পাঠের উদ্বোধন হয়েছিল ওখান থেকে।

আলিগড় আন্দোলন একদিন থেমে গেল আচার-সর্বস্ব মরু—

বালুরাশিতে। তার স্রোত হল মন্থর, গতি হল স্তব্ধ। ধর্মের জায়গা বেদখল করে বসলো অধর্ম, নীতির বদলে এলো দুর্নীতি, আচারের জায়গায় এল অনাচার।

এইভাবে হিন্দু মুসলমানদের সুস্থ সম্পর্কের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হলো অনৈক্যের বীজ ধীরে ধীরে বিশ্বাস গেল সরে। প্রীতি গেল উড়ে, স্নেহ গেল মরে। সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা ব্যাধির মত জড়িয়ে ধরলো সর্বাঙ্গ।

উপর তলার মসনদে চলতে লাগলো হানাহানি, মারামারি। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের নীচু তলার সাধারণ মানুষ, যারা বোঝে না রাজনীতির শয়তানি, যারা কেবল হৃদয়ের ধনে ধনী, তারা ষড়যন্ত্র চক্রান্তের এই ফাঁদ থেকে রইলেন অনেক তফাতে।

কিন্তু 'তফাৎ যাও' বললেই তো তফাতে থাকা যায় না আগুনে ধর্ম হল পোড়ানো। পশু হতে দেরী লাগে না, কিন্তু মনুষ্যত্বের পদবী পাওয়ার জন্য দরকার সংযম, দরকার সাধন, দরকার ধৈর্য, দরকার স্থির বুদ্ধির। ধর্ম মানুষকে দেয় না কিছুই, শুধু দেয় নব নব দুঃখ। এই দুঃখের মধ্যে দিয়েই খোঁজ আত্মাকে, আবিষ্কার কর স্বর্গের অমৃতকে, অর্জন কর মনুষ্যত্বকে।

বহু বছরের সভ্যতার অতন্দ্র সাধনা মুহূর্তে গেল তলিয়ে। অন্ধকারের পিচ্ছিল রাস্তায় পা মচকাতে দেরী লাগে না। তাই ১৯০৯ সালের পৃথক নির্বাচন প্রথা ও নবজাগরণের মোহময় বাণী পরিণত হল মোল্লাতন্ত্রের উচ্ছিষ্ট উল্লাসে।

অথচ, এই ইসলাম ধর্মই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এনেছিল করুণার রসঘন বাণী, সাম্যবাদের সার্বজনীন ঐক্য আর ঐ সঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল আপামর জনসাধারণকে। বুদ্ধির সংগে হৃদয়, বস্তুতান্ত্রিকতার সংগে আধ্যাত্মিকতা, প্রেমের সংগে পরমার্থ, জনগণের সংগে সাম্যবাদ, এই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের ঐশ্বর্য।

কিন্তু মানুষের ঘাড়ে ধর্মান্ধতার প্রেতাত্মা যখন চেপে বসে, তখন চলে যায় অনেক কিছু। লোপ পায় বুদ্ধি, হারিয়ে যায় প্রেম, গুঁড়িয়ে যায় হৃদয়। মোল্লাতন্ত্রে বিশ্বাসী কিছু জনগণকে পেয়ে বসলো সেই সর্বনাশা নেশা।

অবশ্য সব কিছুই একদিনে নয়। সমস্ত মুসলমান জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মোলাতন্ত্রের বাণীতে, এ-কথা বললে মিথ্যা বলা হবে, করা হবে ইতিহাসকে বিকৃত। অসংখ্য জনসাধারণ ছিলেন, যাঁরা সত্যিই ছিলেন ভদ্র, তাঁরা ছিলেন তফাতে। তাঁদের কাছে হিন্দু কিংবা মুসলমানের দ্বৈতবাদের প্রশ্ন সোচ্চার হয়নি। তাঁদের কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল, "কাঁদিছ মায়ের আপন জন—হিন্দু কি মুসলীম"—ভারতমায়ের সন্তান তাঁরা, এটাই ছিল তাঁদের গর্বের বস্তু। দেশমাতৃকার অশ্রু-মোচনে, দুর্গতি লাঘবে ছেড়েছেন তাঁরা সুখের আরাম শয্যা, হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ, লাঞ্ছনার শরশয্যা। দিয়েছেন প্রাণ, সহেছেন নির্যাতন, আলিঙ্গন করেছেন কারা প্রাচীরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। কী-ই না করেছেন তাঁরা!

কিন্তু কেন?

নূতন আশার সূর্যোদয় ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, ভারতের এ-কোণে, ও-কোণে, সর্বত্র। সরে যাক অন্ধকার, উঠুক নূতন সুর, নূতন ছন্দ, নূতন গান। সেই জন্যেই ভাঙতে হবে শৃঙ্খল, গাইতে হবে মুক্তির গান। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেশের সন্তানদের হাতে এলে বুঝবে তারা দারিদ্র, বুঝবে তারা অনটন-ব্যাধি, বুঝবে তারা অশিক্ষা-কুশিক্ষার ব্যাধিগ্রস্ত রূপকে। উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্ট-পারসিক, শিখ-জৈন, ধনী-দরিদ্র সকলকেই পরম শ্রদ্ধায় বুকে নেবে তুলে, ভালোবাসায় করবে আলিঙ্গন।

এই ছিল হিন্দু-মুসলমান, যৌথ পরিবারের স্বপ্ন, ছিল সাধনা। আর পাকিস্তান? পাকিস্তান তখন দূর অস্ত্। তার ছায়ার-ও অস্তিত্ব ছিল না কোনখানে।

কিন্তু বিভেদ নীতির ঝাণ্ডা, তাও আবার উড়িয়েছেন ইংরেজ সরকার, অতএব তা ব্যর্থ পরিহাস হবে কেমন করে? যে বীজ তাঁরা বপন করে ছিলেন, গোড়ায় দিয়ে ছিলেন পানি, তা ফলে ফুলে একদিন বিকশিত হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রথম স্রষ্টা যিনি তিনি হলেন রহমৎ আলী। * ১৯৩৩ সালে করেছিলেন তিনি এর পরিকল্পনা। থাকতেন তিনি লণ্ডনে, বয়স ছিল তাঁর অতি অল্প। তাঁর এই খসড়ায় পিঠ চাপড়ালেন ইংলণ্ডের কনজারভেটিভ দলের পাকাপোক্ত খেলোয়াড়রা।

কিন্তু রহমৎ আলী তাঁর পাকিস্তান পরিকল্পনায় কি বলতে চেয়েছিলেন? কি ছিল তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম? হিন্দু মেজরিটি প্রধান ভারতবর্ষ করতে হবে ভাগ, করতে হবে বাটোয়ারা। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব? তার পথ-ও বাতলালেন তিনি। মুসলিম মেজরিটি পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল, এই দুটি এলাকাকে করতে হবে স্বাধীন, তা নিয়ে গড়ে তুলতে হবে মুসলিম রাষ্ট্র, যার চেহারা হবে স্বতন্ত্র, এবং যাকে অধিকার দিতে হবে সার্বভৌম। উত্তর পশ্চিম কয়েকটি এলাকা নিয়ে হবে পাকরাষ্ট্র এবং ঐ মুসলীম অঞ্চলের রাষ্ট্রটির অন্নপ্রাশন হবে পাকিস্তান নামকরণ দিয়ে। এই রহমৎ আলির পাকিস্তান শব্দটিকে ভাগ করে প্রতিটি অক্ষর আলাদা করলে বেরিয়ে আসবে এক একটি অর্থ। যেমন P পাঞ্জাব, A আফগানিস্তান অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, K কাশ্মীর, I (ইণ্ডাস) সিন্ধু, এবং stan অর্থাৎ বেলুচিস্তান। কিন্তু একটি তাজ্জব বাৎ, তাঁর পাকিস্তান পরিকল্পনা থেকে অতি অক্ষত অবস্থায় বেহাৎ হয়ে পড়লো পূর্ববঙ্গ। তিনি তার

যা নামকরণ করেছিলেন, তা হল Beng-E-Islam অর্থাৎ বঙ্গ-ই-ইসলাম।

এই প্রস্তাবের খসড়া দেখে চোখে ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছিল কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নার। তখনও তিনি কায়েদে আজম হননি। এই অসম্ভব দাবীর সাধ দেখে তিনি হলেন আশ্চর্য। বলে উঠলেন তিনি, "বলো কিহে ছোকরা, কি দাবী করেছো, তা কি নিজে একবার চোখ বুজিয়েছো? উদ্ভটকে তুমি করতে চাও অদ্ভুত। একান্ত অবাস্তবকে করতে চাও বাস্তব, বলিহারি তোমার বুকের সাহস।"

শুধু জিন্না সাহেব নয়, আরো অনেকের চোখ টাটালো। করলেন তাঁরা ব্যঙ্গ, উদ্ভট বলে দলন উড়িয়ে। পাত্তা পেল না পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়ার পরিকল্পনা। সেটাকে তারা ছেঁড়া পাতার মত নিক্ষেপ করলেন আবর্জনার ডাষ্টবিনে

এই জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়েছিল জাতীয়তাবাদের পতাকা তলে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে মোটেই। উনিশ শো ছয় সালে আগা খাঁর নেতৃত্বে যখন মুসলিম লীগের গায়ে দেওয়া হচ্ছিল বাতাস, তখন কিন্তু সেই বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেন নি জিন্না সাহেব। তিনি যোগদান করেছিলেন কংগ্রেসে, আরম্ভ করেছিলেন রাজনৈতিক জীবন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে। সেদিন তাঁর অন্তরে ছিল না কোন ভেদ, না ছিল কোন মালিন্যের স্পর্শ। সেদিনও তিনি বলেছিলেন, হিন্দু মুসলমানের মিলনের পথেই ঘটবে পরাধীন ভারতের মুক্তি।

সেদিনও তাঁর চোখে ছিল স্বপ্ন, বুকে ছিল স্বদেশপ্রেমের দীপ্ত শিখা, কর্মে ছিল নিষ্ঠা, বাহুতে ছিল বল, আর বুদ্ধিতে ছিল রাজনৈতিক বিচক্ষণতা।

কিন্তু তারপরেই জিন্না সাহেবের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়লো, চারিদিকে ছড়ালো দুর্গন্ধ। কংগ্রেসকে করলেন তিনি বরখাদ, মুসলীম লীগ হয়ে উঠলো তাঁর সর্বস্ব। কংগ্রেসে তাঁর স্থায়িত্ব হয়েছিল ক্ষণস্থায়ী। মুসলীম লীগে যোগদান করলেও তখনো তিনি হয়ে ওঠেননি এক চক্ষু হরিণ। তখনও তিনি শপথ নিয়েছিলেন, পণ করেছিলেন, জাতীয় স্বার্থের কোন বিরুদ্ধাচরণ করবেন না তিনি।

কিন্তু কোথায় গেল পণ, কোথায় গেল শপথ, সবই হয়ে গেল ঝুটা। কারণ মিরজাফরের সুহৃদ জিন্না সাহেবের ছিল একদিকে গোঁড়ামী অন্যদিকে গোয়াতুমি, একদিকে পণ, অন্যদিকে শপথ ভাঙ্গার দুরভিসন্ধি, একদিকে বুদ্ধি, অপরদিকে চালাকি, একদিকে বিচক্ষণতা, অন্যদিকে রক্ষণশীলতা এটা ছিল তার হাড়ে-মজ্জার স্বভাব।

১৯১৫ সালে বোম্বাই শহরে কংগ্রেস ও লীগের হল প্রকাশ্য অধিবেশন। সেদিনও জিন্নার কণ্ঠে ছিল দরদ, হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উদ্গত অশ্রু। ১৯১৬ সালে হল লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট— মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস হল এক মন, এক প্রাণ। বৃটিশ রাজের কাছে করল দাবী স্বায়ত্তশাসনের।

তারপর জিন্নার সুর গেল পাল্টে, ভোল গেল বদলে। যে রহমৎ আলির প্রস্তাব নোংরা কাগজের মত ছুঁড়ে ফেলেছিলেন জিন্নাসাহেব, তাকেই তুলে নিলেন বুকে। দিল থেকে সরালেন প্রীতি, আনলেন অপ্রীতি ধরালেন ফাটল হিন্দু মুসমানের ঐক্যে। রহমৎ আলির পাকিস্তানকে করলেন আদর, দিলেন সমাদর। বললেন, "তুমি এখন নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী। তুমি এখন আমাদের প্রাণ পিয়ালা, বেহেস্ত, সাধনার ধন।"

যেদিন লাহোরে গ্রহণ করা হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার

সর্বসম্মত প্রস্তাব, সেদিন ছিল উনিশ শো উনত্রিশ সাল। এগারো বছর পর সেই লাহোরেই, উনিশ শো চল্লিশ সালে, লীগের নেতারা গ্রহণ করলেন পাকিস্তান প্রস্তাবটি। কিন্তু তখন ছিল কোথায় পূর্ববঙ্গ বা আজকের স্বাধীন বাংলা? লীগ প্রস্তাবে ছিল না তাকে পাকিস্তানের সংগে যুক্ত করার কোন আভাস ইঙ্গিত। বরং লীগ প্রস্তাবে যে কথাটি আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, উত্তর পূর্ব মুসলীম মেজরিটি প্রধান অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আরেকটি মাথা চাড়া দেবে উত্তর পশ্চিম মুসলীম প্রধান অঞ্চলে। রাজকীয় ভাষায় সেই প্রস্তাবটি ফুলশয্যার আসরে পাঠান হল এই বলে :

"Independent state in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

এর বাংলা বয়ান করলে দাঁড়ায়, "যেখানে মুসলীমরা সংখ্যার দিক থেকে মেজরিটি, সেই পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম এলাকায় পয়দা করতে হবে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের। এবং এদের দিতে হবে স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকার।"

অর্থাৎ লাহোরের ঐতিহাসিক দলিলে সেদিন সুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করা হয়েছিল, সৃষ্টি করতে হবে দুটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালে ভাবতে এলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। মুসলীম লীগের এই নয়া ইমারতের তিনি করলেন দ্বারোদ্ঘাটন, দিলেন প্রকাশ্য স্বীকৃতি। কংগ্রেস লীগ বিরোধের নাটক এসে উপস্থিত হল যবনিকার চূড়ান্ত পর্বে।

এক হাতে ডাণ্ডা, অন্য হাতে কস্তুরা, এসে দাঁড়ালেন এক নগ্ন ফকীর। দিলেন ডাক জনগণকে, "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। ইংরেজ ভারত ছাড়—"

চোখের কোণে তাঁর বুদ্ধির ঝলক, মুখে স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসির ছায়া, হাতে বরাভয়ের নির্ভয় ডাক, কণ্ঠে নেই তীব্রতা, শুধু বুকে আছে ভালবাসা। সকলেই তাঁর ইঙ্গিতে ওঠে, সকলেই তাঁর কথায় বসে। তাঁর মুখ দিয়ে যে কথা বের হয় তাই হয় বেদ-বাক্য। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র নয়, জ্ঞানের বদলে জ্ঞান নয়, গুলির বদলে গুলি নয়। তিনি বলেন মানুষের সার্বজনীন প্রেম, প্রীতি, কল্যাণের কথা; তিনি বিশ্বাস করেন মনুষ্যত্বের অন্তহীন মহত্তর মূল্যে। নয় ভেদ, নয় বিভেদ, নয় মারামারি, নয় কাটাকাটি। অন্তরের পশুত্বকে জাগান নয়, শুভ কল্যাণ বুদ্ধিতে মানুষের সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর অবিচল লক্ষ্য ও অপরাজেয় সংগ্রাম, বিরামহীন সাধনা, একনিষ্ঠ আদর্শ।

কিন্তু কি করে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব? অহিংসার অমৃত জ্যোতি হবে সব কিছুর মূলকথা। হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসা ঘৃণার বদলে শ্রদ্ধা, খুনের বদলে প্রাণ, বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রেম, অপ্রীতির বদলে প্রীতি, এই হল মহাপ্রাণের গীতা।

সেই দধিচিই ডাক দিয়েছেন ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণকে। আর দেরী নয়, মায়ের মঙ্গল-ঘটকে সিংহাসনে অভিষেক করার জন্য এসো তোমরা। এসো হিন্দু, এসো মুসলমান, এসো খ্রীষ্টান, পার্শী, পাঞ্জাবী এসো সকলেই। মায়ের পূজায় সকলেরই অর্ঘ্য দেওয়া কর্তব্য, সেই কর্তব্যের ডাকে সকলে এসো স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়।

"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। বৃটিশ ভারত ছাড়।"

অর্দ্ধ নগ্ন, শীর্ণ, সৌম্য, শান্ত সেই ফকীরের ডাকে সমগ্র ভারতবর্ষ জেগে উঠলো নব প্রেরণায়। তাঁর ডাক বাতাসের স্তর ভেদ করে ছড়িয়ে পড়লো আকাশে, নভঃস্থলে, দেশ থেকে দেশান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কন্যাকুমারী থেকে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী

তাঁর মহামন্ত্র যাদুমন্ত্রের মত ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। ভারতবর্ষের দিকে দিকে দামাল সন্তানদের আরম্ভ হল সত্যাগ্রহ। ইংরেজদের অস্ত্র যতই হল নির্মম, বাঁধন যতই হল শক্ত, ততই দেশের মরণজয়ী সন্তানদের বাড়লো উৎসাহ, পেল উদ্দীপনা। সংগ্রামের বেগ হল জোয়ারের মতই প্রবল, তীব্র, অপ্রতিরোধ্য।

বাঁধ ভেঙেছে, আর বুঝি থাকবে না কেউ ঘরে। সমস্ত ভারতবর্ষ উজাড় করে দেশমাতৃকার মহোৎসবে সমবেত হতে লাগলো, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, যুবক-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী। সমবেত হল মুসলমান, পার্শি, শিখ, হিন্দু। তাঁরা এক জাতি, এক প্রাণ, হয়ে একতার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ভারতবর্ষের হৃদস্পন্দনের সংগে লীন করে দিলেন নিজেদের সর্বস্ব। ভারতবর্ষ পরিণত হল অখণ্ড এক মহাভারতে।

কিন্তু সেই আলোর উৎসবে এলেন না শুধু মুসলীম লীগ। তাঁরা ও তাঁদের দোস্তরা অবলম্বন করলেন সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদাপসরণ রীতি; জিগির তুললেন দ্বি-জাতি তত্ত্বের (Two nation theory)। গড়ে উঠলো তাঁদের নিজস্ব পতাকা, আনলেন মোল্লাতন্ত্রের উৎকট বাণী।

কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষেরা কিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন? কিসের জন্য বরণ করেছিলেন অশেষ লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ, বেছে নিয়েছিলেন কণ্টকাকীর্ণ পথ। সে কি ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে ছিন্ন ভিন্ন করবার জন্য, না খণ্ড বিখণ্ড ভারতবর্ষকে একই ঐক্যের বন্ধন-সূত্রে আবদ্ধ করবার জন্য?

বৃটিশ চলে গেল ভারতবর্ষ ছেড়ে। কিন্তু করে গেল তার ভেদনীতির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

পরাধীন দেশের একজন সংগ্রামী নেতা যিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী সেই নেহরু দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন উনিশ শো চুয়াল্লিশ সালে লক্ষ্ণৌ-এর একটি জন-সমুদ্র সভায়, "ভারত বিভাগ?

কিছুতেই নয়। দেবো জান, কিন্তু ভারতবর্ষকে হতে দেবো না খণ্ড, বিক্ষিপ্ত। যতই করুক হানাহানি, যতই করুক মারামারি যতই ধরুক আব্দার, যতই চটাক মানুষদের, পাকিস্তান কিন্তু হবে না, হাজার বছর সংগ্রাম করলেও পাকিস্তান হবে দূর অস্ত্।"

নগ্ন ফকীর ঘোষণা করলেন, "আমার দু'টুকরো করা দেহের উপরে নির্মাণ করতে হবে তোমাদের পাকিস্তানের মোল্লাতন্ত্র। আমার সাধ, আমার স্বপ্ন, আমার এতদিনের সাধনা ও সংগ্রাম দেব না হতে ব্যর্থ।"

শত শত শহীদের রক্ত হয়ে গেল ব্যর্থ। যে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সকলের ত্যাগে, অপরিসীম নিষ্ঠায়, উজ্জ্বল আদর্শে, তার হল ইন্দ্রপতন।

দধীচির হোমানল শিখা ব্যর্থ পরিহাসে মুখ থুবড়ে পড়লো আছাড়। যে নগ্ন ফকীর কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর শুনলেই ছুটে যেতেন এ-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, চিত্ত হত অধীর, বুকে উঠতো ক্রন্দনের সমুদ্র সফেন, নোয়াখালির দাঙ্গায় ত্রস্ত জনগণের যিনি মোছালেন অশ্রু, বুকে দিলেন বল, মুখে দিলেন ভাষা যে ফকীরের স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয় না পেলে সুরাবর্দিকে করা হতো ইতিহাসের ডাষ্টবিন, সেই গান্ধী ইতিহাসের এ-বোবড নাটকে হলেন মূক, রইলেন বধির। ভয় পেলেন, বর্তমানে দ্বি-জাতি তত্ত্বের উলঙ্গ নৃত্যকে মেনে না নিলে হবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, শুরু হবে গৃহযুদ্ধ। যুক্তি দেখালেন, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিচারে মুসলীম হিন্দু একই মায়ের দুই সন্তান। অতএব, এখন আরম্ভ হয়েছে ভ্রাতৃ-বিরোধ। মাথা ঠাণ্ডা হলে আবার লাগবে জোড়া, অশান্তির সংসারে আসবে শান্তি। দুই ভাই-এর হবে মিলন। অর্থাৎ, সাময়িক উত্তেজনায় দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও, মাথা যখন

ঠাণ্ডা হবে, মিটে যাবে বিরোধ। কোলাকুলি হবে দুই ভাই-এর।

কিন্তু দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে, আবার কি তা একই রাষ্ট্রের কাঠোমোয় ফিরে আসে? ভাঙন লাগলে একবার ঘরে, আবার কি জোড়া লাগে? হাঁড়ি ভাঙলে কি তা কখনও জোড়া লাগে? তাছাড়া বাঘকে মানুষ রক্তের স্বাদ দিলে, সে কি তখন ভোজের আসর ছাড়ে?

গান্ধীজীর এই অবাস্তব উদ্ভট স্বপ্নকে ইতিহাস কতোটা স্বীকৃতি দেবে, তা বোঝা শক্ত। গান্ধীজী যে শান্তির ললিত বাণীতে অতিরিক্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, অস্বীকার করে চলেন চূড়ান্ত বাস্তবকে, এই অমোঘ সত্যকে 'ঝুটা হ্যায়' বলে লাভ কি? আসল কথা গান্ধীজীর নীতি হচ্ছে সেই মহান নীতি, যা বুঝতে গেলে মানবিক ঐশ্বর্য গরীয়ান হওয়া দরকার। মানুষ যখন হবে সভ্য, হবে ভদ্র, হবে মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য দীপ্তিমান, তখন উপলব্ধি করতে পারবে অহিংসার শুদ্ধাচার। কিন্তু যতক্ষণ থাকবে লোভ, থাকবে ঘৃণা, থাকবে মানবিক শক্তির নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ গান্ধীজীর বাণী ততদিন ক্রন্দন করবে নীরবে নিভৃতে। পরিণত হবে ব্যর্থ পরিহাসে।

যেখানে এসেছে নীতির বদলে দুর্নীতি, সততার বদলে অসততা, প্রেমের বদলে ঘৃণা, প্রীতির বদলে বিতৃষ্ণা, অহিংসার বদলে হিংসা, সেখানে কেমন করে সম্ভব গান্ধী-নীতির সার্থক প্রয়োগ!

মনুষ্যত্বের মানবিক মূল্যে গান্ধী ছিলেন কী রকম আস্থাবান। অহিংসাকে দিয়ে ছিলেন উচ্চাসন। তাই রক্তের মূল্যে জাতিকে দেন নি তিনি আত্মশুদ্ধির অধিকার।

কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, গান্ধী একবার যদি রুখে দাঁড়াতেন, জাতিকে দিতেন ডাক, "শোন অমৃতের সন্তানগণ, বিশ্বাস করি না আমি দ্বি-জাতি তত্ত্বের মেকি সোহাগ। তাতে আসবে ঝড়?

উঠবে বাতাস? চমকাবে বিদ্যুৎ? তবে আসুক ঝড়, উঠুক বাতাস, ঝরুক রক্ত। তবু মানবো না দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভেদনীতি, দেবো না পাকিস্তান সৃষ্টির অধিকার।" তাহলে ইতিহাস হয়তো অন্য হতো।

ভারতবর্ষে অলৌকিক যাদু ঘটাবার একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল গান্ধীজীর। গান্ধীজীকে জনগণ দিয়েছেন তাদের হৃদয়ের রাজ-সিংহাসন। এমন সার্বজনীন গণসম্মান ও শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অ স্তরিকতা, ভারতবর্ষের কেন, তাবৎ পৃথিবীর নেতাদের কপালেও সেটা ছিল অকল্পনীয়, দুরাশার স্বপ্ন। গান্ধী ছিলেন ভারতের মুকুটহীন সম্রাট।

সেই গান্ধী ইতিহাসের চূড়ান্ত অঙ্কে করলেন ভুল, শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন দ্বি-জাতি তত্ত্বের বাস্তবতা। দিলেন না কোন ডাক, দ্বি জাতি তত্ত্বকে করলেন না বরবাদ।

মেনে নিলেন ভারত ভাগের আদিপর্ব।

জিন্না সাহেবের পাকিস্তান পরিকল্পনার মূলকথা, যা তিনি Pakistan a Nation পুস্তকে লিখেছিলেন, তা পড়তে দিয়েছিলেন গান্ধীকে। বইটি অবশ্য তিনি স্বনামে লেখেননি, এল হাজার-এর ছদ্মবেশ পরে নেপথ্যে মাল-মশলা-রসদ জুগিয়ে ছিলেন। তাতে অনেক তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে দাবী করা হয়েছিল দুটি রাষ্ট্রের, পশ্চিমাঞ্চলের ভূখণ্ডের নামকরণ করা হবে পাকিস্তান এবং পূর্বাঞ্চলের পদবী হবে বঙ্গ স্তান।

জিন্না সাহেব যে গলায় গান গান, মুসলীম লীগ-ও সেই সুরে সঙ্গৎ করে। ছায়া ও কায়ার মত, যমজ সন্তানের অ-বিচ্ছিন্ন অংশের মত মুসলীম লীগ-ও জিন্না সাহেবের সুরে সুর মেলায়। অতএব জিন্না সাহেব যা বলেন, মুসলীম লীগ-ও তাতে মাথা নাড়েন। জিন্না সাহেব যে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী করেছিলেন, মুসলীম লীগ তাতে পোঁ ধরলেন।

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্-মুহূর্তে তলিয়ে গেল সেই দুই রাষ্ট্র। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হল তার সলিল সমাধি। সৃষ্টির রসে ভরপুর হয়ে মেজাজ তখন তাঁদের অন্য। পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার স্বাদের কথা ভুলে গেলেন বেমালুম। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের জুন মাসে দিল্লীতে তড়িঘড়ি ডাকলেন বৈঠক, বসলো কাউন্সিল, হয়ে গেল স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠনের প্রস্তাব বরবাদ।

কিন্তু এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন কয়েকজন যুব নেতা। দেখালেন তাঁরা করাচীর নির্দেশ। বললেন, "ঐ প্রস্তাবে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের লেজুড় করার নেই কোন যুক্তি, নেই তথ্য। আছে স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলা সৃষ্টির উল্লেখ স্পষ্ট।"

কিন্তু সেই দাহিকা-শক্তি পেল না কোন ইন্ধন, হল তা খণ্ডন। কায়েদে আজম ও লিয়াকৎ আলীর ক্রুদ্ধ অহঙ্কারের কাছে হল তা ব্যর্থ ক্রন্দন। পূর্ব বাংলার "সাধ না মিটিল, আসা না পুরিল....।"

ভারত-পাকিস্তান বাঁটোয়ারার দলিল কি? ভারত-মায়ের করা হল অঙ্গচ্ছেদ পূর্ব ও পশ্চিমের বৃহৎ এক অংশ কেটে। পশ্চিম দখলকারী স্বত্ত্ব পেল বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, খণ্ডিত পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ, সিন্ধু বাহাবালপুর ও আরো কয়েক ভূতপূর্ব রাজা-উজীর-শাসিত দেশীয় রাজ্য, পূর্বপাকিস্তান পেল সিলেট জেলা সহ অবিভাজ্য বাংলাব দুই তৃতীয়াংশ। উভয় পাকিস্তান, পূর্ব ও পশ্চিম, তার লোকসংখ্যার স্ট্যাটিসটিকস্ হল ৭৫,৮৪১,১৬৫ জন, এবং আযতন হল ৩,৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল। দখলকারী স্বত্বে পূর্ব পাকিস্তানের এলাকা দাঁড়ালো সমগ্র পাকিস্তানের আয়তনের শতকরা মাত্র ষোল ভাগ। কিন্তু লোকসংখ্যায় ৪,২০,৬৩,০০০। তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে কি, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী।

সুতরাং, সহজ, সরল বুদ্ধিতে, পূর্ব পাকিস্তানেরই উচিত ছিল, বেয়াড়া পশ্চিম পাকিস্তানকে নিজেদের কব্জায় রাখা, শাসন,

শোষণ অবশ্যই নয়। কিন্তু ক্ষমতার মসনদ্ অধিকার করলেন পশ্চিম পাকিস্তানের জবরদস্ত শাসকেরা। শাসন নয়, শোষণ, সম্প্রসারণ নয়, কলোনিয়ালিজম্, কল্যাণ নয়, বজ্র চোখের তর্জনী, নয় প্রেম, নয় প্রীতি, নয় জনগণের সার্বিক উন্নয়নের কোন সুপরিকল্পিত লক্ষ্য, আদর্শ হল নির্দিষ্ট, যেন-তেন-প্রকারে রক্ত ঝরাও, গঙ্গা বহাও পূর্ব পাকিস্তানের অগণিত জনসাধারণের।

কিন্তু ভারত বিভাগের বর্গফল এই উপমহাদেশে সুবিধা আনলো কি? সুরাহা করলো কি? ওই কথা জিজ্ঞাসে যে জন, তার প্রতি কি হবে তার জবাব? সরে গেল কি জণগণের দুঃখ, দারিদ্র, ব্যাধি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ঘটলো কি সূর্যোদয়? এলো সুখ, এলো সমৃদ্ধি, এলো শান্তি?

তার একটি মাত্র উত্তর, না। হল না কিছুই। যে তিমিরে ছিল জনগণ, রয়ে গেল সেই তিমিরেই। বরং বাড়লো তার দুঃখ, বাড়লো তার যন্ত্রণা, বাড়লো তার দারিদ্র। জনগণের সার্বিক কল্যাণের ভাগীরথী স্রোত ঘটাতে পারলো না বিভাজিকা, উঠলো না আশার সূর্য।

সবচেয়ে তাজ্জব বাৎ, যে যুক্তির সমাধি মন্দিরে তোলা হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধুয়া, তা ধোঁয়া-ই হয়ে গেল। আকাশ হল না পরিষ্কার, বাতাস হল না নির্মল, চন্দ্রিমা হল না উজ্জল। জনগণের দুঃখ বাড়লো বৈ কমলো না। কেউ হারালেন তার সন্তান, কেউ হারালেন তাঁর পিতা, কেউ হারালেন তাঁর মাতা, কেউ হারালেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন-পরিবার, কেউ হারালেন তাঁর বন্ধু। সবচেয়ে নির্মমভাবে যে জিনিস হারানো হল, তার শোক ভুলবার নয়! জনগণ হারালেন তাঁদের হৃদয়, হলেন মনে প্রাণে দেউলিয়া। জ্বললো গ্রাম, জ্বললো বাড়ী, জ্বললো মানুষ, জ্বললো তার মনুষ্যত্বের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য—প্রেমপ্রীতি! জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে রইলো না তার কোন ফারাক। সেই সব ঘটনার কথা শুনলে শরীর ওঠে শিউরে, মন ওঠে জ্বলে, বুক ওঠে কেঁপে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক লিওয়ার্ড মোসলে তাঁর একটি স্মরণীয় গ্রন্থে রেখে গেছেন এর মর্মস্পর্শী ও হৃদয়-বিদারক বিবরণ। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'The last days of the British Raj'-এ লিখেছেন, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পরবর্তী ন'মাসের মধ্যে এই উপ-মহাদেশের বুকে মনুষ্যত্বহীনতার যে তাণ্ডব লীলা দেখা গেল, তা পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। কত যে ক্ষয়-ক্ষতি হল, কত যে বাড়ী-ঘর পুড়লো, কত লোক যে পৈশাচিকতার হল নিষ্ঠুর শিকার, তার বিবরণ কে দেবে, কে জোগাবে তার যথাযথ তথ্য। তা' লিখতে গেলে বুক যাবে ফেটে, কলম যাবে ভেঙ্গে।

মোসলে সাহেব লিখলেন, স্বাধীনতার ন'মাসের মধ্যে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ থেকে ষাট লক্ষ লোককে করতে হয়েছে বাস্তু-ত্যাগ, তাদের মধ্যে আছে হিন্দু, আছে শিখ। ঐ স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোরবানীতে দিতে হয়েছে ছয় লক্ষ লোককে গর্দান।"

তাঁর ভাষাতেই দেওয়া যাক সেই ঘটনার সংক্ষিপ্তসার :—

'But no, not just killed. If they were children, they were kicked up by the feet and their heads smashed against the wall. If they were girls, they were raped and then their breast were chopped off. And if they were pregnant they were disembowelled."

কিন্তু এই বিবরণ শুধু মাত্র একটি অঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চলের। বাদ পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানের বিবরণ, সেখানকার ইতিহাসও কি এমন আহা-মরি গৌরবের, যা স্মৃতির ফ্রেমে তুলে ধরার মত? কেউ রইলো না ধোয়া গঙ্গা জল। সকলের মধ্যেই আমদানি করা হল পশুত্বের কালো ছায়া, যা ধ্বংস করলো তার মনুষ্যত্বকে, তার শুভবুদ্ধিকে, তার সভ্যতার সাধনাকে, তার কোমল হৃদয়ের সূক্ষ্ম

প্রবৃত্তিকে। এমন সৃষ্টিছাড়া পরিস্থিতির মধ্যে পৃথিবীর কোথাও হয় নি বোধ হয় স্বাধীনতার সূর্যোদয়।

পাকিস্তান পয়দার এই হল সংক্ষিপ্তসার।

নবজাতক পাকিস্তানকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্ণধাররা পড়লেন বেকায়দায়। চাই আলো, চাই বস্ত্র, চাই অন্ন, চাই পথ্য, চাই শিক্ষা, চাই নতুনভাবে দীক্ষা। কিন্তু কেমন করে মোল্লাতন্ত্রের তরাতে ভরা হবে সোনার ফসল?

জনগণকে খাদ্য না দিলে, পথ্য না দিলে, বস্ত্র না দিলে ধরবে তারা শাসকের টুঁটি চেপে। জনগণ কববে বিদ্রোহ, জ্বালাবে আগুন, ক্ষুধা মেটাবে দারুণ। সেই শ্মশানেব প্রেতপুরীতে তখন কি তাঁরা বেহালা বাজাবেন?

কিন্তু কি করে জনগণের এই চাহিদাকে পূরণ করবেন তাঁরা? কি করে তা সম্ভব? আচম্বিতে তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো, পূর্ববঙ্গ। ইয়ে আল্লা! এবাব কেল্লা ফতে।

বাংলা দেশে ফলে সোনা, সেখানে থাকে গোলা ভরা ধান। অতএব, রয়েছে সুজলা সুফলা পূর্ববঙ্গ; করো তাকে শোষণ, করো তাকে সাম্রাজ্য বাদের উপনিবেশ ভূমি। মিলবে আলো, মিলবে বস্ত্র, মিলবে অন্ন।

অতএব, পূর্ব পাকিস্তানকে করা হল উপনিবেশের বেনামী বন্দব। পাচার হল মাল, পাচার হল কাঁচা বসদ, পাচার হল বঙ্গভূমির যাবতীয় ঐশ্বর্য। পূববঙ্গের জন্য রইলো না কিছুই। পূববঙ্গের মুখ গেল শুকিয়ে। বুক গেল গুঁড়িয়ে। গেল অন্ন, গেল বস্ত্র, গেল পথ্য। পূর্ববঙ্গের জনগণ দেখলেন বিভীষিকা। কিন্তু তাদেব কায়িক পরিশ্রমে উৎপাদিত বস্তুতে রইলো না কোন অধিকার। যেহেতু তারা পশ্চিম পাকিস্তানেব সঙ্গে গাঁট ছাড়া বেধেছে। অতএব সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাদের করতে হল নানা ভাবে। শোষণ এমন চূড়ান্ত পর্বে এসে দাঁড়ালো যে, তাদের বলতে হল, "বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে?" এই ভাবে ধীরে ধীরে তাঁরা হতে লাগলেন নিজ-বাস-ভূমে পরবাসী।

পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচন

উনিশ শো চুয়ান্ন সাল। পূর্ববঙ্গের আকাশে আবির্ভাব ঘটলো এক দ্যুতি উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জে। অক্ষয় তার দ্যুতি, অম্লান তার সৌরভ। এই উজ্জ্বল তারামণ্ডলের নাম : যুক্তফ্রন্ট। যার পতাকাতলে সমবেত হলেন অনেকগুলি রাজনৈতিক দল। মুসলীমলীগ ছিলেন এঁদের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। পাকিস্তানের আকাশে তখন মুসলীমলীগ মধ্যাহ্ন সূর্যের মত বহ্নিমান্। দোর্দণ্ড তার প্রতাপ, এবং একচ্ছত্র তার সাম্রাজ্য। সেই সাম্রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়, অনুগত প্রজার মত, অথবা নিষ্ঠাবান কর্মচারীর মত সেই অভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করেন তাঁরা। বেয়াদপের ঠাঁই মেলেনা সেখানে। যারা আহাম্মক, সেই রাজদ্রোহীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য কাজীর বিচারালয় খোলা থাকে দিবারাত্রি। সেই কাজীর বিচারে নেওয়া হয় বুববাকের গর্দান, করা হয় তাকে নিশ্চিহ্ন।

তাছাড়া, মুসলীমলীগ পাকিস্তানে এনেছেন আজাদী। সেই আজাদীর অপূর্ব স্বাদ তাঁদের মেহেরবানীতেই আস্বাদ করতে পেরেছে জনগণ। আর স্বাধীনতা পর মুসলীমলীগ সর্বসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে যে সব মহৎ কাজ করেছেন, তাকে একমাত্র স্বর্গসুখের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। জনগণকে দিয়েছেন তাঁরা অনেক সুবিধা, সুখের নন্দন-কাননে যাতে থাকতে পারে স্বচ্ছন্দ্যে, করেছেন তার ব্যবস্থা। তাছাড়া একদিকে এনেছেন তাঁরা মুসলীম জাতীয়তার আদর্শ, তুলেছেন বিশ্বজনীন ঐসলামিক ভ্রাতৃত্বের পতাকা, অন্যদিকে দিয়েছেন তাঁরা কোর-আন-এর পবিত্র উর্দ্দু ভাষা, হটিয়েছেন বাংলা ভাষার রাজপাট।

এই সব বিবিধ গুণে তাঁদের সর্বাঙ্গ তখন আভরণের মত ঝলমল করছে। সকলের দৃষ্টিই তাঁদের দিকে। সকলের চিন্তা তাঁদের

নিয়ে। সকলের ভালোবাসা শ্রদ্ধা তাঁদের দিকে সকলের দ্বিধাহীন আনুগত্য তাঁদের দিকে। তবে আর অনর্থক ভাবনা কি?

জনগণের এমন উন্নয়নমূলক কাজ-কর্মের জন্য তাঁরা তাঁদের মাথায় তুলে নাচবেন, আনন্দে করবেন উল্লাস। এই সব সত্ত্বেও পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁরা করতে লাগলেন বিস্তর টাল-বাহানা! দেখাতে লাগলেন অনেক যুক্তি।

কিন্তু নিন্দা করা যাদের হাড়ে-মজ্জার স্বভাব, সেই দুষ্টু লোকেরা রটালেন অনেক কথা, বললেন, ওঁদের শাসনের দৌরাত্মে নাভিশ্বাস ওঠবার অবস্থা হয়েছে। বললেন তাঁরা, পদ ও প্রতিষ্ঠা, লোভ ও দুর্নীতি, অরাজকতা ও আমলাতান্ত্রিকতা, ব্যর্থতা ও ঔদাসীন্য, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ, গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতা, ব্যাভিচার ও বিপর্যয়, এই হল মুসলীমলীগ শাসনের একচেটিয়া সম্পত্তি। তাঁদের শাসনে ও কল্যাণে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচে তো নাই, বরং বেড়ে গেছে শতগুণ। বেড়েছে জনগণের দারিদ্র্য, বেড়েছে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বেড়েছে অভাব, অনটন, ব্যধি। নিজেদের ঘর গুছোবার কারবারে মশগুল হয়ে রয়েছেন শায়েন-শা-রা। গদী আঁকড়ে থাকার নির্লজ্জ মোহ-ই তাঁদের স্বপ্ন ও সাধনা। জনগণের দুঃখ-দারিদ্রের সংগে একাত্মা হবার মত কোথায় তাদের সেই বিন্দুমাত্র ফুরসৎ? কোথায় সেই মনের ঔদার্য?

নির্বাচনের দাবীর পক্ষে সারা পূর্বপাকিস্তানে আরম্ভ হল সভা শোভাযাত্রা, বক্তৃতা। আরম্ভ হল জোরদার আন্দোলন। সেই আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ গ্রাস করতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকদের।

বেয়াড়াদের কি অন্যায় আব্দার! বিরক্তিতে আর ক্রোধে নাসিকা কুঞ্চন করলেন পূর্ব পাকিস্তানের দণ্ড মুণ্ডের কর্তারা। আপ্রাণ তাঁরা চেষ্টা করলেন নির্বাচনের দাবীকে স্তব্ধ করতে। কিন্তু জনগণ কোন যুক্তি, কোন কথা শুনতে নারাজ। তাঁরা চান, পাকিস্তানে

হোক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন। তাতে জনগণ যে রায় দেবেন, মুসলীম লীগকেও যদি ক্ষমতার মসনদে বসানো হয়, তা-ও মাথা নত করে মেনে নেবে যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু জনগণকে দূরে রেখে অগণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের উপর তোমাদের স্বেচ্ছাচার কায়েম করা চলবে না। এ অবৈধ, এ অন্যায়। অতএব, কি আর করেন লীগ শাসক। মহা বেকায়দায় পড়ে গেলেন তাঁরা। বিগত সাতটি বছর জনগণকে কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। উনিশ শো চুয়াল্লিশ সালের নির্বাচিত সদস্যের যৌথ নৈতৃত্বে পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাই চালিয়ে যাচ্ছে তারা ভারী রোলারের মত।

কিন্তু জামানা যে বদলাতে শুরু করেছে, শুরু হয়েছে বদলের পালা, তা বুঝবে কে! শাসক না বুঝুন, জনগণ বুঝতে পেরেছেন। তাই শুরু করেছেন আন্দোলন, শুরু করেছেন, সভা-সমিতি, মিছিল।

অনেক দেরীতে হলেও, সুবুদ্ধির উদয় হল, অর্থাৎ হওয়ানো হল, মুসলীম লীগের। তাদের গলা দিয়ে অনেক কষ্টে বেরুল মেয়েলি কণ্ঠের চি-হি, চি-হি ধ্বনি: নির্বাচন হবে উনিশশো চুয়ান্ন সালে, হবে নির্বাচন।

এই ঘোষণা জণগণের প্রাণে সৃষ্টি করলো অদ্ভুত এক উন্মাদনার। তাঁদের বুকে এলো সাহস, কাজে বাড়লো গতি। কিন্তু সমস্যা হল, পাকিস্তানের বুকে গাছ-গাছালির মত গজিয়ে উঠেছে অনেক দল, উপদল। যত মত, তত পথ। কিন্তু এত মত আর এত পথের ঝরণাধারা থাকলে, কোনটাতেই স্নান করে হবে না স্বস্তি। কেউ নরম, কেউ গরম, কেউ চরম। এতগুলো নরম গরম চরমের সমাহার থাকলে সর্দি-গর্মি হবার সম্ভাবনা অধিক। এদিকে মুসলীম লীগের এক মত এক পথ। তার বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে অন্যকেও হতে হবে এক মত, এক পথের পথিক।

অতএব মেটাও ঝগড়া, ভোল বিরোধ, এসো ঐক্যের বন্ধনে। পূর্ববঙ্গের মানুষ দিচ্ছে ডাক, তোমরা সকলে এক হও, এক হও।

কিন্তু সাধারণ মানুষদের ডাক এত সহজে কানে যাবে কেন নেতাদের? আর কেনই বা তাতে করবেন কর্ণপাত? অতএব গোড়ার দিকে যে-যার দল নিয়েই রইলেন, উঠতে পারলেন না বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে। চললো আলোচনা, হল মত বিনিময়, করলো তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

যে-যার স্বার্থ সংরক্ষণে রইলেন অচল, সিদ্ধান্তে হলেন অবিচল। এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ, এত দলাদলিতে বেহাত হবার হাল। প্রত্যেকটি দল মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে দিতে চাইলেন দলীয় প্রার্থী। অর্থাৎ এক এক কেন্দ্রে একাধিক প্রার্থী মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী করাবেন দাঁড়। তার অর্থ, এই ফাঁকের ফাঁকা পথে অতি সহজেই বেরিয়ে যাবে মুসলীম লীগ।

অন্যান্য দলের এই সংকীর্ণ আচরণে ছাত্র সমাজ হলেন বিব্রত, হলেন মর্মাহত। তারা অন্যান্য দলকে শাসানী দিলেন, "আপনারা নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারতে চলেছেন। এতে ধরাশায়ী হবেন নিজেরাই, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন নিজেরাই, লাভবান হবেন মুসলীম লীগ। কাজেই আপনারা যদি সহজ পথে ঐক্যবদ্ধ না হন, তাহলে আমরা নিজেরাই লড়বো। আমাদের মন্ত্র হবে, একলা চলো রে।"

এবার হল কাজ। ছাত্রদের অপূর্ব নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সৎ চেষ্টা ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ, সমস্ত দলকে মিলিতভাবে চলায় দিল প্রেরণা, দিল উৎসাহ, দিল সাহস।

অনেকগুলো দলের মধ্যে একটা ভদ্রগোছের আপোষ রফা হল। এই যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হলেন ফজলুল হক, জনাব সুরাবর্দ্দি ও মৌলনা ভাসানী। তাঁরা তৈরী করলেন একটি নির্বাচনী ইস্তাহার, জনগণের কাছে রাখলেন একুশ দফার প্রতিশ্রুতি। ইস্তাহারে জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য একান্তভাবে যা অপরিহার্য, বলা হল তার কথা। কৃষি, সমবায় শিল্প ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে

দেওয়া হল অগ্রাধিকার। কিন্তু সব কিছুর সুর ছাপিয়ে যে সুর ভেসে উঠলো সংগীতের মত, তা হল 'আ মরি বাংলা ভাষা' ও যে অধিকার না পেলে জনগণের আত্মপ্রকাশ হবে সংকুচিত, আড়ষ্ট, স্তিমিত, বলা হল দিতে সেই অধিকার ঃ স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ সোনার বাংলার সার্বভৌমত্ব। যে দাবী আদায়ের জন্য উনিশ শো একাত্তর সালেও চলেছে জীবন-মরণ লড়াই।

এই স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ অটোনমির দাবীটি কি? সংক্ষেপে বলতে গেলে, দেশরক্ষা, বহির্বাণিজ্য, পররাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক লেন-দেন ইত্যাদি ব্যাপারে তদারকির দায়িত্ব থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানের। কিন্তু বাদ-বাকী কোন ব্যাপারের উপরই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না কেউ। তবে দেশরক্ষার একচেটিয়া অধিকার বর্তাবে না পশ্চিম পাকিস্তানের উপর। পূর্ববঙ্গে গড়তে হবে আঞ্চলিক বাহিনী, তৈরী করতে হবে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী, পূর্ব বাংলায় গড়ে তুলতে হবে নৌ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার।

এ তো গেল অটোনমীর কথা। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের শহীদ, যাঁদের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথে হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি-তীর্থ, তাঁদের কথা কি তাঁরা বেমালুম ভুলে গেলেন? আলবৎ না। ভাষা আন্দোলনের, একদিকে বিষাদাত্মক, ও অন্যদিকে গৌরবাত্মক, দিনটিকে জানাতে হবে উপযুক্ত শ্রদ্ধা, দিতে হবে যোগ্য মর্যাদা। শুধু কথায় নয় কাজে। ২১শে ফেব্রুয়ারীর সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে ঘোষণা করতে হবে শহীদ দিবসরূপে, করতে হবে ব্যবস্থা সরকারী ছুটির। শুধু এই, শুধু এতটুকু? না, আরো চাই। যাঁরা নিজেদের তারুণ্যের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে মাতৃভাষাকে করেছেন মহৎ ও মহীয়ান্, জীবনকে করেছেন পায়ের ভৃত্য, গেয়েছেন মাতৃভাষায় জয়গান, তাঁদের রাখতে হবে অমর করে, অক্ষয় করে, অম্লানতার অবিনশ্বর দ্যুতি দিয়ে। নির্মাণ করতে হবে তাঁদের জন্য শহীদ মিনার। আর, যে লক্ষ্যকে সামনে

রেখে দিয়েছেন তাঁরা প্রাণ, সেই লক্ষ্য ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রাসাদোপম বর্দ্ধমান আবাসকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গবেষণাগার করে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বাংলা ভাষা যাতে হয় সাতকোটি জনগণের মুখের ভাষা, বুকের আশা, তারও করতে হবে ব্যবস্থা।

ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই কববার যে মানসিকতা দেখা গেল প্রাক্ নির্বাচন মুহূর্তে, তার পটভূমিকা তৈরী হচ্ছিল অনেক আগে থেকে। উনিশ শো আটচল্লিশ সালে সর্বপ্রথম গড়ে উঠেছিল বিরোধী একটি সংগঠন, যার নাম যুব লীগ। পরবর্ত্তী সালে তৈরী হল আওয়ামী লীগ, যার উৎপত্তি স্থল ছিল ঢাকার নাবায়ণগঞ্জে। একের পর এক গজিয়ে উঠতে থাকে বাজনৈতিক দল। এক একটি দল ঘোষণা করতে লাগলো তাদের আদর্শ, কর্মপন্থা, লক্ষ্য ও আদর্শ। আওয়ামী লীগের যাঁরা নেতৃত্ব দিলেন তাঁদের অনেকেই রাজনৈতিক জগতে সুপরিচিত। এই দলের নেতা যিনি হলেন, তিনি চিবকালের সংগ্রামী নেতা। অদ্ভুত তাঁর সাহস, অশেষ তাঁর দূবদর্শিতা। ইনি হলেন মৌলানা ভাসানি। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন আতাউর রহমান, আবদুস সালাম এবং মনসুর আহমেদ। এঁরা হলেন দলের সহ সভাপতি। সম্পাদক পদে বৃত হলেন শামসুল হক, সহ সম্পাদকের পদে বৃত করা হল মুজিবর রহমানকে, মোস্তাক অহম্মেদ ও রফিকুল আহম্মানকে। কিন্তু দলের গোড়া পত্তনের মুখে মুজিবর ছিলেন জেলে। এরপর গড়া হল গণতন্ত্রী দল। সেটা হল বাহান্ন সাল। এই দলের নেতৃত্ব দিলেন মহম্মদ আলী ও হাজী মহম্মদ দানেশ। এর পরের বছর গড়া হল আরেক দল, যার পুবোভাগে এসে দাঁড়ালেন ফজলুল হক, দলের নাম দিলেন কৃষক-শ্রমিক দল। ধর্মান্ধ মোল্লাতন্ত্রকে পূর্ব পাকিস্তানের বুকে জমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নিজামে ইসলাম নামে-ও একটি দল গডে ওঠে সেখানে।

এই সব দলেরই মিলিত মোর্চা হল : যুক্তফ্রন্ট।

কিন্তু এই মোর্চার উপর পশ্চিম থেকে আসতে থাকে একের পর এক ঝড়। তাণ্ডবের পর তাণ্ডব, আঘাতের উপর আঘাত। উদ্দেশ্য, যাতে এই দলের হাড়-গোড় ভেঙে যায়, নির্বাচন হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত। মুসলীম লীগ তাঁর সেই চিরন্তন শাশ্বত বাণী তুলে ধরতে থাকেন নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে। সনাতন সেই ধর্মান্ধতার গায়ে মোড়া ইসলামের নামাবলী, সেই চিরন্তন ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের ধূম্র উদ্গীরণ, সেই শাশ্বত কাশ্মীর সমস্যা। এই তিনটি বিষয়কে নির্বাচনের হাতিয়ার করে তারস্বরে তাঁরা চীৎকার সুরু করে দিলেন। সেই চীৎকারের ঢাক হলেন মুসলীম লীগের বশংবদ করাচীর দৈনিক ডন, মর্নিং নিউজ, আজাদ ইত্যাদি অত্যন্ত প্রভাবশালী পত্রিকা, আর ঢোল হলেন মৌলনা ও মৌলভী-র দল। সেই ঢোল গেলেন মসজিদে মসজিদে। পড়লেন নমাজ, "শোন, তামাম-দুনিয়ার ইনসান্, মুসলীম লীগ ধর্ম রক্ষার্থে নেমেছেন নির্বাচনে। গোটা দুনিয়ার মুসলীম জাতিকে ইসলাম ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঐসলামিক বন্ধনে আবদ্ধ করাই তাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের পথে পৌঁছুনোর জন্যে দরকার আত্মত্যাগের, দরকার সাধনার, দরকার সংযমের। ভায়েরা, মুসলীম লীগের এই আদর্শকে সমর্থন করবেন, সাহায্য করবেন ও মদৎ জোগাবে৹। তাহলে বেহস্ত পাবেন। এর অন্যথা যাঁরা করবেন, তাঁদের কাফের ও পাকিস্তানের দুষমন ছাড়া অন্য ভাবা যাবে না।

মুসলীম লীগ ক্ষমতায় এলে সব সমস্যার সমাধান হবে, সব অভিযোগের প্রতিকার করবে। পশ্চিম পাকিস্তানের খালের জল, দলে দলে উদ্বাস্তুদের আগমন, সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করে কড়া নোট পাঠানো হবে হিন্দুস্তানের কাছে। তারা যদি আমাদের দাবী না মানে, তবে গর্দান নেওয়া হবে তামাম হিন্দুস্তানের। জেহাদ করা হবে ওদের বিরুদ্ধে।

কাশ্মীর? হবে, হবে, তারও ফয়সালা হবে। ওটা একটা সমস্যা

আছে নাকি? পর্বত মহম্মদের কাছে অভিমান করে না এলে, মহম্মদই পেয়ার করে নিয়ে আসবেন পর্বতকে? কিন্তু মনে রাখবেন ভাইয়ো ও বহিনো, যুক্তফ্রন্ট আমাদের বিরুদ্ধে ঝুট বাৎ বোলে একটা ঝামেলা করতে চাইছেন। এদের জিন্দেগী বরবাদ করে দিতে হবে।"

ঢোলেরা এই সুর তুলেছেন, ঢাকেরা অমনি তা পেটাতে শুরু করলেন। সেই ঢাক-ঢোলের মিলিত সংমিশ্রণে কি ঐকতান সৃষ্টি হল, এবং তার অনুরণ কি অনুভূতি সৃষ্টি করলো নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে, তা বোঝা গেল পরে।

মুসলীম লীগের সমর্থনে এগিয়ে এলেন ফতেমা জিন্না। তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কার করে দিলেন,—"পাকিস্তানের একমাত্র দোস্ত বলতে যদি কেউ থাকে, সে মুসলীগ লীগ। জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে, দুঃখ, দারিদ্র, কষ্ট মোচনে তাঁরা করেছেন নিজেদের জীবন উৎসর্গ। অতএব, পাকিস্তানের স্বাধীনতা, ঐক্য, সংহতি রক্ষা, ও পাকিস্তানকে নতুন যুগের উদয় লগ্নে নিয়ে যাবার জন্য মুসলীম লীগকেই ভোট দেওয়া কর্তব্য।"

পূর্ববঙ্গের লীগ মুখ্যমন্ত্রী আরো পরিষ্কার করে দিলেন, "পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ইসলামী গঠনতন্ত্র রচনার সলিল সমাধি হবে, লীগকে যদি ক্ষমতার মসনদের রাজ-মুকুট না পরাও।"

একের পর একটি নেতা, বয়সে যাঁরা প্রবীণ, বিচক্ষণতায় যাঁরা অভিজ্ঞ, রাজনীতিতে যাঁরা ধুরন্ধর, ছুটে এলেন সেই সব ধুন্দুমারেরা ঢাকায়। পূর্ববঙ্গের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তাঁরা ঝড়ের বেগে ছুটে বেড়াতে লাগলেন: মিসেস্ ফতিমা জিন্না, আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম খান, পাক প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলী। তাঁদের মদৎ জোগালেন করাচী চালিত রেডিও।

কিন্তু এত ঢাক-ঢোল, এত জোরালো ও ঝাঁঝালো প্রোপোগাণ্ডা, এত স্বর্গরাজ্যের প্রতিশ্রুতি, সবই হয়ে গেল গুড়ে বালি।

অথচ যুক্তফ্রণ্টের কি ছিল? ছিল না কোন ঢাক, ছিল না কোন ঢোল। এমন কি, তাঁরা এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন না যে, সোনার পাথর বাটিতে খাঁটি দুধের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন।

তাঁদের শুধু ভরসা, আছেন তাঁদের সংগে জনসাধারণ, আছেন তাঁদের সংগে চোখে-মুখে নূতন দিনের সূর্য নিয়ে প্রাণ-চাঞ্চল্যে উদ্দীপিত ছাত্রেরা, আছেন তাঁদের সংগে উৎপীড়িত সর্বহারারা, আছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের আদমীরা। এঁরাই যুগে যুগে সৃষ্টি করেছেন ইতিহাস, এঁরাই ভেঙ্গেছেন শৃঙ্খল, এঁরাই গেয়েছেন জীবনের জয়গান। এঁরাই হলেন যুক্তফ্রণ্টের একমাত্র মূলধন ও আশাভরসা।

এই জনগণ ভুলে যান নি, পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা কথায় কথায় পূর্ববঙ্গকে শাসানি দেন, বজ্র চোখের ধমক দেন। এই জনগণ ভুলে যান নি, কথায় কথায় প্রিয়তম নেতাদের বলেন দেশদ্রোহী, বলেন বিশ্বাসঘাতক, বলেন হিন্দুস্তানের এজেন্ট, বলেন বিচ্ছিন্নতাকামী, বলেন কাফের। একুশে ফেব্রুয়ারীর সেই শহীদ রক্ত-তীর্থের কথা ভুলে যান নি এঁরা। পশ্চিম পাকিস্তানের বেপরোয়া উদ্ধত রাইফেল সেদিন নিয়ে ছিল নিরীহ প্রাণের তাজা খুন। কিন্তু কি ছিল এদের অপরাধ? এঁদের একমাত্র অপরাধ, বাংলা ভাষাকে এঁরা করতে চেয়েছিলেন বুকের ভাষা; প্রাণের ভাষা, রাষ্ট্রভাষা। তাই রক্তের হোলি উৎসবে পশ্চিম পাকিস্তানের শায়েন-শা-রা দিয়ে ছিলেন তার জবাব।

এঁরা ভুলে যান নি, পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদরীতে আনা হল শুধু 'States' এর একটি মাত্র অক্ষর 'S' বাদ পড়ে যাওয়ার ফলে, ছাপাখানার ভুলের দৌলতে। পাকিস্তানের লাহোর পরিকল্পনায় যার ছিল না কোন উল্লেখ, ছিল না কোন প্রস্তাব। যার হবার কথা ছিল স্বাধীন সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তাকে গাঁট ছাড়া বাঁধানো হল পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে। ভুলে যান নি এঁরা, পূর্ব

পাকিস্তানকে করে রেখেছেন ওঁরা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকদের বেনামী বন্দর। ভুলে যাননি এঁরা তাঁদের রক্তের পরিশ্রমে উৎপাদিত ভোগ্য বস্তুতে নিজেদের নেই কোন অধিকার। ভুলে যান নি এঁরা, শাসন ও শোষণই হল পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের আদর্শ-বিলাস।

সেদিনের নেতাদের গাফিলতি, দূরদর্শিতার অভাব, অন্ধ ভাবাবেগ পূর্ববঙ্গকে দেউলিয়ার শেষ প্রান্তে নিয়ে এসেছে। আজো তারই মাসুল গুণতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষদের। কিন্তু আবার যদি ইতিহাসের ভুল করেন, বংশধরেরা ছেড়ে দেবে না, করবে না কসুর মাফ। ব্যক্তিগত ভুলকে ক্ষমা করা চলে, কিন্তু ইতিহাসের ভুলকে ক্ষমা করা চলে না। কারণ, গোটা জাতির আশা-আকাঙ্খার হৃদ্‌-স্পন্দন ইতিহাসের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়, রূপ পরিগ্রহ করে।

তাই, পূর্ববঙ্গের সংগ্রামী জনতা শপথ নিলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে, সূর্য সাক্ষী রেখে, আত্মত্যাগের রক্তে যারা নির্মাণ করেছেন শহীদ-তীর্থ, তাঁদের আমরা ভুলি নি, ভুলবো না।

পূর্ব বংলার বুক থেকে ঝরেছে অনেক রক্ত। তখনও তার গা দিয়ে পড়ছে তা চুইয়ে চুইয়ে। সেই ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে, তাকেই স্মারক-তীর্থ করে জনগণ এসে দাঁড়ালো উনিশ শো চুয়াল্লিশ সালের প্রাক্ নির্বাচনের সিংহদ্বারে।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত সেই গণ-জাগরণের চেহারা দেখে কেঁপে উঠলো লীগ শাসকদের হৃৎপিণ্ড, সুরু হল ধুকপুকুনি। অবস্থা এমনই দাঁড়ালো যে বেগতিক দেখে চৌত্রিশটি উপনির্বাচন করা হল বন্ধ। এমনকি একটি নির্বাচন সভায় পাক প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীকে হতে হল নাজেহাল। বগুড়ার সেই সভায় মহম্মদ আলির অবস্থা হল, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি,' থাক নির্বাচন, থাক জনগণ, প্রাণটা আগে বাঁচাই আমার। ভাষণ না দিয়েই সরে পড়তে হল সেখান থেকে।

নির্বাচনের কয়েক দিন আগে থেকে চললো পুলিশী জুলুম, আরম্ভ হল অত্যাচার। ব্যাপক ধড়পাকড় সুরু হয়ে গেল। যাকে সামনে পেল, তাকেই পুরলো জেলের খাঁচায়। এইভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হল পূর্ববঙ্গে। নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জেলের স্বাদ দেওয়া হল তের হাজার ব্যক্তিকে। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা যুক্তফ্রণ্টের সমর্থক ও কর্মী। যুক্তফ্রণ্টের নির্বাচনের সাফল্য লাভের জন্য এঁরা জান দিয়ে লড়ছিলেন।

যাই হোক, এলো সুবর্ণ সুযোগ। অনেক বাধা বিপত্তি, অনেক প্ররোচনা ও উত্তেজনা সহ্য করেও জনগণ এলেন তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রয়োগ করতে। তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন-প্রার্থীদের বিজয়ীর মুকুট পরাতে।

কিন্তু কাদের গলায় শোভা পেল বিজয়ীর সেই স্বর্ণ-মাল্য? এদিকে মুসলীম লীগ জয়ের আনন্দে উল্লাসিত। তাঁদের বিশ্বাস ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার আফিম সেবন করিয়েছেন জনগণকে, তাতেই তারা আচ্ছন্ন। অন্যদিকে চোখ খোলার মত ফুরসৎ তাদের নেই।

অবশেষে, নির্বাচনের ফলাফল বেরুল। ফল দেখে মুসলীম লীগ নেতাদের চক্ষু চড়কগাছ। মুসলীম কাফেরেরা করেছে কি, বেইমানী করেছে,বদ্‌মাশী করেছে। এই সব কাফেরেরা সাতপুরুষের বিশ্বাস-ঘাতক। পূর্ব বঙ্গের তিনশো দশটা এ্যাসেম্বলী সীটের মধ্যে মুসলীম লীগকে দিয়েছে মাত্র নটা সীট! অনেক বাবা-বাছা বলে, মাথায় আদরের সোহাগ বুলিয়ে, প্রতিশ্রুতির বৃহৎ মরা কান্না কেঁদে এই ফল! বাকা সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে! পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সবে গোঁফ ওঠা পঁচিশ বছরের অখ্যাত এক যুবক-প্রাণের কাছে শোচনীয় ভাবে ধরাশায়ী হয়েছেন। অনেক ধুরন্ধর লীগ নেতাদের বহু সাধের জামানত-ও চলে গেছে নাগালের বাইরে। হায়, একি খোদাতাল্লার বিচার! এই ছিল তোমার মনে তো বললে না কেন আগে!

ফতেমা বেগম, পাক প্রধান বগুড়ার মহম্মদ আলী, আবদুল কোয়াম খান প্রভৃতি লীগ নেতাদের মুখ চুন হল। মুসলীম লীগের কফিন বয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে। সেই কফিনের সংগে রইলো না কেউ, করাচীর গোরস্থানে মুসলীম লীগকে দেওয়া হল কবর। এমন কি যাঁরা পিটিয়ে ছিলেন ঢাক, ধরেছিলেন যাঁরা ঢোল, তাঁরা-ও এলেন না নমাজ পড়তে। করাচীর আকাশে তখন অনেক রাত।

কিন্তু পূর্ববঙ্গে দেখা গেল আশার সূর্য। আকাশে বাতাসে উঠতে লাগলো রাশি রাশি মুক্তির ফানুস, নক্ষত্রেরা হাসির উল্লাসে নাচতে লাগলো। মাধবিকা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দিল তার মিষ্ট সৌরভ। পুষ্পিত প্রলাপে, মর্মর ধ্বনিতে কেঁপে উঠতে লাগলো আকাশ বাতাস।

আলোর উৎসবে মেতে উঠলো গোটা পূর্ববঙ্গের নবজাগ্রত জনতা।

সখাত সলিলে ডুবে মরলো মুসলীম লীগ। শুধু মুসলীম লীগই নয়, পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের শাসন, শোষণ ও উপনিবেশের লীলাভূমি করবার যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল পিছনের দুয়ার দিয়ে, তারও ঘটলো অপমৃত্যু। পশ্চিম পাকিস্তানের লীগ শাসকেরা বুঝলেন, গোটা জাতিকে মর্ফিয়া ইনজেক্‌সন্‌ দিয়ে চিরকাল জীবন্মৃত করে রাখা যায় না।

পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় মনে হয়েছিল। অথবা যদি বাঁচতে হয়, বীরের মতই বাঁচতে হবে। কাপুরুষের মত, ভীরু দুর্বলের মত প্রতি মুহূর্তে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটানোর চেয়ে মৃত্যুবরণ ঢের গৌরবের। তাতে মনুষ্যত্বও বাঁচে, দুর্বলের অপবাদও সইতে হয় না।

অথচ যে যুক্তফ্রণ্টকে সাফল্যের অভাবনীয় গৌরব দিলেন পূর্ববঙ্গের যুব সমাজ, সেই যুবসমাজই উনিশ শো ছেচল্লিশ সালে

মুসলীম লীগকে মাথায় তুলে ছিলেন। অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন মধ্যাহ্ন সূর্যের মত ঘুরপাক খেয়েছিল সেদিন এই মুসলীম লীগ ঘিরে। সেদিনও তাঁরা অভাবনীয় সাফল্যের রাজতিলক এঁকে দিয়ে ছিলেন মুসলীম লীগের ললাট দেশে। কিন্তু তাদের আশার মুসলীম লীগ দেননি কোন মূল্য, স্বপ্নের দেননি কোন মর্যাদা। নিজেদের মানসিক বিলাসিতা নিয়ে ছিলেন তাঁরা মস্‌গুল।

দেখা যাচ্ছে ইতিহাসেরও চাবুক আছে। ইতিহাসও কথা বলে চুপি চুপি। আর সেই ইতিহাসের রায় বড়ো হৃদয়হীন। ইতিহাস অর্থাৎ জনগণ যার চালিকা শক্তি। অতএব, ইতিহাস যদি সৃষ্টি করতে চাও, জনগণেব কথা বল, জনতাব বুকের আশাকে দাও বাস্তব রূপ। তা না হলে তোমায় ছেড়া কাঁথাব মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে ইতিহাস শ্মশানের গহ্বরে, আবর্জনাব ডাষ্টবিনে। ইতিহাস অর্থাৎ জনগণ।

কিন্তু ইতিহাসের চাবুক কি মুসলীম লীগের চোখ খুলে দিতে পেরেছিল? বুঝতে পেরেছিলেন ইতিহাসও কথা বলে?

এর উত্তর কি দেয় ইতিহাস?

এই নির্বাচন যে মুসলীম লীগকে পূর্ব পাকিস্তানের বুক থেকে খড়ের কুটোর মত বববাদ করে দেবে, তা লীগ পাকিস্তান কল্পনাও করেন নি। তাঁরা ভেবে ছিলেন, বড়ো বড়ো কিছু বুলি আওড়ে কিস্তিমাৎ করবেন। কিন্তু জনগণকে ধোঁকা দিয়ে, ধাপ্পার বনিয়াদ রচনা করে, কত দিন একটি জাতিকে শাসন ও শোষণের হাতিয়ার করা চলে? ধাপ্পার বনিয়াদ একদিন মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ে জনতার রাজপথে, মিথ্যের সাজানো রাজপ্রাসাদ তাসের ঘরের মত একদিন মিলিয়ে যায় শূন্য দিগন্তে।

এই মিথ্যের মুখোসকেই তাঁরা হ.ওয়ার করে জনগণকে আবার এক ষড়যন্ত্রের বজ্র নিষ্পেষণের চক্রান্তে ফেলার জাল বিছিয়ে ছিলেন পাকিস্তানের সর্বত্র—এ-কোণে, ও কোণে। কোন কোণ-ই বাদ পড়ে নি, যেখানে এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার না হয়েছিল।

তাঁরা ভেবেছিলেন, এবার-ও তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে এই ফাঁদে বন্দী করবেন। তারপর তাঁদের পায় কে!

এই নির্বাচন জনগণের-ই নির্বাচন, এই নির্বাচন জনগণেরই বায়। জনগণের কল্যাণার্থে-ই তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন এই নির্বাচন। অতএব, এই নির্বাচনে জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ্, বন্ধু, মুসলীম লীগকে ক্ষমতার মসনদে রাজ মুকুট পরাও।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেমন লীগ শাসকেরা, তা ইতিপূর্বেই হাড়ে হাড়ে তার নোনা স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন জনগণ। কাজেই, এবার লীগ শাসকদের গাল-ভরা মিষ্টি মিষ্টি স্তোকবাক্য তাদের সতর্ক করে দিলো, সাবধান! আবার যদি তোমরা এই ছলনার চক্রান্তে ধরা দাও, তবে পূর্ব পাকিস্তানের উপর লীগ শাসন একচ্ছত্রভাবে কায়েম হয়ে যাবে। তখন তাদের নিষ্পেষণ যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোলা থাকবে না।

কাজেই রাজনৈতিক-সচেতন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে সুস্পষ্ট ফল ঘোষণা করলেন, তাতে লীগ শাসকদের ঘুম ভেঙে গেল। এমন সুখের সংসারে যে এ-ভাবে অশান্তির বহ্নি-শিখা জ্বলে উঠবে, তা তাবা ভাবতে পাবেন নি। পূব পাকিস্তানের এই বিরাট রাজনৈতিক জয়কে বস্তুতপক্ষে পূব বাঙলার বিদ্রোহী জনগণের ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণ-অভ্যুত্থান বলা চলে। বিরাট এই সাফল্যকে শুধু রাজনৈতিক জয় বললে ভুল বলা হবে। এই জয় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল: পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণের বুক কত সবল ইস্পাতে তৈরী।

কিন্তু এই পরাজয়কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব খুব সহজভাবে মেনে নিতে পারলেন না, ভিতরে তাঁদের মধ্যে বিরাট ক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার হল। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রমাদ গুণলেন, পূর্ব বাংলার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণ-জাগরণ শেষ পর্যন্ত যদি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে তাহলে সর্বনাশের একশেষ হবে। আর গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত

যুক্ত-ফ্রন্টকে যদি মন্ত্রিত্ব গঠনের আমন্ত্রণ জানান হয়, তাহলে একেবারে সোনায় সোহাগা! পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে স্বাতন্ত্রতায় চিহ্নিত করবে।

অতএব, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গের সুখের ঘুম মাথায় উঠলো। এদিকে কিছুসংখ্যক অফিসার, যাঁরা পাঞ্জাবী ও অবাঙালী, তাঁদের উর্বর মস্তিষ্ক গোপন রিপোর্ট পাঠাতে সুরু করলো, প্রাক্ নির্বাচনের এক বছর আগেকার ইতিহাস অবধান করো পাকিস্তানের সর্বময় প্রভুরা। আশা করি, সেই ইতিহাস তোমাদের মনে আছে। চট্টগ্রাম ও কর্ণফুলীর সেই বাঙালী অবাঙালীদের সংঘর্ষের ইতিকথা। সেই দাঙ্গায় অপারেটিফ ম্যানেজার থেকে সুরু করে লেবার অফিসার সহ তেরোজন অবাঙালী ঘাতকদের হাতে আত্মবিসর্জন দেয়। সেবারে তবু যা হোক রক্ষে ছিল। কিন্তু এবারের ইতিহাসের গতি অন্য দিকে। যুক্তফ্রন্টকে যদি মন্ত্রীত্ব গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে নির্ঘাৎ বাঙালী অবাঙালী দাঙ্গা সুরু হয়ে যাবে। এবং তাতে যে অবাঙালীরা নির্ঘাৎ খতম হবে, সে বিষয়ে আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। এবং তা করা চলে দ্বিধাহীন কণ্ঠে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে।

অতএব, করাচী থেকে ফতোয়া গেল গভর্ণর চৌধুরী খাজামুদ্দিনের. কাছে। গোলাম মহম্মদ বলে পাঠালেন, যুক্তফ্রন্টকে যেন মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সুযোগ সুবিধা থেকে যেন-তেন-প্রকারে বঞ্চিত করা হয়। প্রাক্তন লীগ নেতাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভদ্র বলতেই হবে। চৌধুরী সাহেব এই ফতোয়া অগ্রাহ্য করে উদার গণতান্ত্রিক মনের পরিচয় দিলেন। 'তিনি যুক্তফ্রন্টের সর্ববাদীসম্মত নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠিত হল।

হক সাহেবের মন্ত্রীসভা কয়েকটা দিন বহাল তবিয়তে রইল। কিন্তু তারপরেই এমন একটি ব্যাপার ঘটলো, কিংবা বলা ভালো, ঘটানো হল, যাতে যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠলো।

বাঙালী এবং অবাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঢাকা জেলে স্থুরু হল এক সংঘর্ষ এবং এই সংঘর্ষে বাঙালীদের রক্ষার্থে যোগ দিল পূর্ববঙ্গবাসীরা।

ঘটনাটি সামান্যই। কিন্তু এই ঘটনার উপর আরম্ভ হল রঙ্ চড়ানো। যা ছিল নিছক সামান্য ঘটনা, তাই রঙিন ঘটনা হয়ে কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছুতে লাগলো। এই তুচ্ছতম ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীত্ব যাতে খারিজ করা যায়, তার চেষ্টা চালাতে লাগলেন পূর্ব পাকিস্তানের অবাঙালী শাসক গোষ্ঠী। এবং এই মন্ত্রীসভা সুষ্ঠভাবে জনগণের সার্বিক কল্যাণে যাতে আত্মনিয়োগ করতে না পারেন, তার জন্য স্থুরু হলো পূর্ববঙ্গের অবাঙালী শাসক-গোষ্ঠীর গদীতে বসা মন্ত্রীদের নির্দেশ অমান্য, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির সযত্ন প্রয়াস। এই ভাবে একটি সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি হয়ে উঠতে লাগলো জটিল, গুরুতর ও গোলমেলে।

সেদিন ছিল পূর্ববাংলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় সন্ধিক্ষণ। ফজলুল মন্ত্রীসভার সেদিন ছিল গভর্ণরের কাছে শপথ নেবার পবিত্র দিন। কিন্তু এই পবিত্র দিনটিতে আগুণ জ্বালিয়ে দিল আদমজী মিলের কর্তৃপক্ষ, অবাঙালী শাসকগোষ্ঠী ও পূর্বপাকিস্তানের এক চক্ষু পাঞ্জাবীরা। ছকে আগে থেকেই দাবা সাজান ছিল। সেই দাবায় কেউ সাজলেন মন্ত্রী, কেউ সাজলেন রাজা, কেউ হলেন বড়ে। এবার কিস্তিমাতের পালা। আরম্ভ হল দাঙ্গা, স্থুরু হল লুঠপাট, সৃষ্টি করা হল অরাজকতা। এলো তরবারি, এলো লাঠি, এলো গোলা বারুদ, এলো আগ্নেয়াস্ত্র। নারায়ণগঞ্জের কাঁচা, শান্ত মাটি হয়ে উঠলো তপ্ত রুধিরাশ্রুতে লালে লাল। আকাশে, বাতাসে শোনা যেতে লাগলো অসহায় মানুষদের কাতর আর্তনাদ। নারী-শিশুর মৃত্যু-মিছিল ভাসতে লাগলো জলে-স্থলে। অবাঙালী শ্রমিকদের বীরত্বের আস্ফালনে আত্মবিসর্জন দিলেন শতাধিক নিরীহ অবোধ জীবন, যার অধিকাংশই খেটে খাওয়া বাঙালী

শ্রমিকদের দল। চতুর্দিকে জ্বলতে লাগলো আগুনের লেলিহান শিখা।

নারায়ণগঞ্জের হৃত-সর্বস্ব আগুন কিন্তু এত রক্তের বিনিময়েও নিভলো না। এই তো সবে শুরু, এখনো বাকী রাজাকে বধ করা। অতএব, করাচীর কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র ভবনে টরে টক্কার বজ্র নিনাদ শোনা যেতে লাগলো। মুহূর্তে মুহূর্তে কেঁপে উঠতে লাগলো রেডিওগ্রামের ইথার তরঙ্গ। পূর্ববঙ্গের অবাঙালী শাসকগোষ্ঠীর মিথ্যার বেসাতির আবদার শোনা যেতে লাগলো, "হুজুর, আবাঙালীদের জান-মান সব বরবাদ হয়ে গেল। উপায়? উপায় আছে বৈকি, জাঁহাপনা! এক্ষুণি, এই মুহূর্তে হক মন্ত্রীসভাকে আউট করে দিন!"

"হক মন্ত্রীসভাকে আউট?"

"হ্যাঁ, হুজুর। হক মন্ত্রীসভাকে বরবাদ না করলে একটি অবাঙালী-ও বহাল তবিয়তে থাকতে পারবে না।"

"তাই তো, তাই তো"— বলে ললাট কুঞ্চিত করলেন লাহোরের কর্তৃপক্ষরা। কিন্তু এই একটি মাত্র কারণে হক মন্ত্রীসভাকে বরবাদ করে দিলে, পূববঙ্গে জ্বলে উঠবে আগুন, এই নিছক সত্যটি তাঁদের বুকে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছিল। অতএব, অতোটা বেসামাল হলেন না তাঁরা। অথবা বলা ভালো, অতোটা দুঃসাহসের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হাড়ে-মজ্জায় এই কথাটি বুঝেছিলেন তাঁরা, পূর্ববঙ্গের জনগণ মানীর মান দিতে জানে, আবার বেইমানীর জবাব দিতেও কার্পণ্য করে না। একদিকে তারা উদার, অতিথি বৎসল, অপরদিকে তারা কঠোর, বল-দৃপ্ত।

তাই লাহোরের মাথাওয়ালারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চটাতে সাহস করলেন না। সবুরে মেওয়া ফলানো-ই তারা স্থির করলেন। দৃষ্টিকে তারা তাই রাখলেন সজাগ, হলেন আরো সতর্ক। খুঁজতে লাগলেন ফাঁক, যা দিয়ে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভাকে ঘায়েল করা যায়।

এদিকে আব্দারে অবাঙালীদের দিল খুশ্ করবার জন্যও লাহোর-কর্তৃপক্ষ দিল দরাজ করলেন। আদমজী মিলের ঘটনার জন্য বেয়াদপ হক মন্ত্রীসভাকে বরবাদ করা হল না। কিন্তু এক ঢিলে দুই পাখী মারবার এমন চমকপ্রদ নিদর্শন কোথায় আর দেখা যাবে, আর কোথায়-ই বা পাওয়া যাবে ? হক মন্ত্রীসভার কর্তৃত্ব থেকে কেড়ে নেওয়া হল পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনস্থইষ্ট পাক রাইফেল বাহিনীকে। তার সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন পাঞ্জাবের জি, ও, সি.।

নারায়ণগঞ্জে লালে লাল হয়ে যাওয়া প্রান্তরে শোনা যেতে লাগলো ভারী বুটের আওয়াজ খট্-খট্-খট্। হাতে হাতে ঝলসাতে লাগলো রাইফেলের উদ্ধত আস্ফালন।

আদমজী মিলের এই অপ্রীতিকর দাঙ্গা, সে দাঙ্গার জন্য যেই দায়ী হোক না কেন, বিচলিত হলেন হক সাহেব। মুহূর্তের বিলম্ব না ঘটিয়ে তিনজন মন্ত্রীকে পাঠালেন তিনি দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে। আদেশ দিলেন : "করো সরেজমিনে তদন্ত।" নির্দেশ দিলেন, "পাঠাও অবিলম্বে রিপোর্ট। অপরাধী যেই হোক না কেন, তার অনিবার্য দণ্ড তাকে পেতেই হবে।"

হক সাহেবের কড়া আদেশ নিয়ে ছুটলেন তাঁরা সরেজমিনে তদন্ত করতে। কে এই ষড়যন্ত্রের নায়ক, খুঁজে তাঁকে বের করতেই হবে। বধ্যভূমিতে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এই দুরাচারীকে।

কিন্তু হা হতোস্মি ! সব কিছু ব্যবস্থা করলেন হক সাহেব, যোগ্য প্রতিবিধানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন, তাকালেন না কোন দিকেই, না বাঙালী, না অবাঙালী। তাঁর কাছে বিচার, বিচার-ই, অন্যায়, অন্যায়-ই, সেখানে পক্ষপাতিত্বের কোন প্রশ্ন খাটাতে পারে না, পারে না থাকতে কোন অন্যায় আব্দারের দাবী।

হক সাহেব হক কথাই বলে ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গের কিছু কাগজ, যাঁরা নিজেদের সর্বস্ব বন্ধক রেখেছিলেন করাচী কর্তৃপক্ষের কাছে, তাঁরা সুরু করে দিলেন মরা কান্না। উৎকট

বিভীষিকায় তাঁরা আর্তনাদ করতে লাগলেন, "বাতিল করো হক মন্ত্রীসভাকে, প্রয়োগ করো ৯২-এ ধারা।

শকুনিদের মরা কান্নার ভোজে প্রধান অতিথি হলেন করাচীর মুসলীম লীগ। শেয়ানে শেয়ানে এই ভোজের উৎসবটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠলো। শয়তানের চুড়ামণিরা ফতোয়া দিলেন, "হটাও হক সাহেবকে।"

হক সাহেবের অপরাধ, যেহেতু বলেছেন তিনি হক কথা, যেহেতু বলেছেন তিনি, "উৎপীড়িতদের রক্ষা করাই তাঁর ধর্ম।" যেহেতু বলেছেন তিনি, "অন্যায়কারীকে কোন রকম প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর অভিধান-বহির্ভূত!"

বটে-ই তো অন্যায়। এমন হক্ কথা যাঁর মুখ দিয়ে বেরোয়, তিনি অপরাধী তো বটে-ই! আদমজী মিলের দাঙ্গার জন্য আর কি কারণ দায়ী? আদমজী মিল ইউনিয়নের সর্বময় কর্তৃত্ব আজকের ইতিহাসের নায়ক মুজিবর এবং পূর্ববঙ্গের অন্যতম সংগ্রামী নেতা মৌলানা ভাসানীর হাতে। এঁরা করিয়েছেন দাঙ্গা, এরাই বহিয়েছেন রক্তগঙ্গা! বাহবা যুক্তি! তাজ্জব বাৎ!

অতঃকিম?

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী সম্প্রদায়ের উপর ঢালাওভাবে দোষারোপ করা হল না। তাহলে দাবার আসর জমজমাট হবে কি করে! বরং এই দাঙ্গার সংঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলো ভারতের নাম। ভারতীয় চরেরা যত নষ্টের গোড়া অতএব চড়াও তাদের শূলে, করো কাজীর বিচার। সেই কাজীর রায়দানে বলা হল, "পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত-দরজা বন্ধ করো।"

এইভাবে একে একে দাবার ছকে পশ্চিম পাকিস্তানী বোড়েরা একটির পর একটি ঘর এগুতে লাগলেন। রাজাকে বন্দী করবার আরেকটি সুবর্ণসুযোগ তাঁদের ছকে এসে গেল। ফজলুল হক গেলেন কলকাতায়, আসর জমালেন তাঁর প্রাণের বন্ধুদের সংগে। কলকাতায়

দেওয়া হল তাঁকে এক ঘরোয়া সম্বর্ধনা। স্থান নির্বাচন করা হল শরৎ বসু একাডেমী।

এই কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য : হক সাহেব দক্ষ কূটনৈতিক খেলোয়াড় ছিলেন না। দিল যখন যে-কথা বলতে চাইতো, সেই কথা বাণীবদ্ধ করতে কার্পণ্য করতেন না কোন ঘরোয়া বৈঠকে কিংবা স্মৃতি বাসরে। দেশবন্ধু, শরৎ, সুভাষ, এঁদের কথা বলতে গিয়ে তাঁর এলো আবেগ, এলো চোখে জল। মনের সরলতায় তিনি তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। আর হবেন নাই বা কেন! এঁদের সংগে এককালে তিনি হাতে হাত মিলিয়ে ছিলেন, একসূত্রে বেঁধেছিলেন হৃদয় তন্ত্রীকে। তাই সেদিনও আবেগের সংগে স্বীকারোক্তি করলেন : "দুই দেশ ভাগ হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয়কে কেউ ভাগ করতে পারে নি। না পেরেছ তোমরা, না পেরেছি আমরা। নাড়ীব সূত্রে বাঁধা পড়েছি দুই বাংলার এক সন্তান। তাই পাকিস্তান " হিন্দুস্তান কথা দুটিতে এখনো পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি নি।"

এপার বাংলা ওপার বাংলার বন্ধুত্বের রাখী-বন্ধন যে কত দৃঢ, আন্তরিক ও সৌহার্দ্য-পূর্ণ, তা একটি কথার ভাগীরথী নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দিল। এপার বাংলাব কাগজে তাঁর হৃদয়ের এই মন্দাকিনী ধারাকে বাণীবদ্ধ করা হল। আর ওপারের খবর! ফজলুল হক সাহেব কখন কোথায় যান, কি বলেন, কেমন করে কিভাবে অঙ্গ-ভঙ্গী করেন, তার তাবৎ সংবাদ সংগ্রহের জন্য কায়ার পাশে অশরীরী ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতে লাগলো পাকিস্তানী গুপ্তচরেরা। সংগে সংগে রেডিওগ্রামে ইথার যন্ত্র টরে টক্কা করে আর্তনাদ তুলতে লাগলো। ওপার থেকে রাশভারি কণ্ঠের ভাঙা সুর ভেসে এলো, "হ্যালো"

"সর্বনাশ হয়ে গেছে, হুজুর।"

. ওপার থেকে উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল, "কেন, কি হয়েছে কি ?"

এপার থেকে খেদোক্তি শোনা গেল, "হবে আর কি, যা হবার তাই হয়েছে। হক সাহেব কলকাতার বুকে বসে পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নেবার ষডযন্ত্র করছন।"

কিন্তু কোথায় সেই প্রমাণ, কোথায় সেই দলিল দস্তাবেজ, যা দেখিযে ছিনিযে নেওযা যায হক সাহেবেব মসনদকে? নেই কিছু, আছে শুধু মিথ্যার বেসাতি। এদিকে হক সাহেব আবার একটা কডা বিবৃতি দিযে বললেন, "যা শুনেছ তা সবৈব মিথ্যা। পাকিস্তানই আমার যৌবনেব উপবন, বার্ধক্যেব বারাণসী। পাকিস্তানেব স্বাধীনতাই আমার হৃৎপিণ্ড, তাকে সবতোভাবে রক্ষা কবা আমার জীবনের ধ্রম। পাকিস্তানই আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা।"

কিন্তু চক্রান্তেব পর চক্রান্ত, একটার পর আরেকটা নালিশ। ঝড়ের পর ঝড, মিথ্যের পব মিথ্যের বেসাতি। এবার খোদ আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন লাল মুখো দুই ধূর্ত সাংবাদিক।

ঠোঁটেব কোণে বিগলিত অমাযিক হাসি, চোখের বক্র কটাক্ষে লোভের দীপ্ত লালসা। ভদ্রলোকদেব সাংবাদিক হতে নেইকো কোন মানা। কিন্তু সাংবাদিকেরা এমন বানানবাগীশ হন, তাবও একটি স্মারক রযে গেল। এঁবা হলেন রিপ্রেজেণ্টেটিভ অব রযটার ও নিউইয়র্ক-টাইমস। ইন্টাবভ্যু নেবেন শের-ই-বঙ্গালের। অতএব, আপত্তি কি ভদ্রকে আপ্যাযণ কবতে, সজ্জনকে অতিথি কবতে। বিনিময় হল নমস্কাব, চললো কুশল বার্তা বিনিময়। তারপর পকেট থেকে ঝাঁনু সাংবাদিকরা বাব করলেন চক্‌চকে ধারালো ছুরি। রাজাকে বধ কবতে হবে, শের-ই-বঙ্গালকে পুরতে হবে খাঁচায়।

ছলনার অভিনয বোঝা গেল অনেক পবে। ইন্টারভ্যু শেষ হল, হাতে হাত মেলালেন, মুখে সৌজন্যের হাসি বিতরণ করলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ছুটে গেলেন দুজন সাংবাদিক টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রের কাছে, পাঠালেন খবর। বেরুলো কাগজের হেডিং জুড়ে নিউজ।

দারুণ নিউজ। একেবারে হৈ-চৈ হুলুস্থুলুস পড়ে গেল চতুর্দিকে। দারুণ উৎকণ্ঠা, তীব্র উত্তেজনা।

কিন্তু ঠিক সেই নিউজ, যা দাবানলের মত ছড়ানো হল চতুর্দিকে। শের-ই-বঙ্গাল নাকি বলেছেন, "পূর্ববঙ্গকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শাসন ও শোষণের নিষ্পেষণ যন্ত্র থেকে মুক্ত করাই হবে আমার মন্ত্রীসভাব প্রথম পবিত্রতম কাজ। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা-ই হবে আমার বার্ধক্যের বারানসী।"

হট নিউজ-ই বটে! চাঞ্চল্যকর রটনাই বটে! এবং যাঁরা এই মিথ্যাকে সত্যের কাগজে মুড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়ে এলেন, রাতকে বানালেন দিন, তাঁদের ক্ষুরধার চালাকির তারিফ করতে হয় বৈকি!

বিবেক-বাণী আমাদেব শিখিয়েছে, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে হতে পারে বৈকি, অবশ্য তা নেহাৎ কদাচ। শুরু হল তোলপাড়, আরম্ভ হল তুলকালাম কাণ্ড। ঢাকার লীগ মহল ও করাচীর সংবাদপত্রগুলি ঐ সংবাদকে কেন্দ্র করে আরম্ভ করলেন দক্ষ যজ্ঞ। শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হকের সুউন্নত ললাটদেশ শিরোপা পেল, বিশ্বাসঘাতক। দেশের জন্য যিনি রাখেন নি কিছুই, ছেড়েছেন ঘর, ছেড়েছেন বাড়ী, ছেড়েছেন সুখ, ফেলেছেন আরামের সুখ-শয্যা, নিজের দেহ-মন-প্রাণকে করেছেন দেশপ্রেমের দেবালয়, বরণ করে নিয়েছেন ধূলাকীর্ণ প্রতিকূলতার শরশয্যা, তিনি হলেন বিশ্বাসঘাতক! দেশপ্রেমের কি অপূর্ব নির্লজ্জ পুরস্কার!

বসলো তদন্ত, এলো কমিশন, বিচার করলেন কাজী। নেপথ্যে রইলেন পাক প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী, তাঁর নবজাতক সন্তান এই তদন্ত কমিশন। ফজলুল হক ক্ষোভে, অপমানে ফেটে পড়লেন, চোখ দিয়ে তাঁর আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগলো, "মিছে, মিছে, সব মিছে। রাতকে দিন বানানো হয়েছে। এ-সব কথা আমার নয়, এ সব-ই বানানো। খোদার শপথ নিয়ে বলছি, মিছে, মিছে, মিছে।"

কিন্তু কোথায় তখন আল্লা, কোথায় তখন পবিত্র কোর-আন্, সব কিছু রইলো দূরে, একমাত্র সত্য হয়ে উঠলো লীগ ঔরস জাত দুজন সংবাদদাতার ধারালো দুই অস্ত্র, দুটি নোট বই। তাঁরা পাতা ওল্টালেন, দেখালেন, প্রমাণ করালেন, ফজলুল হক-ই এই অঘটন পটিয়সীর নায়ক।"

কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, ফজলুল হকের একটা ইতিহাস আছে। এবং সে ইতিহাস একদিনে তৈরী হয়নি। অনেক অশ্রু দিতে হয়েছে, অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে। অনেক অত্যাচার, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পেতে নিতে হয়েছে বুকে। হাসি মুখে সবই সহ্য করেছেন, করেছেন অগ্রাহ্য অমানুষিক নির্যাতন। গোটা তিন দশক তিনি যাদেব জন্য শোণিতপাত করেছেন, তারা গ্রাম বাংলাব অবহেলিত উৎপীড়িত কৃষক সমাজ, মুখে যাদের অন্ন নেই, দেহে যাদের বস্ত্র নেই, ঠোটে যাদেব হাসি নেই, আছে শুধু অশিক্ষা, দাবিদ্র, ব্যাধি, বঞ্চনা। অথচ সভ্যতার বনিয়াদকে ওরাই তিল তিল করে গড়ে তুলেছে। আশ্চর্য, যারা আলো দিচ্ছে, তারা জানে না কোথায আলো, কোথায বস্ত্র, কোথায় শিক্ষা, কোথায় হাসি, কোথায়-ই বা তার উৎসভূমি। সেই কৃষক সমাজকে তিনি বুকে তুলে নিয়েছিলেন, করে নিয়েছিলেন আপন। কোন ভেদাভেদ তিনি মানেন নি, কোন মালিন্য তাকে স্পর্শ করে নি। এই কৃষকদেব মুখে দিতে চেয়েছিলেন অন্ন, দেহে দিতে চেয়েছিলেন বস্ত্র, অন্তরকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন জ্ঞান-সূর্যের ভাতিতে।

সেই অবিসংবাদী নেতা, কৃষক সমাজের হৃদয়ের ধন হলেন পশ্চিম পাকিস্তানের উদার আতিথ্যে এবং তাঁদের পোঁ-ধবা কাগজের ঔদার্যে : বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু সূর্য ওঠে, রাত-ও হয় দিন, উদয় সূর্যের আলোয় ঝলমল করে চতুর্দিক, প্রকৃতির এটা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। অন্যায় চিরদিন-ই অন্যায়, মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা। বিবৃতি বেরুলো মৌলানা ভাসানির, বিবৃতি দিলেন লণ্ডন থেকে :

"পাকিস্তানী রঙ্গ-মঞ্চে আজ শকুনিদের কি অপূর্ব নাটক-ই না দেখছি। তাজ্জব বাৎ! শতকরা তিরানব্বই জনের গণ-সমর্থনপুষ্ট যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতি দোষারোপ। অতএব, তাঁরা যদি বিশ্বাসহন্তারক হন তাহলে তো বলতে হবে, এই তিরানব্বই জনেরা-ও বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যহীন, দেশের প্রতি ভালবাসায় কুণ্ঠিত, উদাসীন, বিমুখ। নির্লজ্জ মিথ্যারও একটা সীমা থাকা উচিত।"

কিন্তু কে শুনবে কার কথা! তাঁরা কানে দিয়েছিলেন তুলো, আর পিঠে বেঁধেছিলেন কুলো। এদিকে দাবার ছকে বোড়েরা প্রায় রাজাকে কোণ ঠাসা করে নিয়ে এসেছিলেন। অতএব কে শুনবে এখন ভাসানীর অর্বাচীন প্রলাপ।

শুধু একবার রঙ্গ-মঞ্চের দর্শকদের এই পবের শেষ অভিনয় দেখানোর ব্যবস্থা করা হলো। নেপথ্যে চলতে লাগলো তার-ই রিহার্সেল। দর্শকদেব বলা হলো, অপেক্ষা করো, এক্ষুনি মঞ্চের পর্দা উত্তোলিত হবে।

নরম সুরে গরম তলব গেল প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে: "আসুন করাচীতে, আমরা আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। বসুন আলোচনার টেবিলে, করুন আলোচনা। বাৎলান পথ—"

একটা ভদ্র আপোষজনক মীমাংসার আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ফজলুল হক ছুটে গেলেন করাচিতে, আমন্ত্রণকে জানালেন সুস্বাগতম। ভাবলেন, এবার আশার সূর্য উঠবে।

কিন্তু ফজলুল হক জানতেন না, ষড়যন্ত্রের জাল তাঁরা কত দূর বিছিয়েছে। কাজেই, হা হুতোস্মি! আশার বদলে পেলেন নিরাশা, মানের বদলে পেলেন অপমান, আলোচনার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন রক্ত চোখের বজ্র তর্জনী, ভদ্রতার বিনিময়ে লাভ করলেন অভদ্রতা। তাদের গলার সুর নরম, কিন্তু কথার সুর গরম, তাদের মুখে হাসি, বুকে বিষ। আলোচনার টেবিলে হল খানা-পিনা, চললো করমর্দন, উঠলো আলোচনা।

কিন্তু আকাশ হল আঁধার, বাতাস হল করুণ, সূর্যের আলো হল ম্লান। পেছনের দরজার দিকে বসান হল কূটনৈতিক দাবার আসর। দেখান হল লোভ, দেওয়া হল পদ। বলা হল, সকলকে-ই দেওয়া হবে রাজকীয় মসনদ। শের-ই-বঙ্গাল পাবেন পূর্ববঙ্গের গভর্নরের পদ, তবে গ্রহণ করতে হবে পাক গঠনতন্ত্রের মূলনীতি, দেখাতে হবে দ্বিধাহীন আনুগত্য, অথবা গ্রহণ করো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বের সোফা-সেট। মোহন মিয়া, আসরফ উদ্দীন চৌধুরী, আতাউর রহমান, লোভের নির্লজ্জ ব্যভিচারে তাঁরা কোন্ কোন্ মসনদ কায়েম করবেন? এঁরাও এসেছিলেন ফজলুল হকের সহযাত্রী হয়ে পাকিস্তানে দরবার করতে। করাচীর শাহেন-শা-রা এঁদের-ও আশার স্তোত্র শোনালেন, "ঘবড়াও মৎ, ব্যবস্থা একটা হবে-ই, যাতে দিল তোমাদের খুশ হয়।"

সেই দিল্ খুশের ফিরিস্তি কি, আতাউর রহমান হবেন পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, আর সেই ভাঙা আসরের বাসরে মন্ত্রী হবেন আসরফ উদ্দীন ও মোহন মিয়া আর কি চাই? সুখের স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত, সুখে স্বচ্ছন্দে করো দিন যাপন, খাও পোলাও মুর্গি, দিক বন্দুকধারী সেপাইরা কুর্নিশ, ঘুরে বেড়াও দেহ-রক্ষী নিয়ে যত-তত্র, যেখানে দিল্ তোমার চায়, যাও, গিয়ে করো স্ফূর্তি, নেইকো কোন বাধা, নেইকো কোন মানা।

শুধু দিবারাত্রিতে একটি কাজ করতে হবে তোমাকে করাচীর নেতৃত্ব যা বলে, তাকে 'জো হুজুর' বলে অভিবাদন করে দাও শুধু একটা টিপ সই। তারপর করাচীর সংগে করো মোহব্বৎ, থাকো রক্ষিতা হয়ে। এই, শুধু এতটুকু, আর কিছু নয়।

ফজলুল হকের এবার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হল কোথায় তিনি এসেছিলেন? নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে এসেছিলেন করাচীতে আলোচনা করতে। সৌজন্যের বিনিময়ে সৌজন্য, আলোচনার বিনিময়ে আলোচনা, ভদ্রতার বিনিময়ে ভদ্রতা, এই আন্তরিকতা ছিল

ফজলুল হকের মূলধন। কিন্তু আলোচনার আসরে তিনি বুঝতে পারলেন, ভুল করেছেন, মারাত্মক ভুল করেছেন। কার সংগে তিনি মোহব্বৎ করতে এসেছিলেন, কাকে জানাতে এসেছিলেন আলিঙ্গনের সোহাগ? এ যে সাপ, এর মুখে প্রেমের, প্রীতির, ভালোবাসার চুম্বন করতে গেলে বসাবে ছোবল। আর বসাতে বাকী-ই বা কি রয়েছে?

কিন্তু তাঁরা সৎ, তাঁরা অন্তরঙ্গ, তাঁরা ভদ্র, কোন প্রলোভনের আওতাই কাবু করতে পারে নি তাঁদের। সর্বোপরি তাঁদের হৃদয়ে যে জিনিসটি সূর্যের মত দীপ্তমান, নক্ষত্রের মত অম্লান, জল-আলো-বাতাসের মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে রয়েছে, তা হল তাঁদের দেশপ্রেম। অগ্নি-পরীক্ষায় বারে বারে যা সাফল্যের সৌধশীর্ষের জয়-পতাকা পেয়েছে। স্বপ্নে, জাগরণে, নিদ্রায় এই একটি মাত্র বস্তু সৌরমণ্ডলের গ্রহপতির মত চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে, স্বদেশেব হিত-ই তাঁদের স্বপ্ন, স্বদেশের দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা মোচনই তাঁদের সাধনা, স্বদেশের তরেই তাঁদের প্রাণ, স্বদেশ-ই তাঁদের হৃৎপিণ্ড। অতএব, থাক খানা-পিনা, থাক পোলাও মুর্গি, থাক সুখের স্বর্গরাজ্য, থাক কুর্ণিশ, থাক দেহ-রক্ষী। ঘৃণার থুতুতে সবই নিক্ষেপ করলেন তাঁরা নোংরা ছেড়া পাতার মত, আবর্জনার কুণ্ডে।

চটে লাল হয়ে উঠলেন করাচীর শাহেন-শা। বেয়াদপদের শায়েস্তা করবার ধারালো অস্ত্র তাঁদের তূণে আছে। অপমানে মুখ করলেন কালো, বুক করলেন অমানুষিক পৈশাচিকতায় বীভৎস।

ফজলুল হক, ব্যর্থ, ভগ্ন, রিক্ত, শূন্য ফজলুল ফিরে এলেন করাচী থেকে ঢাকায়। কিন্তু এই ব্যর্থতার বেদনা বুকে বইলেন না তিনি একা। তাঁর সঙ্গে আলোর মত, বাতাসের মত, শ্বাস-প্রশ্বাসের মত রইলেন জনগণ।

প্লেন ঘুরপাক খেতে খেতে স্পর্শ করলো ঢাকা বিমানবন্দর। নেমে দেখেন, এলাহি ব্যাপার! বীরকে বীরের মত যোগ্য সম্বর্ধনা

জানাতে এসেছেন জনগণ। ছুটে এসেছেন যুবতী, বৃদ্ধ, যুবক, ছুটে এসেছেন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র। ছুটে এসেছেন সকলেই। ঢাকার বিমান বন্দর কালো মাথার মিছিলে গেছে ছেয়ে।

উঠছে শুধু ধ্বনি, সমুদ্রোত্থিত সেই ধ্বনি তরঙ্গে কাঁপছে আকাশ, কাঁপছে বাতাস, কাঁপছে মাটি। সকলের কণ্ঠে একই সুর, একই ছন্দ, একই গান, সকলের হাত উর্দ্ধাকাশে উত্তোলিত, সকলের মুখে শেকল ভাঙার গান। সকলেই উষ্ণ আলিঙ্গনে করল অভ্যর্থনা: "শের-ই-বঙ্গাল জিন্দাবাদ, শের-ই-বঙ্গাল যুগ যুগ জিও।"

দেশের মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রীতি, ভালোবাসা ও, শ্রদ্ধার অভিনন্দনে ফজলুল হক হলেন অভিভূত, চোখের কোণে দু' বিন্দু অশ্রু শুধু করে উঠলো চিক্‌চিক্।

কিন্তু হক সাহেব খামোশ কেন, কেন নেই তাঁর কণ্ঠে ভাষা?

কারণ, রাইফেল উঁচিয়ে রয়েছে জঙ্গী বাহিনী। হক সাহেবের হক কথা বলা নিষেধ, দুটি প্রাণের কথা বলবেন, আপনজনদের জড়িয়ে ধরবেন বুকে, বিনিময় করবেন কুশল-বার্তা, তার উপায় নেই।

অতএব, খামোশ হয়েই তাঁকে চলে যেতে হলো জনগণের বিছিয়ে দেওয়া ভালোবাসার রাজপথ দিয়ে। সেদিনের দিনটি ছিল; উনিশশো পঞ্চান্ন সালের উনত্রিশে মে। আকাশের সূর্য তখন মধ্য গগনে।

তারপরেই এলেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং এন. এম. খান। এঁদের প্রথমোক্ত জন হলেন ডিফেন্স সেক্রেটারী, অন্যজনও আরেক সেক্রেটারী। একটি বিশেষ বিমান তাঁদের নিয়ে এলো ঢাকার মাটিতে। আকাশের সূর্য তখন অস্তাচলের দিকে।

কিন্তু তখন বিমান বন্দরের আরেক দৃশ্য। কিছুক্ষণ আগেকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দনে উত্তাল হওয়া বিমানবন্দর নিশ্চুপ, নীরব, জনশূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। যেন একটা শ্মশানের প্রেতপুরী।

নেই কোন আলো, নেই কোন উৎসব; নেই কোন জাঁকজমক। যেখানে নেই জনগণ, সেখানে কী-ই বা থাকতে পারে?

সেই অন্ধকারের প্রেতপুরীতে এসে নামলেন তাঁরা। পেলেন না কোন আলোর মালা, পেলেন না কোন উষ্ণ অভ্যর্থনা। পেলেন শুধু নিয়ম-মাফিক জঙ্গীশাহীর কাছে খট্‌খটে শুকনো স্যালুট। তাতে না আছে কোন বেগ, না আছে কোন আবেগ, না আছে জান, না আছে কোন গান।

এপাশে রাইফেল, ওপাশে রাইফেল পিছনে রাইফেল, সামনে রাইফেল, কড়া রাইফেল পাহারায় ধুক-ধুক করা প্রাণটা নিয়ে উঠলেন গভর্ণর হাউসে।

সেখান থেকে জারী করা হল ফর্মান। করাচীর দণ্ড মুণ্ডের কর্তাদের কাছ থেকে আগেই তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন লাল বাতি। সেখান থেকে দিলেন তাঁরা সবুজ সিগন্যাল। বরবাদ করা হল যুক্তফ্রন্টীয় মন্ত্রীসভাকে, পদচ্যুত করা হল পুর্ববঙ্গের রাজ্যপাল খালিকুজ্জামান ও তাঁর একান্ত সচিব হাফিজ ইমামকে। সেই রাজ্যপাট দখল করলেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও তার বশংবদ এন. এম. খান।

কিন্তু এখানেই শেষ নাহি রে। পূর্ববঙ্গে ঘোষিত হল জরুরী অবস্থা। কারণ? নেই কোন প্রকাশ্য বিবৃতি, নেই কোন যুক্তি-তথ্যের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। তথাপি নির্লজ্জ মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে শয়তানের কেন এই পৈশাচিকতা?

কারণ আছে বৈকি। কোন কারণ না থাকলেও কারণ একটা খাড়া করতে হবে। সেই খাড়া-করা কারণে কৈফিয়ৎ দেওয়া হল, "যুক্তফ্রন্ট সরকার মোহব্বত করছিলেন ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিকা করতেন ভারতের সংগে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে করতেন সম্পর্কচ্ছেদ।"

"সেই অবৈধ প্রণয় লীলার বিস্তর তথ্য এসেছে করাচীর হাতে। কিন্তু এই অবৈধ প্রণয় করাচীর না-পসন্দ্। তাই চূড়ান্ত নিকা-পর্ব ঘটবার আগেই জনক পাকিস্তান তার সন্তানের কল্যাণার্থে এই মহৎ ব্যবস্থাটি কায়েম করেছেন।"

অর্থাৎ তাঁদের যুক্তিতে কোন কারণ থাকার দরকার নেই। একটা মুখ যখন আল্লা দিয়েছেন, তখন যা ইচ্ছে তাই বললে কোন ট্যাক্স তো লাগবে না। অতএব যখন যা দরকার বলে যাও।

ভারত-ভয় রোগটি করাচীর শাসকদের 'ফ্লু'-এর মত পেয়ে বসেছিল। ভয় থেকে আসে আতঙ্ক, আতঙ্ক থেকে জন্ম নেয় ক্লীবত্ব, ক্লীবত্ব থেকে আসে মনুষ্যত্বহীনতা। এ ঠিক সংক্রামক ব্যাধির মত। সেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন করাচীর শাহেন-শা-রা। তাই অকারণের কারণে-ও তাঁরা যখন তখন একহাত নিতে কার্পণ্য করতেন না ভারতের। আসল কথা, যেন-তেন-প্রকারে সাধারণ মানুষদের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দাও অন্যত্র। তাদের ভারত-বিদ্বেষী করার এমন দুর্লভ সুযোগ আর কোথায় বা পাওয়া যাবে? আর সেই সুযোগে আরেকবার জগদ্দল পাথরের মত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের টুঁটি চেপে ধরা যাবে বজ্র আঁটুনীর সাঁড়াশী দিয়ে। কলোনিয়ালিজম-এর আসল চেহারাই এই। মুখে গণতন্ত্রের জয়-কীর্তন, কিন্তু বুকে স্বৈরাচারিতাবাদের নগ্ন মুখোস। যতক্ষণ পর্যন্ত পারো গণতন্ত্রের নামে হরিধ্বনি দিয়ে পেটাও ঢাক-ঢোল, তাতে থাকবে তোমার মুখোশ চাপা। কিন্তু যখন তা অসম্ভব হয়ে উঠবে, তখন আত্মপ্রকাশ করো স্ব-স্বরূপে, বিস্তার করো তোমার নগ্ন বাহুর উল্লাস।

সেই নগ্ন বাহু-ই তারা বিস্তার করলেন অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। যে যুক্তফ্রন্ট ছিল গণ-জীবনের আশা আকাঙ্খার প্রতীক, দুঃখের শরিক, সেই যুক্তফ্রন্টের উপর নেমে এলো উদ্যত খড়্গ। কোন প্রকাশ্য বিবৃতি নয়, কোন প্রকাশ্য কারণ প্রদর্শন নয়।

জনগণ হঠাৎ রাস্তায় রাস্তায় শুনতে পেল রক্ত গরম করা পাঞ্জাবী ভারী বুটের আওয়াজ, পথে-ঘাটে শকুনির মত ঘুরপাক খাওয়া মিলিটারী সাঁজোয়া গাড়ীর ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ।

জনগণ তো অবাক! কি হয়েছে, যুদ্ধের এত সাজ-বহর কেন? পূর্ব পাকিস্তানে ঘোষিত হয়েছে জরুরী অবস্থা। ফজলুল হককে সরিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে গদীচ্যুত করে সেই আসন কলঙ্কিত করেছেন মির্জা ইস্কান্দার খাঁ ও এম. এল. খান। বরবাদ করা হয়েছে পূর্ববঙ্গের গভর্ণর খালিকুজ্জামানকে-ও। খয়ের খাঁ গভর্ণর মির্জা সাহেব পূর্ববঙ্গের জনগণকে দিলেন এক কড়া শাসানি, "সাবধান, তোমরা যদি বেচাল্‌ী করো তবে কেলেঙ্কারীর একশেষ করবো। পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য রক্ষা, তা ইসলাম ধর্ম রক্ষার মতঃ একটি পবিত্র ব্যাপার। কাজেই সেই পবিত্র কাজ করতে, আমি দশ হাজার লোককে বেয়নেটের শাসনে নরকে পাঠাতে কার্পন্য করবো না, অবশ্য যদি মনে করি দরকার আছে। কারণ, ধর্ম রক্ষা ও পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা আমার কাছে সমান ব্যাপার।"

সেই ধর্ম রক্ষার্থে আর ঐক্য বাঁচাতে তিনি কি কি পবিত্র কাজ করলেন? সব আগে পোরা হল ফজলুল হককে কারাগারে। স্বগৃহে তিনি হলেন অন্তরীন। ঈদের দিনে ফজলুল হক নামাজ পড়বেন, খোদার কাছে প্রার্থনা জানাবেন। না, ধর্ম রক্ষার্থে ও ঐক্য বাঁচাতে গভর্ণর সাহেব কি করে তাঁকে প্রকাশ্য আলোতে আসবার অনুমতি দেবেন? ধর্ম রক্ষার পবিত্র কাজ তাঁকে করতে হবে না।

সভা-শোভাযাত্রা? বলো কি হে, তুমি ভয়ংকর লোক তো! পাকিস্তানকে জাহান্নমে পাঠাতে চাও? ঘরোয়া বৈঠক? তার মানে তলায় তলায় আবার তুমি ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করতে চাও! সেটি চলবে না হে বাপু। যুক্তফ্রন্টের নেতারা একটি ঘরোয়া বৈঠকে অগ্নি-গর্ভ পূর্ববঙ্গের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন, পাঞ্জাবী ফৌজের মেহেরবাণীতে করা হল তাও পণ্ড।

বাকী রইলো কি? কাগজ, সংবাদপত্র। দৈনন্দিন জীবনের হাল-চাল যাঁরা পরিবেশন করেন, সেই দৈনিক কাগজ। ওরা তো আরো সাংঘাতিক! একজন ফিল্ড মার্শাল যেমন যুদ্ধ করেন, তেমনি একটি কাগজও ইচ্ছে করলে যুদ্ধ জয় করতে পারে। ঘটনার গতিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে অন্য দিকে। কাগজের শক্তি অমোঘ, আঘাত তার স্থির-বদ্ধ, সমালোচনা তার যুক্তি-নিষ্ঠ। তাছাড়া, এ-কথা কে না জানে অসির চেয়ে মসির জোর হাজারো গুণ বেশী। একটা অসিতে একজন সাবাড় করা চলে, একটা মসিতে একটা জাতির মধ্যে বিপ্লব ঘটানো যায়।

কাজেই সব আগে, গোদের বিষফোড়াকে কষানো হল চাবুক: কোন কিছু প্রকাশ করার আগে সেন্সারের ছাড়পত্র নিতে হবে কর্তাদের কাছে। তারপর করতে হবে কর্ম। সরকারের কোন সমালোচনা করা চলবে না। এই অবস্থায় কাগজের চেহারা যা দাঁড়ালো, তা সাধারণ বুদ্ধিতে অনুমান করা চলে। শুধু কর্তাদের লাল চোখ থেকে রেহাই পেল মর্ণি নিউজ ও আজাদ। তাদের উপর এই উদার দাক্ষিণ্যের কারণ কি? পেছনের দরজা দিয়ে এই দুটো কাগজ কর্তাদের সংগে অবৈধ প্রেমালাপ করেন, তাদের গায়ে কাতুকুতু দেন আর মাঝে মাঝে ফষ্টি-নষ্টি, তাও দরকার পড়লে করতে হয় বৈকি! তাই এই হারেমের প্রতি ওদের এত সোহাগ, এমন দরদ!

বাকীরা শায়েন-শা-এর দুষমন। কাজেই তাদের উপর করা হলো নির্যাতন, পোরা হল জেলে, রাখা হল পচিয়ে। আদমজী মিলের বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে নিষ্ঠুরভাবে যিনি নির্মূল করেছিলেন, অপরাধীদের করেছিলেন শাস্তির ব্যবস্থা, সেই বে-সরম মুজিবরকে আগে করা হল কয়েদ। গণতন্ত্রী দলের সম্পাদক মহম্মদ আলি এবং আরো অনেক প্রগতিশীল যুব-নেতাকে গ্রেফতার করা হল। কারণ, নতুন দিনের স্বপ্ন ওদের চোখে মুখে, কর্মে ও সাধনায়। কারাগার যেন হয়ে উঠলো বন্দী-সৈনিকদের মুক্তি-তীর্থ।

সেই তীর্থ স্থানে এত বেশী ব্যক্তির সমাবেশ হল যে, তাঁদের জায়গা দেওয়াই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, সব কিছুকে করা হল খর্ব। সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকার, যা যে কোন সভ্য দেশের নাগরিকের প্রাপ্য, সব কিছুর উপর চাপানো হল কাঁটা তারের বেড়া জাল। পাঞ্জাবী সন্ত্রাসবাদ কালো ছায়ার মত প্রত্যেকটি জনগণের পেছনে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলো। তাদের জীবন থেকে মুছে গেল আনন্দ, সরে গেল আশা। যেখানে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনের গণ-সমর্থন রয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনুকূলে, সেখানে তাকে বরখাস্ত করার অর্থ, প্রকৃত প্রস্তাবে গণতন্ত্রেরই সমাধি। কাজেই জনগণ বুঝতে পারলো, তারা বাস করছে কাজীর রাজত্বে, যেখানে জনতা নয়, পাক প্রধান গোলাম মহম্মদের খেয়ালের খুশীই সব কিছু তিনি যে রায় দেবেন, তাকেই করতে হবে কুর্নিশ কাজেই আসল ক্ষমতা জনগণের না পশ্চিম পাকিস্তানের বুরোক্র্যাসি প্রধান গোলাম মহম্মদ যা বলবেন, জনগণকে তাই বাহবা দিয়ে সমর্থন জানাতে হবে। মহম্মদের হিটলারী শাসনের বুলেট আর রাইফেল যারা হলো, তারা হল পাঞ্জাবী ফৌজ, চিরকাল যারা গোলামীতে মাথা নাড়তে অভ্যস্ত।

কাজেই যুক্তফ্রন্টের বরখাস্তকরণ, শুধু একটি সরকারেরই পতন নয়। এই পতনের ফলে পাক-শাসক হিমালয়ের মত চেপে বসলেন পূর্ববঙ্গের নিরীহ সাধারণ মানুষের বুকে। মাত্র ছ মাস পেয়েছিল জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ। কিন্তু তারপরই নেমে এলো ঘনঘোর অমানিশার অন্ধকার।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা বজ্র-মুষ্টিতে সাঁড়াশীর কামড় বসালেন পূর্ববঙ্গের কোমল অঙ্গে। স্বৈরতন্ত্র শাসনের সুযোগ নিয়ে জনগণকে করলেন চাবুকের ঘোড়া। শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, পদে প্রতিষ্ঠায়, শিল্পে-সংস্কৃতিতে, প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাদেরকে

সুকৌশল চক্রান্ত করে দাবিয়ে রাখা হল। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পাঞ্জাবী ও উর্দু ভাষীর কব্জায় গেল। প্রত্যেকটি জায়গায় বাঙালী পদপদানত, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত হতে থাকল। উৎপীড়ন, সে তো সব আগেই আছে। একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলমান জাতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে যা চললো, তা হল, পূর্ববঙ্গের উপর সাম্রাজ্যবাদী ও দখলদারীদের উপনিবেশের শিবির প্রতিষ্ঠা ও শোষণের বেনামী বন্দর প্রতিষ্ঠা করা।

অথচ, কি তাদের অপরাধ? তাদের অপরাধ, তারা বাঙালী, তাদের অপরাধ তারা মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার রাজকীয় সিংহাসনে অভিষেক করেছে, তাদের অপরাধ তারা শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদীদের বজ্র-মুষ্টি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে বাঙালাকে, তাদের অপরাধ তারা শাসকের নির্মম চক্রান্তের মুখোশ খুলে ধরেছে, তুলে ধরেছে তাদের আসল উদ্দেশ্য। তাদের অপরাধ, তারা বুঝেছে বাঙালীর যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যকে, বুঝেছে তাদের চিত্তক্ষোভ ও বঞ্চনাকে, বুঝেছে তাদের আশা ও উদ্দেশ্যকে, বুঝেছে তাদের অভিযোগ ও অভাবকে। এই ছিল যুক্তফ্রণ্টের অপরাধ। তাদের আরো অপরাধ হল, তারা পূর্ববঙ্গের সকল মানুষের মুখে ফোটাতে চেয়েছিল হাসি, বুকে দিতে চেয়েছিল আলো, মনে দিতে চেয়েছিল সাহস, পেশীতে দিতে চেয়েছিল জোর। ঘোচাতে চেয়েছিল তাদের অভাব, দারিদ্র, ব্যাধি, প্রবঞ্চনা, খুলে দিতে চেয়েছিল কুসংস্কারের বন্ধন, দূর করতে চেয়েছিল তারা অশিক্ষা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতার শতাব্দীর অন্ধকার।

এই ছিল ফজলুল হক, মুজিবর রহমান ও অন্যান্য যুক্তফ্রণ্ট নেতাদের অপরাধ। এঁদেরই তো আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিৎ।

সেদিন নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদীদের এই উৎকট রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিশ্বের জনমত।

*   *   *   *

কোন জাতি একটি মাত্র কারণে কখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। দীর্ঘ দিনের অত্যাচার, অবিচার, শাসন ও শোষণ ধীরে ধীরে একটি জাতিকে নিয়ে আসে বিদ্রোহের রাজপথে। কিন্তু তার বারুদ সঞ্চিত হতে থাকে সকলের অলক্ষ্যে, অগোচরে। অসন্তোষ ও বিক্ষোভের বিদ্রোহ-বহ্নিতে সঞ্চিত হতে থাকে লাভা, ক্রমশ তা আগ্নেয়গিরির কৌলিন্য অর্জন করে।

দেওয়ালের লিখন পড়বার যাঁদের চোখ আছে, তাঁরা আগে থেকে সাবধান হন। বিদ্রোহের আগ্নেযগিরি বিস্ফোরিত হবার আগে তার কারণ অনুসন্ধান করেন এবং যথাসাধ্য প্রতিকারেব চেষ্টা করেন। কিন্তু চোখ যাঁদের অন্ধ, কিংবা একচোখা, সত্যকে তাঁরা দেখতে পান না, চূড়ান্ত বাস্তবকে তাঁরা করেন অস্বীকার।

পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যে এই সত্যটি নির্লজ্জভাবে পরিস্কার হয়ে গেল, পাকিস্তানের শায়েন-শা-রা পূর্ব পাকিস্তানে যা করতে যান, তা হল, সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ, শাসন ও শোষণের বেনামী বন্দর। পূব পাকিস্তানের জনগণের সার্বিক কল্যাণ, কি আর্থিক, কি সাংস্কৃতিক, কোনটা-ই তাঁদের কাম্য ছিল না।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পূব পাকিস্তানকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার সুকৌশল চক্রান্ত সেদিনের নেতাদের-ও চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। কারণ সেদিন জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের থিয়োরী তাঁদেরকে মোহান্ধ করে দিয়েছিল। আরেক দিনে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ তথা তার ফলে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের গায়ে অহেতুক সন্দেহের বীজ বপণ করে দিয়েছিল। কিন্তু মানসিক দিক থেকে একজন হিন্দু বাঙালী তথা মুসলীম বাঙালীর মধ্যে নেই কোন বিরোধ, তাদের সাংস্কৃতিক সভ্যতা একই খাতে প্রবাহিত, সেদিন এই সত্যটি ধরা পড়েনি অনেকের কাছেই। দ্বিতীয় কারণ, ধর্মান্ধতার মোহ মানুষকে

মুহূর্তে যতোখানি অন্ধ করে দেয়, তা আর কিছুতেই হয় না। ধর্মান্ধতার এমন-ই আবেগ, উগ্রজাতীয়তাবাদের এমন-ই প্রভাব।

কিন্তু সেদিন তাঁরা ভেবে দেখলেন না, একমাত্র ধর্ম ছাড়া কোন দিকেই সাদৃশ্য নেই পূর্ববঙ্গের সংগে পশ্চিম পাকিস্তানের। এ যুক্তি আমাদের নয়। কায়েদে আজম Pakistan a Nation গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নিজেই। সেদিন পাকিস্তান স্রষ্টার পরিকল্পনায় পূববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে গাঁটছাড়া বাঁধানোর কোন চিন্তা মাথায় জায়গা পায় নি। তিনি নিজেই বলেছিলেন, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, জলবায়ু, অর্থনৈতিক অবস্থা, তথা সংস্কৃতি ও সভ্যতা— কোনটার সংগে পূব ও পশ্চিমের মিল নেই। এই কারণে তিনি পূর্ববঙ্গকে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলবার চিন্তা করেছিলেন।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে এই বক্তব্য আরো পরিস্কার হবে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান জলপথে তিন হাজার ও স্থলপথে দুই হাজার মাইল ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন। এই দুই দেশের মাঝখানে হিমালয়ের বাধা স্বরূপ হিন্দুস্থান। কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে-ও দুই মানসিকতা ভিন্ন মেরুর। ওদের ভাষা উর্দ্দু, তার সংগে আবার যুক্ত হয়েছে আরবী অক্ষর আর বাঙালীর মুখের ভাষা, প্রাণের ভাষা বাংলা। তাদের আস্থা উর্দ্দু ঐতিহ্যে আর বাঙালীর আস্থা বঙ্গ-সংস্কৃতির উদার মন্দিরে। আর্য প্রধান পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান আহার রুটি আর গোস্ত। কিন্তু দ্রাবিড় মোঙ্গলের শঙ্কর মিশ্রণে সৃষ্ট বাঙালীর খাদ্য মাছ ভাত আর পূর্ববঙ্গের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পাট ও ধান, পক্ষান্তরে পশ্চিমের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, গম ও তুলা। পূর্ববঙ্গ নদী-মাতৃক দেশ, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান সেই কৌলিন্য দাবী করতে পারে না। তার মাটি অনুর্বর, রুক্ষ, কিছুটা কঠিন ও কর্কশ। আর সজল জলবায়ুর ফলে পূর্ববঙ্গের মাটি শ্যামল, স্নিগ্ধ, উর্বর ও তার মৃত্তিকা নরম। এই আবহাওয়া দুটি জাতির চরিত্রকে ভিন্ন মানসিকতায়

গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। পশ্চিমের লোকেরা চরিত্রের দিক থেকে কঠিন, কর্ত্তব্যে কঠোর, নিষ্ঠুরতায় অমানুষিক, কথা-বার্ত্তায় রুক্ষ, চেহারায় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, চাউনিতে ধূর্ত্ত। আর পূর্বের লোকেদের হৃদয় ভালোবাসায় দুর্বল, আবেগে উচ্ছল, ভাবালুতায় বিহ্বল, আত্ম-সম্মানে উজ্জ্বল। পাঞ্জাবীরা যখন ধরে বিলাসের সুরা পাত্র, কণ্ঠে তোলে কাওয়ালী গান, তখন পূবের বাঙালীরা উদাস সুরে ধরে ভাটিয়ালি গান, বাউলের বিরহে করে অমৃত পান।

দুই ভূখণ্ডের এই দুস্তর মানসিক বিপরীতমুখিতা সত্ত্বেও সেদিনের ভাগ্যবিধাতারা একটি অবাস্তব উদ্ভট মরীচিকার পিছনে ছুটে ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, ভৌগলিক দিক থেকে থাকুক না তিন হাজার মাইলের বিচ্ছিন্ন ব্যবধান, থাকুক না সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন মতের পথ, থাকুক না জলবায়ুর পার্থক্য, থাকুক অর্থনৈতিক ব্যবধান, এমন কি থাকুক মানুষের মধ্যে মানুষের মৌলিক উপাদানগত পার্থক্য, তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবু-ও তাঁরা একাগ্রতার মিলন-রাগিনী ঘোষণা করতে পারবেন। কিন্তু কি করে এমন অলৌকিক ব্যাপার তাঁরা ঘটাবেন?

ইসলামের আদর্শে, মুসলীম জাতীয়তাবাদের অপূর্ব ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করবেন, অবাস্তবকে করবেন বাস্তব, দিনকে করবেন রাত। সমস্ত বৈচিত্র্য ও ব্যবধান দূর করে, চিরাচরিত সৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে ধর্মীয় আবেগের দ্বারা একীকরণ করবেন তাঁরা দুই প্রান্তের। গড়ে তুলবেন একটি রাষ্ট্র।

পৃথিবীর ইতিহাস তো সে কথা বলে না। খণ্ড বিক্ষিপ্ত মধ্য-প্রাচ্যের গোটা মুসলীম জাতি তো একই ধর্মের ঐক্য-বন্ধনের রাখীতে রাঙানো তবু-ও তারা এক নয় কেন, কেন পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র তাদের? মরক্কো থেকে আরম্ভ করে ইমেন পর্যন্ত পনেরোটি রাষ্ট্র একই বিষুবরেখার অবস্থিত। তাদের এক ভাষা,

এক সংস্কৃতি, এক কৃষ্টি, একই ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে তারা সমবেত। তবু প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সত্ত্বা কেন?

সেই হাজারো বছরের ইতিহাস থাকা সত্ত্বে-ও তাঁরা অস্বীকার করলেন চূড়ান্ত বাস্তবকে, ইতিহাসের সত্যকে। বেশ ভালো কথা। কিন্তু উন্নাসিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পূর্ব বাংলার কি লাভ হল?

লাভের খতিয়ান কি হল, তা কয়েকটি উদাহরণ দিলে-ই দিবা-লোকের মত চোখের সামনে জ্বল জ্বল করতে থাকবে।

শিক্ষা থেকেই তার উদ্বোধন করা যাক। কারণ শিক্ষা-ই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা-ই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তার অভী লক্ষ্যের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আরম্ভ করা যাক। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়-ই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক প্রখ্যাতকীর্তি ছাত্রেরা বেরিয়েছেন, যাঁদের জ্ঞানের ও গুণের ভাস্বরতায় মুখ উজ্জ্বল হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন এঁরা এখান থেকেই। যে কোন দেশ, যে-কোন কাল এঁদের নিয়ে গর্ব অনুভব করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিই রত্ন-প্রসবিনী।

এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়লেন চূড়ান্ত আর্থিক অস্বচ্ছলতায়। অর্থ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে পড়বে। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উনিশ শো পঞ্চাশ সালে সত্তর লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়ে ধন্য করা হল তার চোদ্দ পুরুষকে। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়? তাদের কথা যাক, কেবল লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মোর প্রাণের সখা বলে তাকে দেওয়া হল চার কোটি দশ লক্ষ টাকা' অর্থাৎ, তাহলে হিসেবটা কি দাঁড়াল? একমাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়-ই পেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ছগুণ বেশী, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়কে হিসেবের মধ্যে আনলে পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান পেল পনের গুণ বেশী।

পূর্ববঙ্গের শিক্ষাগত যোগ্যতার হার ১৯.৯ শতাংশ, পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪.৪ শতাংশ। কিন্তু কোথায় রইল সেই যোগ্যতার ছাড়পত্র। উভয় পাকিস্তানে যারা পাঁচ বছরের শিক্ষা পেয়েছে, পূর্ববঙ্গে সেই সংখ্যা গেল কমে আর পশ্চিমে গেল বেড়ে। অবস্থা দাঁড়ালো এইরূপ, পশ্চিমের শিক্ষার হার ১০.১ শতাংশ আর পূর্ববঙ্গে সাধারণ শিক্ষিতের হার বেশী হওয়া সত্ত্বেও সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৭.৮ শতাংশ। এইভাবে শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গ গেল শিক্ষায় পিছিয়ে।

সত্যকে যাঁরা মিথ্যে বানান, সেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরাও মেনে নিয়েছেন, পূববঙ্গের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু শিক্ষার বেলায় কি তার চেহারা, কেমন তার সংখ্যা? পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা চার, পূর্ববঙ্গের দুই, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পশ্চিমে তিন, পূর্ববঙ্গে দুই, মেডিকেল কলেজের সংখ্যা পশ্চিমে ছয়, পূববঙ্গে এক। উনিশ শো সাতচল্লিশ থেকে ছাপান্ন সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় বহন করলেন এক কোটি তিপান্ন লক্ষ টাকা। আর পূর্ববঙ্গে? তার আবার শিক্ষার দরকার আছে নাকি? জ্ঞানের আলো পেলে তো বেয়াদপেরা বিদ্রোহ করবে। অতএব চোদ্দ লক্ষ টাকা ভিক্ষে দিয়ে অনুগৃহীত করা হল তাকে। এই অতিরিক্ত ঔদার্য্যের ফলে ২৭৮৪ জন শিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষক মানে মানে সরে পড়তে বাধ্য হলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তার কোন ঘাটতি দেখা গেল না, বরং ৯৮১৩ জন নবাগত শিক্ষকতা করতে পেয়ে ধন্য হল।

পাকিস্তান সরকার তৈরী করলেন এক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতির কাছে তাই তাঁরা পেলেন সাহায্য। সেই সাহায্যের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। এই টাকার পাঁচ শতাংশ মাত্র পড়লো পূর্ববঙ্গের ভাগ্যে এবং পশ্চিম পাকিস্তান পকেটস্থ করলো বাকী টাকা।

এবার ধরুন বেতার সংবাদ। উনিশ শো পঞ্চাশ সালে করাচী বেতারের জন্য ৩,৭৫,০০০, পেশোয়ারের জন্য ২,৫৫০০০, লাহোরের জন্য ২,৮২,০০০ টাকা, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ালো ন'লক্ষ বারো হাজাব টাকা। আর পূর্ববঙ্গের ঢাকা বেতার কেন্দ্রেব জন্য তাঁদের পকেট থেকে অতি কষ্টে বেরুল এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা। আর ঢাকা রেডিওকে চব্বিশ ঘণ্টা ঘোষণা কবতে হল উর্দু ভাষা আর আরবী হরফের মাহাত্ম্য। তার কতৃত্বের সোপানে এলেন অবাঙালী কর্তাবা।

'কেন পূর্ববঙ্গে অটোনমী (স্বায়ত্তশাসন)' শীর্ষক পুস্তকে মুজিবরের আওয়ামী লীগ যে তথ্য প্রকাশ কবলেন, তা হল :

"দুই পাকিস্তান স্থলপথে ১,০০০ এবং জলপথে ৩,০০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। কেনেডা ও বৃটেনের মধ্যে যে ব্যবধান পূব পশ্চিম পাকিস্তানেব ব্যবধান তার চেয়েও বেশি।"

"বাস্তবক্ষেত্রে করাচী সবকারেব কাছে পূর্ববঙ্গের কণ্ঠস্বর পৌঁছে না এবং কেন্দ্রীয় সবকাবেব কাছে এই অঞ্চলের বক্তব্যেরও কোন গুরুত্ব নেই। ৩,০০০ মাইল দূবে প্রতিষ্ঠিত সবকারেব সিদ্ধান্তে পূর্ব-ক্ষেত্রে তাই অবিচার হতে বাধ্য। পূববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং তার ফলে দুই ভূখণ্ডেব জনসাধারণের পক্ষে পবস্পবকে জানা এবং পবস্পরের সমস্যা অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।"

"অর্থনীতিব দিক দিয়েও পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্বশাসনের দাবী অতি যুক্তিসঙ্গত। কারণ, পরস্পরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। যোগাযোগের অভাব, উৎপাদন ব্যবস্থার ভিন্ন প্রকৃতি এবং মুসলমানের বিরাট পার্থক্যের ফলে এক অঞ্চলের সঙ্গে অপর অঞ্চলের পারস্পর্য রক্ষা করাও সম্ভব নয়।"

"পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে ১৪০০

মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড অবস্থিত। স্থলপথে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। বিমান বা স্থলপথে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ববঙ্গের তুলনায় অনেক কম। প্রায় সমস্ত জিনিসই প্রথমে করাচীতে আমদানী করা হয় এবং তারপরে আবার রপ্তানী করা হয় পূর্ববঙ্গে। তার ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানীকারীরা যে শুধু অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে তাই নয়,—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাল রপ্তানি করবার জন্যও অতিরিক্ত দাম ধার্য করে। সেজন্য বৈদেশিক জিনিসপত্রের দামই যে পূর্ব বাঙ্গে বেশি তাই নয়, এরূপ জিনিসপত্র পূর্ববঙ্গের চাহিদার তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায় বলে পূর্ববঙ্গের বাজারে অত্যন্ত চড়া দামেও বিক্রি হয়।"

"রাজনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্বশাসনের দাবী অনস্বীকার্য। বর্তমান যুগে সব দেশেই সরকারী কাজকর্ম জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে পরিচালিত করা হয়। ৩,০০০ মাইল দূর থেকে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সামান্য যোগাযোগ রাখাও সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে তাই রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতিরক্ষা করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে এই রাষ্ট্রে সমস্ত রাজকর্ম 'ইয়ুনিটারী' বা ঐকিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কতখানি ঐক্যস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে? জোর জুলুম করে অথবা পিস্তল দেখিয়ে কোন দেশের ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নয়।"

পূর্ববঙ্গের ইতিহাস এক শোষণের ইতিহাস। এই অঞ্চলের জনসাধারণের আয় থেকে এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে। এই অর্থ থেকে পূর্ববঙ্গের ভাগ্যে সামান্য অংশও জোটেনি। পাকিস্তান

গঠনের পরে এই রাষ্ট্রের সমস্ত সামরিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে। মিলিটারী কলেজ, প্রি-ক্যাডেট স্কুল এবং অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরীর সবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে ও করাচীতে। এরূপ কাজে অথবা এরূপ সংগঠন তৈরীর ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ কোন অংশই পায়নি। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ ৭০ কোটি টাকা পূববঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে কিন্তু তার প্রায় সবই ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এরূপ এবং অন্যান্য শোচনীয় দারিদ্রের সম্মুখীন। পূব ও পশ্চিম পৃথক পাক ভূখণ্ড হওয়ায় এবং একটি অর্থনৈতিক সংগঠন বা অঞ্চল না হওয়ায় পূর্ববঙ্গের পুজি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়ে এই পূর্ব ভূখণ্ডের অর্থনীতিকে আজ এক চরম দুর্বিপাকের দিকে ঠেলে দিয়েছে।"

"পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও আমদানির ক্ষেত্রে এমন পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে যে তার ফলে পূর্ববঙ্গের জনজীবন গুরুতরভাবে বিপন্ন হচ্ছে। পূব বাংলা বহুবার এই অভিযোগ করেছে যে, ব্যবসা বাণিজ্যের লাইসেন্স এবং বৈদেশিক আমদানীর সুযোগ পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের এমন পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে যে, তার ফলে আমদানীর প্রায় অধিকাংশই যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। এরূপ পক্ষপাতিত্বের জন্য পূর্ববঙ্গের বাজারে জিনিসপত্র শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অগ্নিমূল্যও বটে। বর্তমানে পূর্ববঙ্গকে সমস্ত বৈদেশিক জিনিসপত্র আমদানী করতে হয় করাচী থেকে এবং তার ফলে প্রত্যেক জিনিসের জন্য পূর্ববঙ্গকে ৫০ শতাংশ বেশি দাম দিতে হয়। এইভাবেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের পুঁজি নিয়মিত-ভাবে শোষণ করে নিচ্ছে।"

এইভাবে পাকিস্তানী রঙ্গ-মঞ্চে ঘটতে লাগলো একের পর এক নাটক। পশ্চিম পাকিস্তানের উজিরে আজমের সেই অপূর্ব নাটক চোখ খুলে দেখবার মত-ই বটে। সেই ঘনীভূত ক্লাইমেক্সের উপাদান নিয়ে বিরাট এক মহাভারত রচনা করা চলে স্বচ্ছন্দে। এই যুগটা নাকি

মহাভারত লেখবার উপযুক্ত পটভূমিকা নয়। কিন্তু ও-যুগের মহা-প্রতিভাবান কোন কৃত্তিবাস যদি জন্মান, তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কুশী-লবকে নিয়ে যে মহাভারত লিখবেন, তা যুগ যুগ জিয়োবে।

ক্ষমতার স্বাদ মানুষকে করে দুর্নীতিগ্রস্ত। আরাম চিরকাল-ই হারাম। আর এ-কথা কে না জানে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

লোভের পিচ্ছিল পথে একবার দীক্ষা নিলে, তার থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। যে মহান আদর্শের পতাকা তলে নিয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট ঐক্যের শপথ, জনগণকে দিয়ে ছিলেন কল্যাণ ভিত্তিক স্বরাজ ব্যবস্থায় নিয়ে আসবার প্রতিশ্রুতি, সব-ই শূন্য দিগন্তে মিলিয়ে গেল। শুধু কয়েকজন বোকারা দুর্নীতি, লোভ আর আরামের কাছে কুর্নিশ করলেন না। মাথা তাঁরা রাখলেন ইস্পাতের মত সবল, নীতিতে রইলেন অবিচল, আদর্শে রইলেন অটল। এঁরা হলেন আজকের যুগের নায়ক সেখ মুজিবর রহমান, সংগ্রামী নেতা মৌলনা ভাসানী ও আরো কিছু বিশ্বস্ত সহকর্মী।

কিন্তু এঁরাই তো সব নয়। ক্ষমতার মোহে মানুষ ছুটে যায় পশুর মত, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হয়ে। যুক্তফ্রন্টের মিলিত বাসরে এসে লাগলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সুরু হল কলহ, আরম্ভ হল অন্তর্দ্বন্দ্ব। পাকিস্তানের সর্বেসর্বা তখন গোলাম মহম্মদ। তিনি সকলের নেপথ্যে থেকে দাবার বোড়ে সাজাতে লাগলেন। মহম্মদ আলি, স্বীকার করতেই হবে, ক্ষমতাবান কূটনীতিবিদ ছিলেন, বিভেদ ঘটাতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। গণতন্ত্র তাঁর কাছে ছিল একটি বাজে কাগজ মাত্র। জনগণের কাছে তিনি কখনো আসেন নি, তাদের বুকের যন্ত্রনা কি, তা কোন দিন বুঝতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর না ছিল কোন ত্যাগ, না ছিল কোন আদর্শ, না ছিল কোন গণ-সংগ্রামের ঐতিহ্য। আগেকার তিন পাক প্রধান কায়েদে আজম, লীয়াকৎ আলি ও নাজিমুদ্দিন গণ-মানসের সংগে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মহম্মদের কাছে সবই ছিল ঝুটা মাল।

তাই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, কেমন করে গণ-আন্দোলনের নেতাদের রাজনৈতিক বাণপ্রস্থে পাঠানো যায়, কেমন করে তাঁদের ঐক্যের বন্ধনে ধরানো যায় বিভেদের ফাটল। এই কাজটি নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করতে পারলে প্রতিষ্ঠা করা যাবে পাকিস্তানের একচ্ছত্র আধিপত্য।

প্রথমে-ই তাঁর অস্ত্র নেমে এলো, পাক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কি সেই ষড়যন্ত্র? তার কোন কারণ দর্শাবার দরকার নেই। কর্ত্তাই যেখানে মুখ্য সেখানে তাঁর ইচ্ছে-ই কর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু আসল কারণ কি? আসল কারণ হল, নাজিমুদ্দিন গর্ভনর জেনারেলের অধিকারগত সীমার প্রশ্ন তুলে ছিলেন। মহম্মদের আসল উদ্দেশ্যের আঁচ পেয়ে পাঞ্জাবী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন অপাঞ্জাবী আপামর জনসাধারণকে। এই ছিল তাঁর কসুর।

তাই হল তাঁর কাল। তিনি গেলেন, এলেন বগুড়ার মহম্মদ আলি। মহম্মদ আলি অতি ভদ্দরলোক। মহম্মদ যা বলেন, আলি তাই করেন, যা বলেন, তাই শোনেন। ডাইনে ঘুরতে বললে, ডাইনে, বায়ে ঘুরতে বললে বায়ে। এমন অনুগত বাধ্য সুবোধ ছাত্র কোথায় তিনি পাবেন? তাঁকে বললেন, 'যাও আমেরিকায় গিয়ে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির খসড়া রচনা করে এসো।' অমনি তড়াক্ করে লাফিয়ে তিনি উঠলেন প্লেনে, সোজা গিয়ে নামলেন হোয়াইট হাউসে। সংগে রক্ষী হয়ে গেলেন তৎকালীন সেক্রেটারী ইস্কান্দার মির্জা ও ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁন। এঁদের কানে ফুসফাঁস করলেন মহম্মদ, 'দেখো আলি যদি বেচালী করে খবর দিও আমাকে।'

এই বগুড়ার মহম্মদ আলিকে-ও করা হল কুপোকাৎ। তাঁকে ব্যাটিং করে পাঠিয়ে দেওয়া হল ওয়াশিংটনে। যারা বাইরে শান্ত,

ভিতরে তারা-ই অশান্ত, যারা বলে বিপ্লব চাই না, তারাই চায় বিপ্লব, যারা বাইরে নির্বাক, ভিতরে তারা-ই সবাক। মহম্মদ আলির ভবিষ্যৎ একটু খারাপ যাচ্ছিল, তাই তিনি আরোগ্যের জন্য গেলেন বাইরে। সেই ফাঁকের সুযোগ নিয়ে আলি নাকি তাঁকে ডিগ্‌বাজী খাওয়ার চক্রান্ত করেছিলেন, ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তিনি নাকি হতে যাচ্ছিলেন উজিরে আলম। ভবিষ্যৎ থাকুক খারাপ, বিশ্রাম উঠুক মাথায়, তড়িঘড়ি করে ফিরলেন তিনি করাচীতে। ভাগ্যিস তাঁর পাঞ্জাবী ভায়েরা ছিল। না হলে কে সংস্কারীর একশেষ হত আর কি! এঁরা-ই তো ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে হাওয়ার চেয়ে দ্রুত বেগে ছুটে গিয়ে তাঁকে খবরটা দিয়েছিল। তা না হলে তাঁর অত সাধের গদীটাই যেত উল্টে! এসেই তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন, বাতিল করলেন মন্ত্রীসভা। গঠন করলেন নতুন মন্ত্রীসভা। এই মন্ত্রীসভায় ফিল্ড মার্শাল হলেন ডিফেন্স মিনিষ্টার আর ইস্কান্দার মির্জা খাঁ হলেন হোম মিনিষ্টার, চৌধুরী মহম্মদ আলি পেলেন প্রথমন্ত্রীর পদ।

ভাঙা হাটের আসরে আর কে কে ডুগডুগি বাজাতে এলেন?

ধুরন্ধর মহম্মদের এবার চোখ পড়লো যুক্তফ্রন্টের দিকে। এঁদের দিকে হাত বাড়ালেন দূরদর্শী কূটনৈতিক। সুরাবর্দী তখন সুইজারল্যাণ্ডে, অনেক তফাতে। জীবনে অনেক কূটনীতি করেছেন, হার্টটাকে এবার জোড়া না লাগালেই নয়। তাঁর কাছে জরুরী তলব গেল, "দোস্ত, এক্ষুনি ঘরে ফিরে আসুন, আপনার জন্য পাতা হয়েছে রাজকীয় আসন।"

হার্টটাকে কোন রকমে জোড়া লাগিয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরলেন তিনি দেশের মাটিতে, কারণ, সেখানেই তাঁর আঁচল পাতা। জন্মভূমিকে চিরকাল-ই তিনি জেনেছেন স্বর্গাদপী গরীয়সী রূপে। সেই প্রাণের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন কি করে! বিমান থেকে নামা মাত্র-ই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল আইনের এক্তিয়ারে, হলেন তিনি আইন মন্ত্রী।

এই সুরাবর্দ্দি-ই হয়ে উঠলেন মহম্মদের বশংবদ, তাঁর রবার স্ট্যাম্প। এই ভদ্রলোক-ই যুক্তফ্রণ্ট আমলে ছিলেন পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির ঘোর বিরোধী। তখন এই ব্যাপারের বিরুদ্ধাচরণ করে করেছিলেন অনেক চেল্লা-চিল্লি আর লাফালাফি। সবচেয়ে তাজ্জব বাৎ, স্বায়ত্বশাসনের যে দাবী ছিল পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবন মরণের সমস্যা সেই দাবীকে-ও নস্যাৎ করলেন তিনি। এক ইউনিট অর্থাৎ সমস্ত প্রদেশ হয়ে থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানের তাঁবেদার, সব ব্যাপারেই নাক গলাবেন পশ্চিম পাকিস্তানের উজিরে আজমেরা, সেই প্রস্তাবে-ও তিনি ঘাড় কাত কবলেন। অন্যান্য বিরোধী দলেরা হৈ-চৈ করছে, তাতে কি হয়েছে। বোকাবা চিরকাল-ই গণ্ডগোল বাধিয়ে যাবে, ওটা তাদের মজ্জাগত স্বভাব। শুধু তাই নয়, মহম্মদের ঔরস-জাত ইসলামিক রিপাব্লিক অব পাকিস্তানের তিনি-ই হলেন রূপকার।

কূটনীতির আসর এখানেই থামলো না। যে সুপরিকল্পিত চক্রান্তের খাঁচায় কয়েদ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন মহম্মদ গোটা পাকিস্তানকে, তার আরো আছে অধ্যায়। এককালের অবিভক্ত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব পাকিস্তানের জেলে দীর্ঘ ছ' বছর ধরে পচ্ছিলেন, তাঁকে করা হল মুক্ত, দেওয়া হল পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদ। মুসলীম লীগের মধ্যাহ্ন সূর্য অস্ত গেল। কারণ লীগকে ভেঙে খাঁন সাহেবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গঠিত হল রিপাব্লিকান পার্টি। যে পাখতুনেরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে জিন্দেগীকে করে ছিল উৎসর্গ সেই আজাদীর পর থেকে, সেই আন্দোলনের গায়ে-ও ধরানো হল ঘুণ। এক ইউনিটের দাওয়াই দিয়ে সীমান্ত প্রদেশ, কালাত, ভাওয়ালপুর, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ইত্যাদি প্রদেশের গণ-অস্তিত্ব খতম করা হল।

প্রথম গণ-পরিষদকেও খতম করা হল, গঠন করা হল দ্বিতীয় গণ-পরিষদ। কারণ? না, এঁরা পাক গঠনতন্ত্র রচনা করবেন। কারা শরিক হবেন এই নয়া পাক গঠনতন্ত্রের রচনায়? কেন,

কাজীর বিচার কি কখনো কারুর উপর অবিচার করেছে ? উভয় পাকিস্তান থেকে নেওয়া হবে চল্লিশ জন করে প্রতিনিধি, এই সব ভদ্রলোকেরা-ই হবেন পাক গঠনতন্ত্রের ভাষ্যকার, প্রণেতা।

এখানে-ই ইতি নয়। বিল্ব-পত্র শোঁকান হল প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলিকে। তাঁর জায়গা কায়েম করলেন জবরদস্ত্ পাঞ্জাবী চৌধুরী মহম্মদ আলি, সবাইকে যিনি কথায় কথায় বলেন, দেখে নেবো একহাত। মহম্মদের আশীর্বাদে এখানে কিন্তু তিনি হয়ে গেলেন কেন্নো। সব দাঁত তাঁর ভেঙে গেল।

বগুড়ার মহম্মদ আলিকে দিয়ে পাক-মার্কিন চুক্তির দোস্তি, সুরাবর্দ্দি সাহেবকে দিয়ে ইসলামিক রিপাব্লিক অব পাকিস্তানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, খান ভাই-এর বিচ্ছেদ, এক ইয়ুনিটি শাসন ব্যবস্থা এবং পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠি ও আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের জয়-জয়কার, এই হল মহম্মদের চমকপ্রদ কূটনৈতিক সাফল্যের এক নজরের বর্ষফল। সাফল্য নেহাৎ কম নয়!

কেন্দ্রে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়ে ছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল মিনিষ্ট্রি অব ট্যালেন্ট, অর্থাৎ গুণধরী মন্ত্রিসভা। কিন্তু এই গুণনিধিদের কীর্তি কথা কত আর বলবো! এর যে শেষ নাহি রে। এঁরা চালিত হতেন না স্ব-ইচ্ছায়, এঁদের চালাতেন একটি গুপ্ত মন্ত্রিসভা। এই গুপ্ত মন্ত্রিসভা-ই ছিলেন এঁদের চালিকা শক্তি। এঁরা কোন ব্যাপারে সিগন্যাল না দিলে জ্বলতো না সবুজ আলো। এই এঁরা হলেন মেজদা আয়ুব খাঁ, সেজদা ইস্কান্দার মির্জা, ছোড়দা নদা ইত্যাদি হলেন পাঞ্জাবী মন্ত্রিগণ। এঁদের বড়দা হলেন গোলাম মহম্মদ, ইনি-ই হলেন নাটের গুরু।

কি অপূর্ব-ই না নাটক! সামনে রাখা হল গণতন্ত্রের তক্‌মা, তার উত্তর দক্ষিণে রইলো ইসলামিক রাষ্ট্র আর এক ইয়ুনিটি শাসনব্যবস্থা, পূর্বে পশ্চিমে রইলো সামরিক সাঁজোয়া ও পাঞ্জাবী আমলাতন্ত্র। কূটনীতিতে মহম্মদ সত্যিই হার মানালেন কুট-সম্রাট

চাণক্যকে-ও। এক ঢিলে অনেক পাখী মারবার এমন সুন্দর, নিখুঁত পরিপাটি ব্যবস্থা কোথায় আর দেখা যাবে? মহম্মদ আলি তোমাকে সত্যিই সেলাম, লাল সেলাম!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কীর্তির চেয়ে মহম্মদ আরো মহান। পাক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলিকে পাঠান হল ঢাকায়। তিনি অনেক ভালো ভালো বোল-চাল দিলেন। পূর্ববঙ্গের দুর্দ্দশায় বুক তাঁর ফেটে যাচ্ছে, এই বলে বুক চাপড়ালেন কয়েকবার, চোখ মুছলেন অসংখ্যবার। পূর্ববঙ্গে আবার যাতে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করা যায়, সেজন্য করা হোক তার একটা ব্যবস্থা।

কিন্তু ফজলুল হক গম্ভীরভাবে বললেন, 'বাৎ তো আপনার বহুৎ ভালো আছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার-ই তো আমাকে বিশ্বাসঘাতক উপাধি দিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে মন্ত্রীত্ব চালাবেন কি করে? আবার যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, আবার যদি বিচ্ছিন্নতার ষড়যন্ত্র করি হিন্দুস্তানের সংগে, তখন কি হবে?'

চৌধুরী সাহেব বললেন, "তোবা তোবা। কোন বুরবাক আপনাকে বলে বিশ্বাসঘাতক হক সাহেব? আমি সেই বদমাসের গর্দান লিয়ে লোব! আপনারা আমাদের দোস্ত আছেন। কোর-আন্ নিয়ে শপথ নিতে বলেন, বেশ তাই হবে।"

না সেখানেও বাদ সাধলেন গভর্নর সাহাবুদ্দিন ও এম. এল. খাঁন। তাঁদের যুক্তি হল, অত ভালো আ'দমীকে পূর্ববঙ্গে রেখে কাজ নেই, আবার যদি বিগড়ে যান। সৎ লোকের ফ্যাকড়া অনেক, ফ্যাসাদ-ও নেহাৎ কম নয়।

কাজেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের বন্দী শিবিরে। তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী উনিশ শো পঞ্চান্ন সালের জুন মাসে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিলেন। রাজ্যে সরকার গঠনের তদারকী করলেন তাঁর-ই সহকর্মী আবু হোসেন সরকার। ঐ পঞ্চান্ন সালের তেশরা জুন গর্ভনরী শাসন তুলে নেওয়া হল। পূর্ববঙ্গে মন্ত্রিসভা গড়া

হল, কৃষক শ্রমিকদল ও নিজামে ইসলাম দলের সহযোগিতায়। আর কেন্দ্রে এক বৃন্তে অনেকগুলো পোকা-কামড়ানো জৌলুসহীন ফুল ফুটলো মুসলীম লীগ ও কে. এস. পি-র যৌথ উদ্যোগে। এইভাবে পূর্ববঙ্গের সাজানো বাগান শুকাতে লাগলো।

কেন্দ্রে একমাত্র কিছু কাজের কাজ করেছিলেন ফজলুল হক। তিনি হয়েছিলেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় রচিত হল শাসনতন্ত্র। ছাপান্ন সালের তেইশে মার্চ থেকে সেই শাসনতন্ত্র পেল তার বাঞ্ছিত অধিকার, শাসনতন্ত্র পেল তার স্বীকৃতি। সেই শাসনতন্ত্রের জোরে অনেক রক্ত-রাঙা অধ্যায়ের ইতিহাস সৃষ্টি করা বাংলা ভাষা পেল রাষ্ট্রভাষার মহিমা। অবশ্য দুর্ভাগ্য, সেই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হওয়ার আগেই তাঁকে করে দেওয়া হল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর।

উনিশ শো পয়ষট্টির তেইশে মার্চ। জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা অভিষিক্ত হলেন রাষ্ট্রপতির পদে। পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠা করা হল ঐসলামিক রিপাব্লিক রূপে।

ইতিমধ্যে পূর্ববাংলার বুকে বয়ে গেছে অনেক ঝড়, অনেক ঝাপ্টা। তার রক্তের মধ্যে যে সংগ্রামী চেতনা ছিল, ভাষা আন্দোলনের মধ্যে জন্ম লাভ করেছিল যে নূতন জাতি, কি চিন্তায়, কি অনুভূতিতে, তার রঙ হল ফ্যাকাসে। অন্তর্দ্বন্দ, বিরোধ, মারামারি, চরিত্র-হনন, ক্ষমতা-লোলুপতা ইত্যাদিতে শতধা বিভক্ত হল রাজনৈতিক চেতনা। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসকেরা যে চেষ্টা অবিরামভাবে চালিয়ে এসেছেন, ষড়যন্ত্রের যে বীজ বপন করেছিলেন, তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে গ্রাস করলো পূববঙ্গকে। নীতির জায়গা দখল করলো দুর্নীতি, ভেদের জায়গায় বিভেদ, ঐক্যের বদলে অনৈক্য, আদর্শের স্থলে লোভ, ত্যাগের বদলে ক্ষমতা দখল, এই হল পূর্ববঙ্গের তৎকালীন রাজনীতির সর্বহারা চেহারা।

যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে গিয়েছিল অনেক আগে। এবার ভাঙন ধরলো প্রত্যেকটি দলে। কৃষক-শ্রমিক দল ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে শুরু হল সংঘাত। আওয়ামী লীগের মধ্যেই ফাটল ধরলো। সেই ফাটল সারানোর উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহের কাগমারীতে মৌলানা ভাসানীর জন্মস্থানে সাতান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সম্মেলন ডাকা হল। সেই আলোচনা থেকে বেরিয়ে এলো দুটি দল। একটি মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। আরেকটি আওয়ামী লীগ, যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন অল্প বয়স্ক তরুণ ও আদর্শবান কর্মীরা। শেখ মুজিবর মৌলানা ভাসানীকে অনেক করে ফেরাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হল। পূর্ববঙ্গের জল তখন অনেক ঘোলা হয়েছে। লোভ, লালসা, মোহ ও দলাদলির যে সংকীর্ণ রাজনীতির ব্যাধি তাদের সবাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল, তা থেকে তাঁরা মুক্তি পেলেন না। একটির পর একটি দল ব্যাঙের ছাতার মত গজাতে লাগলো পূর্ববঙ্গের গায়ে। স্বায়ত্বশাসনের দাবী গেল দূরে সরে। জনগণ রইলেন না কাছে, যে যার নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রত্যেক দিন একটা মন্ত্রীসভা গড়ার হিড়িক পড়ে গেল। তার একটু রোজনামচা দিই।

১। একত্রিশে মার্চ। পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান ও তাঁর মন্ত্রীসভাকে বরবাদ করলেন। তাঁর জায়গায় এলেন, ফজলুল হক যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, তখনকার পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কৃষক-প্রজা দলের নেতা আবু হোসেন সরকার।

২। পয়লা এপ্রিল অর্থাৎ তার পর দিন। ভোরের আলো ফোটবার আগেই তাঁকে ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে করা হল বহিষ্কার। মাত্র একদিনের জন্য তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের উজীর।

৩। পয়লা এপ্রিল। সেদিনই আতাউর রহমান অস্থায়ী গভর্ণর হামিদ আলীর কাছে নিলেন মন্ত্রগুপ্তির পাঠ।

৪। আঠারোই জুন। বিধান-সভায় আতাউর সরকার আনলেন একটি প্রস্তাব। কিন্তু তা আস্থাসূচক ভোট সংগ্রহে ব্যর্থ হল। অতএব, তারপর দিন অর্থাৎ উনিশে জুন রহমান মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ঘটলো।

৫। উনিশে জুন। আবার কৃষক-প্রজা দলের নেতা আবু সরকারের পড়লো ডাক। পূর্ববঙ্গের স্থায়ী গভর্ণর সুলতান উদ্দীন আহমেদ তাঁকে করালেন মন্ত্রগুপ্তির শপথ।

৬। বাইশে জুন। শেখ মুজিবর রহমান আনলেন আবু সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব। আবু সরকার ১৫৬-১৪২ ভোটে হেরে গেলেন।

৭। তেইশে জুন। আবু সরকার মন্ত্রিত্বের গদী ছাড়তে বাধ্য হলেন।

৮। পঁচিশে জুন। পাক রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে বিধান সভা বাতিল বলে আদেশ জারী করলেন।

আটান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসে যা ঘটলো, তাতে বিশ্বের সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো পূর্ববঙ্গের দিকে। বিশে সেপ্টেম্বর, ঢাকার বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করা হল। স্পীকার এলেন, দখল করলেন তাঁর চেয়ার। কিন্তু আচম্বিতে আরম্ভ হল হৈ চৈ। স্পীকারের বিরুদ্ধে আনা হল অনাস্থা। স্পীকার হাকিম আলী কয়েকজন সদস্যকে সভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মারমুখী হয়ে তাঁরা ছুটে এলেন তাঁর দিকে। ছোঁড়া হল চেয়ার, ছোঁড়া হল দোয়াত, ছোঁড়া হল টেবিল, স্পীকারের দণ্ড তুলে নেওয়া হল, লণ্ডভণ্ড করা হলো সভা-কক্ষ। অবস্থা আয়ত্তে আনতে গিয়ে মুজিবর রহমান আহত হলেন।

অবস্থা দেখে পালালেন স্পীকার। এবার এগিয়ে এলেন ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী। কিন্তু অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। 'ডেপুটিকে বদ্ধ উন্মাদ' বলে একটা প্রস্তাব

আনলেন জনৈক সদস্য, সাড়ম্বরে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। সভা মুলতুবী রইলো বলে বেরিয়ে গেলেন ডেপুটি স্পীকার।

তেইশে সেপ্টেম্বর বসলো আবার অধিবেশন। আবার সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি! ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলি চেয়ারে উপবেশন করলেন। উঠলো সোরগোল, দেখা গেল ঝড়। হঠাৎ শাহেদ আলীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল একটি ভারী পেপার ওয়েট। সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটলো দু' দিন পরে।

এই হল পূর্ববঙ্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের দলীয় চেহারা। এর পর কি করে দেশে গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করা চলে? পূর্ববঙ্গের অদূরদর্শী নেতারা এইভাবে নিজের হাতেই নিজের কবর রচনা করতে লাগলেন, যাতে মিলিটারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার আরো সুবিধা হল। কিন্তু সেখানকার নেতারা এই সরল সত্যটি বুঝতে পারলেন না। অথবা বলা চলে ক্ষমতার মোহ, দলাদলির আনুগত্য, ক্ষমতা লোলুপতা তাদের দৃষ্টিকে করেছিল অন্ধ, মনকে করেছিল সংকীর্ণ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বালয়েও বা এমন কি সুবিচার চলেছিল। এক উজির যান তো আরেক উজির আসেন যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার পাল্টাতে লাগলেন। একবার আসেন ফিরোজ খাঁ নুন, আরেকবার আসেন সুরাবর্দ্দি, সুরাবর্দ্দির জায়গা দখল করে বসেন চুন্দ্রীগড়, তার জায়গায় আসেন চৌধুরী মহম্মদ আলি। মাত্র দেড় বছরে মন্ত্রিত্বের হাত বদল হল সাতবার। একে ছেলে-খেলা বললেও ঠিক হবে না। কারণ, ছেলেরা সাবালকত্বের দরজায় পৌছায় না, কাজেই তাদের ছোট-খাট ত্রুটিকে মার্জনা করা চলে। কিন্তু বুড়ো ধাড়ী, যাঁরা জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করতে কার্পণ্য করেন না, সেই বেসরমদের কোন্ যুক্তিতে মাফ করা হবে?

সাত-ই সেপ্টেম্বর। ইস্কান্দার মির্জা খানা-পিনার আসর বসিয়েছেন রাষ্ট্রপতি নিবাসে। কেন্দ্রে তখন ফিরোজ খাঁ নুনের কোয়ালিশন সরকার। সমস্ত দলের নেতাদের তিনি করেছেন

নিমন্ত্রণ, তাঁর ওখানেই নাস্তা করতে হবে। পান ভোজন-পর্ব সেরে সকলে মকানে ফিরে সুখের ঘুম দিলেন সেরাত।

কিন্তু তার পরের দিন সকলের চক্ষুস্থির। হালার পো হালা করেছে কি! এই কারণেই খানা-পিনা, এই কারণেই এত রঙীন মাল বিতরণ? রঙীন নেশায় বুঁদ হয়ে অনেক নেতাই তখন স্বপ্ন বিভোর, ...এর পরবর্তী পদক্ষেপ, উজিরে আলম হওয়া। উঃ, তখন কত সুখ, কত তার খুশবাই! তার মধ্যে হালার পো হালার এজা কি কাজ কইছে! ধম্ম বলে একটা কথা আছে, আপনারাই কন্ দেখি ধম্মে কি তা সইবে!

ভোর হবার আগেই অন্তরীণ করা হলো ফিরোজ খাঁ নুনকে ও তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের। তার আগের দিনই গঠিত হয়েছিল এই মন্ত্রিসভা। উভয় পাকিস্তানের মুসলীম বাদে বামপন্থী দলের ছোট-বড-মাঝারি সব নেতাদের নিয়ে আসা হল কয়েদখানায়। ভোরের আলো ফোটবার আগেই গ্রেফ্তারীর কাজ শেষ হল। শেখ মুজিবর রহমান করাচী থেকে তেজগাঁও আসছিলেন প্লেনে। তেজগাঁও-এর বিমানঘাটিতে এই খবর শুনে তিনি আত্মগোপন করলেন তাঁর স্বগ্রাম ফরিদপুর জেলার গেপোলগঞ্জে। পরে অবশ্য তিনি ধরা পড়ে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

জনগণ ঘুম ভেঙ্গে দেখে, এলাহি ব্যাপার। সারা রাস্তা জুড়ে শুধু ফৌজ, ফৌজ, শুধু জঙ্গী পাঞ্জাবী বাহিনী। কারুর ট্যাঁ-ফুঁ করবার এক্তিয়ার নেই। সারা পাকিস্তান জুড়ে মার্শাল ল'-এর কড়া বেষ্টনী। কারুর অধিকারে রইলো না সংবাদ পত্রে আসল তথ্য প্রকাশ করবার। কারণ, সেন্সারের ধারালো ছুরি নিয়ে বসে রয়েছেন পাঞ্জাবীর খয়ের খাঁরা। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে করা হল খর্ব। পাক গঠনতন্ত্রকে ইস্কান্দারের গুলিতে করা হলো বুলেট বিদ্ধ। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক জাতীয় পরিষদ, তার দরজায়ও ঝুলতে লাগলো বিরাট তালা, ইস্কান্দার পকেটে রাখলেন তার চাবি।

চীফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর আয়ুব খাঁকে করা হলো ফৌজ শাসক। পশ্চিম ভূখণ্ডের সামরিক প্রশাসক হলেন জেনারেল আয়ুব খান এবং পূর্বখণ্ডের জেনারেল উমরাও খান।

এই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা একটু মুখ হাঁ করেছিলেন, তাঁদের দেওয়া হল কঠিন শাস্তি। একমাত্র বালুচ সৈন্যদের দ্বারা পাইকারীহারে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ, কামান দাগা ও রাইফেলের গুলিতে যাঁরা হত ও আহত হলেন, তাঁদের সংখ্যা কম করেও প্রায় কুড়ি হাজার। মির্জার ভাষ্যে, এটাই নাকি রক্তপাতহীন বিপ্লব।

আটান্ন সালের চৌদ্দই অক্টোবর, ইস্কান্দার মির্জা একটি মন্ত্রিসভা গঠন কররার কথা ঘোষণা করলেন। চোদ্দ জনের এই মন্ত্রিসভায় যিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন, তিনি আয়ুব খাঁ। সাতাশে অক্টোবর এঁরা নিলেন রাষ্ট্র-প্রধান ইস্কান্দারের কাছ শপথ। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান মন্ত্রী আয়ুব ও রাষ্ট্রপ্রধান ইস্কান্দারের ছবি তোলা হল। কোনটায় তাঁরা হাসছেন, কোনটায় দহরম মহরম করছেন, কোনটায় হাসি ঠাট্টা মস্করা করছেন। নেহাৎ দুজনের কম দিনের দোস্তী তো নয়।

তারপর দুঘণ্টা কাটিতে না কাটতে বিনা মেঘে ইস্কান্দারের মাথায় হল বজ্রপাত। তাঁর প্রাণের দোস্ত এ-কী করেছে! অধঃ, উর্দ্ধ, উত্তর, দক্ষিণ, পূবব, পশ্চিম, যেখানে ফেরেন, দেখেন রাইফেল উচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আয়ুবী ফৌজ। কোন কথা নয় বাছাধন, সরে পড়ো দেখি ভালোয় ভালোয়, না হলে তোমার খোপড়ি যাবে।

বুদ্ধিমান ইস্কান্দার সরে পড়াটাই সঙ্গত মনে করলেন। আয়ুব খানের ফরমানে টিপ সই দিয়ে গেলেন তিনি কোয়েটায়। যাতে তিনি কোন কথা বলতে না পারেন, সেজন্য পাক বাহিনী রইলো তাঁর পাশে। তারপর তিনি প্রাণ বাঁচাবার অছিলায় পালালেন লণ্ডনে।

মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা, প্রবেশ

করলেন ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান। তাঁর রাজ্যের রাজত্বকালেও হল কত উত্থান, কত পতন, নাটকীয় সাসপেন্সে তাঁর রাজত্বকালও বেশ গরগরে, আরো বেশী জমজমাট।

যে জাতি আত্মক্লীবতার দৈন্যে ভুগছিল, ঘুম তাদের ভেঙে গেল। আয়ুবের শেকল তাদের জীবনে হল আশীর্বাদ। বেয়নেটের যে চাবুক দেখিয়ে ইস্কান্দার মির্জাকে কুর্নিশ করাতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই বেয়নেটের চাবুক একদিন তার গর্দানকেও করালো নীচু। সেই দুর্দান্ত দুঃসাহসী অকুতোভয় মানব কারা? তারা আর কেউ নয়, সেই চিরকালের নবজীবনের ইতিহাস সৃষ্টিকারী দামাল ছাত্রেরা।

এই সেই ঢাকা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে নির্মিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের শহীদ-তীর্থ, উদ্বোধিত হয়েছিল নতুন যুগের সূর্য, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ফৌজী আয়ুব এখানে দেবেন সমাবর্তন ভাষণ। কিন্তু তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন, কোথায় তিনি আসছেন, কাদের তিনি দীক্ষা দেবেন। আগুনের মন্ত্রে তারা যে আগে থেকেই দীক্ষা নিয়েছে!

আয়ুবের কল্যাণে অনেক কিছু হয়েছে দেশে, কোনটাই ঝুটা বাৎ নয়। তাঁর মেহেরবাণীতে হয়েছে চোখ-ঝলসানো অট্টালিকা, হয়েছে নিজেকে সুরক্ষিত দুর্গে নিরাপত্তার রাখবার জন্য করাচী থেকে রাজধানীকে ইসলামবাদে প্রতিষ্ঠা করা। তার জন্য খরচ করতে হয়েছে কোটি কোটি টাকা। অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত ঘুষখোর মহাজনদের প্রকাশ্যে তিনি চাবকেছেন। রাস্তায় একটু নোংরা ফেলার জন্য পথিককে বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। আর্থিক বৈষম্য দূর করে তিনি এনেছেন সমতার ভারসাম্য।

কিন্তু জনতার জন্য কি করেছেন তিনি? কিছুই নয়। জনতা দুঃখ-দারিদ্রের, অশিক্ষা, ব্যাধি ইত্যাদির যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইলো। যদিও তিনি বাষট্টি সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেন,

তথাপি দলের নেতাদের নির্বাচনের অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। সংবাদপত্রের উপর সেন্সারের কড়াকড়ি তখন পুরোপুরি বহাল রয়েছে। নেতাদের অনেকেই তখনও কারা-প্রাচীরের মধ্যে বন্দীর জীবন যাপন করছেন। অনেকে পলাতক, অনেকে নৃশংস নির্যাতনের ভয়ে মুখকে আলোর মধ্যে আনতে পারছেন না। সর্বত্র ত্রাসের বিভীষিকা, সর্বত্রই থমথমে ভাব।

আয়ুব খাঁনের শাসন, সে এক দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। জেগে উঠে সেই স্বপ্নের স্মরণোদয় হলে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসে। আয়ুবের এমনই বজ্র-শাসন।

সেই লৌহ-মানব আয়ুব মঞ্চে উঠলেন ধীর শান্ত পদক্ষেপে। একবার তাকিয়ে দেখলেন সামনের দিকে। কিন্তু এ-কী ছাত্রদেব মুখ? তীব্র উত্তেজনায়, প্রচণ্ড ক্রোধে, তাদের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, হাত হয়ে রয়েছে মুষ্টিবদ্ধ। ছাত্রেবা প্রচণ্ড জোরে শ্লোগান দিয়ে চলেছে, "আয়ুবশাহী নিপাত যাক, ডিক্টেটারী শাসন চলবে না, প্রাপ্তবয়স্কদের ভিত্তিতে নির্বাচন চাই, ডিগ্রী নয়, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চাই—"

শুনে আয়ূব মূর্ছা যান আর কি! ছাত্রেরা বলে কি, কি দুঃসহ এদের স্পর্ধা। জনতার অধিকারকে এতদিন তিনি গুঁড়িয়ে থেতলে খামোশ করে রেখেছেন, কেউ তাঁর বেয়নেটের সামনে গর্দান তুলতে পারে নি। আর যাদেব মুখ থেকে এখনো দুধের গন্ধ যায় নি, তারা চায় নির্বাচন, বলে গণতন্ত্রের কথা, আওয়াজ তোলে আয়ুবশাহী বরবাদ হোক!

লাল চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই সব বেয়াদপ ছেলে-ছোকরাদের দিকে। কিছুক্ষণ দেখলেন. তারপর চলে গেলেন।

তিনি চলে গেলেন, আগুন কিন্তু নিভলো না। আয়ুবের চোখের ইশারা জঙ্গীশাহীদলকে বুঝিয়ে দিলো, ওদের পরবর্তী করণীয় কাজ কি। পাঞ্জাবী পুলিশেরা সংকেত পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্রদের

উপর। ছাত্রেরাও ভালো মানুষ সেজে ন্যাকামী করলো না! চেয়ার ছুড়ে, টেবিলকে এগিয়ে দিয়ে, কখনো এগিয়ে, কখনো পিছিয়ে, চালাতে লাগলো বিক্ষোভের রণ-দামামা। হাতে অস্ত্র নেই, তাতে কি হযেছে, মনের সাহসই তো তাদের অস্ত্র, হাতের পাঞ্জাই তো ওদেব রাইফেল, বেয়নেট।

কিন্তু বেশিক্ষণ ছাত্রেরা যুঝে উঠতে পারলো না। ফৌজী পুলিশদের আধুনিক অস্ত্র, বেয়নেটের ক্রুদ্ধ আস্ফালন, ছাত্রদেব পিটোতে পিটোতে বার করে দিলো কার্জন হল থেকে।

পুলিশের এই তাণ্ডব-লীলা বাযুর চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটে গিযে জানালো, আগুন জ্বলছে, ছাত্রেরা পুড়ছে, মাব খাচ্ছে। আর দেরী নয়। এই খবর মুহূর্তে পবিণত হল বোষ-বহ্নিতে। ছাত্রেরা পিল পিল করে ছুটে আসতে লাগলো ফজলুল হক হল, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়াবিং কলেজ ইকবাল হল থেকে।

এবাব এসো, তোমাদের সংগে পাঞ্জা কষি। প্রাণ দিতে হয়, তাও দেবো। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ দরকাব। অবিচারের জবাব দরকার। উন্মত্ত পুলিশ রণে ভঙ্গ দিল না। যাকে পেল সামনে, তাকেই নেকড়ে বাঘের মত ক্ষত-বিক্ষত করলো, বসালো তাব গাযে কামড়। অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফ্তার করে নিযে যাওয়া হল লাল বাগানে, পুলিশের সদর দপ্তরে। এর পরেও তাবা শান্ত হল না। চালালো লাঠি, ছুঁড়লো গুলি, অন্ধকারে চতুর্দিক ছেয়ে গেল কাঁদানে গ্যাসেব ধোঁয়াতে।

কিন্তু এ হচ্ছে বিদ্রোহী বাংলার অশান্ত ছাত্র। অনেক তাদের শোষণ করেছো, অনেক করেছো নির্যাতন। অনেক রক্ত নিয়েছো। তবু বিদ্রোহী বাংলার জাগ্রত জনমত কোন কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। যতদিন না অরুণ-রাঙান প্রভাত উঠবে, ততদিন চলবে বিদ্রোহের উৎসব।

কার্জন হলের সামনে, পুলিশের চোখের উপর ক্ষিপ্ত ছাত্রেরা গুঁড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুল কাদের চৌধুরীর গাড়ী। ই, পি, আর বাহিনী তেড়ে এসে ছাত্রদের উপর চালালো বেত্রাঘাত।

কার্জন হল থেকে বেরিয়ে পড়ে তারা ঢাকা শহর পরিক্রমায় বেরুলো। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা জমায়েৎ হলেন এই মিছিলে। প্রবল গর্জন আর প্রচণ্ড শ্লোগানে কাঁপতে লাগলো ঢাকার রাজপথ। মিছিল এগিয়ে যেতে লাগলো ধীর কদমে। ঢাকা হাইকোর্টের সামনে গুলি চললো বেপরোয়া। তবু, ছাত্রেরা ছত্রভঙ্গ হল না। কয়েকটি ছাত্রের তপ্ত রক্তস্রোত জনপথকে করলো রক্ত-রঙীন।

ঢাকা জজ কোর্ট, সেখানেও পুলিশের নিষ্ঠুর বর্বরতায় লেখা হল কালা ইতিহাস, ছাত্রদের রক্তদানের ইতিহাস হল উজ্জ্বল। এখানেও গুলি, এখানে-ও লাঠি। এখানে-ও টিয়ার গ্যাস।

তবু, লক্ষ পরানে শঙ্কা না জাগে···। আয়ুবশাহী চক্রান্তের গুলি ছাত্রদের করলো বলি। কার্জন হল, জর্জ কোর্টের গায়ে লেগে রইলো, গোলাম মোস্তাফা, বাবুল আর ওয়াজিউল্লার তাজা-রক্ত নিশান। এঁরা বীরের মৃত্যুবরণ করে শহীদ হলেন।

ছাত্রেরা ডিক্‌টেটর আয়ুবের কুশপুত্তলিকা দাহ করলো। আয়ুব মুর্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হল আকাশ বাতাস। আয়ুব তাঁর চোখের সামনে নিজের কুশপুত্তলিকা দাহ হতে দেখে করলেন প্রচণ্ড গোঁসা। রক্ত-মাংসের আয়ুবকেই যে দাহ করা হল না, বহুৎ তাঁর ভাগ্য। কুশপুত্তলিকা, সে তো অনেক পরের ব্যাপার।

আয়ুব প্রচণ্ড এক কড়া ধমক দিয়ে ছাত্রদের গুলি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর ডান হাত আজম খাঁনকে। কিন্তু বদ্‌মাশটা-ও বেঁকে বসলো, গুলি করতে আজম হলেন নারাজ। ছাত্রদের তাজা প্রাণ নিতে তিনি অনিচ্ছুক। বাচালের তাই চাকরি কেড়ে নেওয়া হল। তেইশে অক্টোবর তিনি ফিরে গেলেন লাহোরে, বাকীটা জীবন শান্তিতে কাটাবেন বলে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হল এক মাসের জন্য। কিন্তু ছাত্র বিক্ষোভের আগুন চাপা রইলো না, তা ছড়িয়ে গেল কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, কুষ্টিয়া প্রভৃতি দূর-দূরান্ত অঞ্চলে।

এই পুলিশী নৃত্যের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর মাহমুদ হোসেন। ছাত্রদের উপর এই নৃশংস অত্যাচার, সভ্য দুনিয়ার লজ্জার কারণ। কিন্তু প্রতিবাদের ফল হল কি? তাঁকেও ছাড়তে হল চ্যান্সেলারের পদ, বিদায় নিতে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুকুমারমতী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে।

আজো ছাত্রেরা পালন করে সেই রক্ত-স্নাত সতের-ই সেপ্টেম্বর। পুষ্প স্তবক নিয়ে এসে দাঁড়ায় নম্র মস্তকে সেই সমাধি মন্দিরে। অশ্রু মালায় করে অঞ্জলি, স্মরণ দিয়ে করে স্মৃতি তর্পণ। আর বলে, তোমাদের আমরা ভুলি নি, ভুলবো না ···

পাক-রাষ্ট্রপতি আয়ূব খান ঘোষণা করেছিলেন পয়ষট্টি সালের জানুয়ারীতে মৌখিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে তিনি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

পূর্ববঙ্গের জনমত তখন অনেক জাগ্রত হয়েছে। অতীতের কলুষিত ইতিহাস তাদের ক্ষমতা লোলুপতা থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে। লোভ ব্যুমেরাং হয়ে আবার যে লোভীকে ঘায়েল করে, এই সত্যটি অনেক বিলম্বে হলেও বুঝলেন তাঁরা। আয়ূব ডিক্‌টেটরশীপের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করবার জন্য গঠিত হল ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ.। এই এন্. ডি. এফ. দলে এলেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান, হামিজুল হক, মহম্মদ আলি, আজিজুল হক, নুরুল আমীন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের ছাড়পত্র পাওয়া অনেক মন্ত্রী ও প্রাদেশিক মন্ত্রিবর্গ। আওয়ালী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে ঢেলে সাজান হল নতুন ভাবে। এই মোর্চায় এসে যোগ দিলেন নিজামে ইসলাম,

জামানে ইসলাম, কাউন্সিলার মুসলীম লীগ। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এই সংযুক্ত মোর্চায় যোগ না দিলেও সমর্থন করার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু যেখানে ছাত্র নেই, সেখানে আন্দোলন নেই, যেখানে ছাত্র নেই, সেখানে নূতন প্রাণ নেই, যেখানে ছাত্র নেই, সেখানে আশা নেই, উদ্যম নেই, আলো নেই।

ছাত্রেরা এবারও এগিয়ে এলেন এক প্রাণ, এক মন হয়ে। ছাত্র-লীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন এলেন একই আদর্শের পতাকায়, গঠন করলেন সংযুক্ত ছাত্র-পরিষদ। এঁরা রচনা করলেন ইতিহাস-বিখ্যাত বাইশ দফা দাবী। আর সংযুক্ত মোর্চা করলেন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভিত্তিতে নির্বাচন, সভা-সমিতি ও মতামত প্রকাশের অধিকার দাবী অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় একজন নাগরিকের যে বৈধ অধিকার প্রাপ্য, তার-ই দাবী। এ ছাড়া চাই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন।

এদিকে আয়ূব খানের প্রধান নির্বাচনী হাতিয়ার হল, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক জিগির, ইসলাম জাতীয়তা ও মোল্লাতন্ত্রের বাণী তুলে তাদের দুর্বল জায়গায় আঘাত করা। তাই আবার তিনি মুসলীম লীগের উদ্বোধন ঘটালেন খুব আড়ম্বরে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। আয়ূব তাঁর দলের নামকরণ করলেন, কনভেনস্ন মুসলীম লীগ। মুসলিম লীগ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বেরিয়ে এলো আরেক দল, এর নাম হল কাউন্সিলার মুসলীম লীগ।

গণতন্ত্রকে ধর্মান্ধতার উল্টোরথে নিয়ে যাবার অপূর্ব সুযোগ পেয়ে গেলেন আয়ূব। কাফেরেরা পবিত্র হজরৎ-এর কেশ অপহরণ করেছে। এই ধুঁয়া তুলে আয়ূব নাচতে শুরু করলেন। পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক চেতনারমোড় যাতে অন্য দিকে ঘুরে যায় সেজন্য তিনি বাধিয়ে দিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই ষড়যন্ত্রের নায়ক হলেন আয়ূব অনুচর পাকমন্ত্রী সবরুদ্দিন। এই ভদ্রলোকটি নির্বাচন যাতে বানচাল হয়ে যায় তারই

ফন্দী-ফিকিরে ছিলেন। সেদিন তাই দৈনিক ইত্তেফাক লিখলেন—

"খুলনা, খুলনা এবং পুনরায় খুলনা। প্রতিবার একই স্থান হইতে একই খবর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে—ভাড়াটিয়া গুণ্ডার দল গণতন্ত্রকামী ছাত্র-জনতার উপর বর্বর হামলা চালাইয়াছে, বেপরোয়া মারপিট ও খুন-জখমের মাধ্যমে ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। প্রতিবারেই খবর আসিয়াছে দুষ্কৃতিকারীদের প্রকাশ্য দৌরাত্ম্যের সময় পুলিশবাহিনী তাহাদের স্বাভাবিক কর্তব্যে সাড়া না দিয়া নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়াছে। আর প্রতিবারেই দেখা গিয়াছে, স্থানীয় প্রশাসক ভাড়াটিয়া বাহিনীর হাত হইতে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইলেও উর্দ্ধতন মহল এ বিষয়ে কোন প্রকার উদ্বেগ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই। ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের দমন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় 'আইন ও শৃঙ্খলা' যন্ত্র কেন বিকল হইয়া পড়িয়াছে সে সম্পর্কেও কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিবারে খুলনায় একই ধরণের ঘটনা অনুষ্ঠিত হওয়ার তাই এক বৈশিষ্ট্য আছে—যে বৈশিষ্ট্য প্রচলিত শাসনের চরিত্রকেই আজ সবার নিকট বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছে।

মাত্র সাতদিন আগে জনাব সবুর, ইনিই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে ছিলেন, নির্বাচনী সফর উপলক্ষ্যে বাগেরহাট উপস্থিত হইলে সেখানকার ছাত্রদের উপর ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা হামলা চালায়। গত সোমবার ঠিক একই ধরণের ঘটনা আরো বড় আকারে সংঘটিত হইয়াছে খুলনা শহরে। করাচীর ছাত্র দলনের প্রতিবাদে খুলনার ছাত্রগণ মিছিল সহকারে পথে বাহির হইতেই লাঠি, ছোরা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গুণ্ডাবাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে একজন মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যসহ বহুসংখ্যক গুরুতররূপে আহত হয়। আক্রান্ত ছাত্রের দল নিরূপায় হইয়া আদালত প্রাঙ্গণে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিলে দুষ্কৃতকারীরা সেখানেও প্রবেশ করে। প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায়, পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত

হইলেও গুণ্ডাবাহিনী প্রতিরোধের ব্যাপারে তাহারা অগ্রসর হয় নাই।"

আয়ুবের বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন কায়েদ আজমের ভগিনী মাদারে মিল্লাত ফতিমা জিন্না। মিস্ জিন্নার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গোটা পূর্ব বাংলার মানুষ, প্রতিটি দল, ছাত্র সংগঠন অর্থাৎ গণতন্ত্রিকামী প্রতিটি মানুষ। তাদের কণ্ঠে এক শ্লোগান, স্বায়ত্তশাসন চাই, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভিত্তিতে নির্বাচন চাই।

আয়ুবশাহীর ক্রোধ-বহ্নি গিয়ে পড়লো, যত নষ্টের গোঁড়া সেখ মুজিবর রহমানের উপর। এই ভদ্রলোকের অপরাধ, এত করেও কেন সে স্বায়ত্ব-শাসনের দাবী ছাড়ল না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেলে তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করা হল, আগরতলা ষড়যন্ত্রের প্রধান আসামী সাজানো হল, তা সত্ত্বেও, তাঁর স্বায়ত্তশাসনের দাবী ক্ষীণ করা গেল না। মুজিবরের চরিত্র-হনন কেমন করে চলতে লাগলো পূরো দমে তাঁর-ই একটা বিবরণ উল্লেখ করি। 'সংবাদ' বলে একটি পত্রিকা লিখলেন—।

"সংবাদ" পত্রের আর একটি সংবাদ—নির্বাচনের পূর্বে মাসুদ সাদিকের প্রলাপোক্তি : বৃহস্পতিবার ১৬ই পৌষ, ১৩৭১।

লাহোর, ৩০শে ডিসেম্বর (এ-পি-পি)—পশ্চিম-পাকিস্তান কনভেনশন লীগের সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী শেখ মাসুদ সাদিক স্থানীয় নির্ব্বাচকমণ্ডলীদের এক সভায় বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের পরাজয় মানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিজয়। তিনি আরও বলেন, মিস ফতেমা জিন্না নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিলে খান আবদুল গফ্ফর খান ও শেখ মুজিবর রহমানই ক্ষমতায় আসিবেন। সকলেই জানেন গফ্ফর খান নিজেকে পাকিস্তানী বলিয়া স্বীকার করেন না। চিকিৎসার জন্য তিনি পাকিস্তান-বিরোধী কাবুলে গমন করিলে সেখানে তাঁহাকে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। জানা গিয়াছে সেখানে চিকিৎসা শেষ হইলে তিনি নাকি ভারতবর্ষে গমন

করিবেন। আসলে গান্ধীর একজন একনিষ্ঠ অনুগামী হিসাবে তাঁহার আত্মশুদ্ধির জন্য ভারত সফরের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।"

শেখ মাসুদ সাদিক আরও বলেন, "শেখ মুজিবর রহমান মহাত্মা গান্ধীর আর একজন বিশ্বস্ত অনুগামী। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিতে। তিনি উক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যদি মিস্ জিন্না নির্বাচনে জয়লাভ করেন, তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিপুলভাবে হ্রাস করা হইবে। কারণ পাক-ভারত ভাই ভাই হিসাবে ভারতকে ভয় করিবার পাকিস্তানের কিছু নাই।"

কিন্তু নির্বাচন যতই এগুতে লাগলো, আয়ুব খানের বুকে তত-ই ডুগডুগির আওয়াজ বাড়তে লাগলো। কিন্তু এখন আর পেছুবার উপায় নেই। দিল্লী লাড্ডু খাবার যখন সখ হয়েছিল তাঁর তখন কি একবারও ভেবেছিলেন, 'দিল্লী কা লাড্ডু যো খাওয়া ও পস্তায়া, যো নেই খায়া ও ভি পস্তায়া।'

এই নির্বাচন উপলক্ষে 'সংবাদ' পত্রিকা যে মর্মস্পর্শী অবদান রাখলেন ভোটারদের কাছে, তার আবেদন ভোলবার নয়—

"ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর"

"...পূর্ব বাংলার পাঁচ কোটি মানুষের পূর্ব্ব পুরুষদের পূণ্য স্মৃতির নামে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের নামে আবার আহ্বান জানাইতেছি নব-নির্ব্বাচিত চল্লিশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীকে—দোসরা জানুয়ারীর ব্যালটের সংগ্রাম এদেশের জনতার বাঁচিবার দাবীর পতাকাকে, গণতন্ত্রের ভূলুণ্ঠিত ঝাণ্ডাকে উচ্চে তুলিয়া ধরুন, জয়যুক্ত করুন।"

*   *   *

"আমার অধীন এ মোর রসনা এই খাড়া গর্দ্দান।
মনের শিকল ছিঁড়েছে, পড়েছে হাতের শিকলে টান—
এতদিনে ভগবান।"

"আমরা আশা করিতেছি, পূর্ব্ব বাংলার চল্লিশ হাজার

মৌলিক গণতন্ত্রী আয়ুব খানের আশা ও ভরসাকে আলনস্করের স্বপ্ন বলিয়া প্রমাণ করিবেন। ভরসা আমাদের মৌলিক গণতন্ত্রিগণও এই দেশেরই সন্তান। এই দেশেই তাঁহাদের জন্ম। এই দেশেরই মানুষের সহিত সুঃখ-তুঃখে তাঁহাদের বাস করিতে হইবে। এই দেশেরই মাটিতে তাঁহাদের শেষ শয্যা রচিত হইবে। যদি তাঁহারা সকল ভয় ও প্রলোভনকে জয় করিয়া দোসরা জানুয়ারীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, এদেশের জনতার নিকট এ-যুগের মীরজাফর হিসাবে তাঁহারা চিহ্নিত হইয়া যাইবেন এবং জনতার ঘৃণা ছায়ার মত তাঁহাদের অনুসরণ করিবে। আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া যাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, আমাদের পুর্বপুরুষগণও চিরকাল গোলামী করিয়াছেন এই 'ঐতিহাসিক তথ্য' যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই আয়ুব খানকে ভোট দিয়া নিজেদের শিরায় যাহাদের রক্ত বহিতেছে তাঁহাদের পূণ্য স্মৃতির যে অবমাননা করা হয়, এই বোধশক্তি মৌলিক গণতন্ত্রিদের নাই, তাহা আমরা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। মৌলিক গণতান্ত্রিগণ যদি দোসরা জানুয়ারী স্বৈরাচারের সপক্ষে রায় দেন, তবে তাঁহাদের বংশধরগণের ভবিষ্যতের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে এই উলঙ্গ সত্যটি তাঁহারা কি করিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, তাহা আমরা বুঝি না। কোন ভদ্র কোন প্রলোভনের ফলেই নিজ সন্তান-সন্ততির মুখের দিকে সোজা তাকাইতে না পারার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন মৌলিক গণতন্ত্রিগণ কি করিয়া হইবেন, তাহাও আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সর্ব্বোপরি মৌলিক গণতন্ত্রিগণের প্রায় সকলেই নির্ব্বাচনের সময়ে পরিষ্কার ওয়াদা করিয়াছেন মোহতারেমা মিস জিন্নাকে সমর্থন করিবেন। এই ওয়াদা ভঙ্গের পর তাঁহারা নিজের সম্মুখীন হইবেন কি করিয়া?"

"আপনার

মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য-অধিকার

যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দ্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়—
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তি তারে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্যকারাগারে।"

"আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, মৌলিক গণতন্ত্রিগণ দেশের জনতার গণতন্ত্রের সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দোসরা জানুয়ারীর ব্যালটের সংগ্রামে জনতার হইয়া অস্ত্র চালনার গৌরব তাঁহারা অর্জন করিবেন।"

এই তো বিরোধীপক্ষের সত্য, তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক ন্যায্য দাবীর আলোচনা। কিন্তু এই নির্বাচনের বুকে বন্দুকের নল ধরে বসে ছিলেন কেমন করে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ, তার-ও কিছুটা পরিচয় মালুম হওয়া দরকার। আয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের নমুনা কি? এই নির্ভেজাল অপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সারা পাকিস্তানের বারো কোটি জনগণের মধ্যে মাত্র এক আশী হাজার পাবে ভোটাধিকারের সুযোগ। বাকীদের বুনিয়াদী গণতন্ত্রের অ আ ক খ-এর সংগে পরিচয় ঘটে নি। অর্থাৎ এরা অশিক্ষিত, এক কথায় গণতন্ত্রে এরা নাবালক।

জনগণ যখন জোরদার আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের পক্ষে, তখন নাজেহাল আয়ুব একটি কমিশন গঠন করতে বাধ্য হলেন। জনতার রায় নেবেন তিনি, জনতাদের এ-ব্যাপারে কি অভিমত। বিচারপতি আকতার হোসেন হলেন এই কমিশনের চেয়্যারম্যান, গঠিত হল ভোটাধিকার কমিশন।

আয়ুব তখন পূর্ব বাংলা থেকে মুছে গেছেন। সাক্ষ্যদানের প্রাক্ মুহূর্তে প্রাপ্ত ভোটাধিকারের পক্ষে পূর্ববঙ্গের আকাশ হল সরব, বাতাস হল চঞ্চল। কে চায় ডিক্টেটারিজম্-এর দড়িকে গলার মালা

করতে? কারণ, এ দড়ি ত ফাঁসীর দড়ি, এ দড়ি গলায় পরলে গলায় ফাঁস লেগে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে। মহৎ কাজের জন্য প্রাণ দেওয়া, তার মধ্যে গৌরব আছে, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আছে, আছে আত্মার অপরাজেয় মহিমা। কিন্তু আয়ুবতন্ত্রের গলায দড়ি দেওয়ার চেয়ে, বীরের মৃত্যুবরণ অনেক শ্রেয়।

আয়ুবের সাজানো বাগানে সকলেরেই তদ্বির-তদারক, অনুনয় বিনয় করা হল আতিথ্য গ্রহণ করতে। কিন্তু সকলেই প্রতিদানে ঘৃণায আর অবজ্ঞায় মুখ নিলেন ঘুরিয়ে। ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ আযব প্রকাশ্য অধিবেশন খতম করে দিলেন। কিন্তু খোদ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত বিচারপতি কি রায দান করলেন?

'জনতা চায প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট প্রযোগের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক।'

তবে কেমন করে তিনি হবেন তরী পার? কেন, তার আছে চল্লিশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রিদের প্রেতাত্মা। এঁদের আতিথ্যে-ই প্রাদেশিক ও ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর প্রাণ নিভু নিভু করছে। এই ন্যাশন্যাল ও প্রাদেশিক এ্যাসেম্বলীর এক্তিয়ার কতটুকু? এঁরা শুধু শো-কেসের সাজানো পুতুল, এদের নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। এদের পেট টিপলে শুধু আর্তনাদ করবে। আইন পাশ, বাজেট পাশ, সরকার অপসারণ, কোন কিছুতেই নেইকো অধিকার।

তাসত্ত্বেও নির্বাচন হল। উনিশে সেপ্টেম্বর ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ডাক দেওয়া হয়েছিল ধর্মঘটের। সেই ধর্মঘট শুধু সর্বাত্মক স্বতঃস্ফূর্ত বললে ভুল বলা হবে। আয়ুবের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে জনগণতান্ত্রিক চেতনা ও বিদ্রোহ কত প্রবল হয়ে উঠেছে, সেই অভূতপূর্ব ছবি শুধু স্মরণ-মনন-পটে অবিস্মরণীয়তায় ভাস্বর করে রাখার মত। বাস নেই, ট্রেন নেই, মটর নেই, যানবাহন নেই, প্লেন নেই, অফিস-কোর্ট-কাছারী নেই, হাট-বাজার নেই। আছে শুধু জনগণ, আর কালো মাথার সারি। শুধু ঊর্দ্ধশ্বাসে হাত তুলে

মোদের গরব, মোদের আশা

পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা কি? কি তার বংশ পরিচয়ের কৌলিন্য? শহীদ বরকৎ আলী ও সালেমের রক্তে পবিত্র হওয়ার দিনটির তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি? নির্লজ্জ পৈশাচিকতায় এই দিনটি জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত ইতিহাসকেও করে দিয়েছে ম্লান।

শুধু কি একসঙ্গে উনিশটি তাজা প্রাণ খতম হবার জন্যই আমাদের চিত্ত এত ব্যথিত, বিমূঢ়, বিস্মিত? স্বাধীনতার পরও আমরা অনেক প্রাণ দিয়েছি। উনিশটি তার তুলনায় কিছুই বেশী নয়। কিন্তু ভাষার প্রাণরক্ষার জন্য এমন আত্মাহুতি পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। তাছাড়া, এই আন্দোলন শুধু ভাষা আন্দোলনই ছিল না ছিল অনেক কিছু। এই ভাষার মন্ত্র ছিল তাঁর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম, এই ভাষা ছিল একটি জাতির আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল। যে জাতির নিজস্ব ভাষা নেই, তার কিছুই নেই। একটি জাতি তার ঋদ্ধি ও সিদ্ধির পথে এগিয়ে যায় তার সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। একটি জাতি কত সভ্য ও মহান, তার পরিচয় পাওয়া যায় তার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে।

সাত কোটি বাঙ্গালীর নিজস্ব কোন ভাষা নেই, তাকে দ্বারস্থ হতে হচ্ছে উর্দ্দু ভাষার কাছে। এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কি হতে পারে? কিন্তু তার চেয়েও বড় লজ্জার কথা, আছে তার নিজস্ব সুসমৃদ্ধ ভাষা, আছে দর্শন, আছে সাহিত্য, কিন্তু কোন কিছুতেই নেই তার অধিকার।

ভাষাকেও যে শোষণ করা যায়, তার নজীরও রাখলেন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা। পূর্ব পাকিস্তানকে সার্থক বেনামী বন্দর করবার জন্য চাই বাংলা ভাষার নির্বাসন। গোটা পূর্ববঙ্গের বাঙালী জাতিকে মোল্লাতন্ত্রের সরোবরে মগজ ধোলাই না করলে শান্তি কোথায়? পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণের উপনিবেশ ভূমি করার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক—বাঙলা ভাষা। অতএব, নিয়ে চলো তাকে কয়েদখানায়, করো বন্দী, খোল তার গা থেকে রাজতন্ত্রের অভিজাত আভরণ।

পশ্চিম পাকিস্তানের কসাইখানায় তাই আরম্ভ হল তার শান-পানিশ। তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে হিন্দুয়ানির দুর্গন্ধ। তারা আবার বিশ্বাস করে পৌত্তলিকতায়. একেশ্বরবাদীদের দেশে কাফেরদের ভাষার এ-কী অন্যায় উল্লাস। অতএব, বাঙালীর যা কিছু ভালো ও প্রিয়, তার বিরুদ্ধে চললো অভিযান। পূর্ববঙ্গের অবাঙালী আমলাতন্ত্র প্রচার করলেন সাড়ম্বরে. "বুরবাক জনসাধারণ, তোমাদের মালুম হয় না কেন, কোরাণ হচ্ছে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ. এতে আছে হজরত মহম্মদের বাণী আর এই বাণীকে জানতে হলে শিখতে হবে উর্দ্দু ভাষা, এবং তাতেই বলতে হবে বাৎচিৎ করতে হবে পহেচান। উর্দ্দু না শিখলে কেমন করে জানবে কোরআন, কেমন করে নেবে পাঠ মহম্মদের বাণীর।

"এইভাবে অবাধে প্রচার হতে থাকলো উর্দ্দু ভাষা, লীগের ফতোয়া আর অবাঙালী আমলাতন্ত্রের করুণায় উর্দ্দু ভাষা ও লিপি চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র।

এই ফতোয়ায় কিছুটা যে ব্যবসায়িক সাফল্য তাঁদের এনেছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। বাঙালী বলে পরিচয় দিলে নিজেদের ফেলা ইসলাম বিরোধিতায় ও রাষ্ট্রদ্রোহিতায় এই হীনমন্য উন্নাসিকতা পেয়ে বসেছিল অনেক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালীদেরও। এই

হীন-মন্যতার অংশীদার যাতে না হতে পারে পূর্ব পাকিস্তান সমাজ, তার বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম চালাতে লাগলেন পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ শহীদুল্লাহ্, আছেন আহমদ চৌধুরী, আছেন আহমদ শরীফ, আছেন শামসুর রহমান ও আরো অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষ, যাঁদের চিন্তায় আছে যুক্তি ও মানবিক প্রেম, বৈদগ্ধ ও উদার মুক্ত মন, সাহিত্যের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও সংস্কৃতির প্রতি আত্মমগ্নতা। বাঙলার সমাজ-মানসে এঁরাই দিয়েছেন সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব। কিন্তু আরেকজন, যাঁর নাম না করলে করা হবে প্রচণ্ড অবিচার— শুধু অবিচার নয়, বাঙলার তৎকালীন রাজনীতি ও ভাষা আন্দোলনের যথার্থ গতি, প্রকৃতি, তার মানসিকতা ও উদ্ভবকে জানতে গেলে এই ভদ্রলোকের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সৎনিষ্ঠা ও রক্ত জল করা অশেষ পরিশ্রমে তিনি তৈরী করেছেন বিরাট এক দলিল, ইতিহাসের বিচারে যার মূল্য অসীম। ইতিহাস লিখতে গেলে যে দূরদর্শিতার দরকার, দরকার স্বচ্ছ মুক্ত উদার মন, দরকার অসাম্প্র-দায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর, দরকার ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নিরূপণের তীব্র অন্তর্দৃষ্টির, বলা বাহুল্য, সেই যোগ্যতার বৈধ ছাড়পত্র, ইতিহাসের সেই রসজ্ঞান তার আছে পুরোমাত্রায়। শুধু ঘটনাই ইতিহাস নয়। ঘটনার অভ্যন্তরে তিলে তিলে ধূমায়িত হতে থাকা পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ, যন্ত্রণা ও আত্মপ্রকাশের অব্যক্ত ভাষাকে গড়তে, উপলব্ধি করতে পারার তাঁর দৃষ্টি আছে।

এই সব গুণাবলীর সহাবস্থান তাঁকে দিয়েছে প্রেরণা, জুগিয়েছে উৎসাহ। নিজে তিনি একজন অধ্যাপক, পূর্ব পাকিস্তানের রাজসাহী কলেজে তিনি ছাত্রদের পাঠ দেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের। যে গ্রন্থের উল্লেখ করার জন্য আমার এই ভূমিকা, সেই গ্রন্থটির নাম, 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', যাঁর এতক্ষণ গুণগান করলাম, তাঁর নাম বদরুদ্দীন উমর। কী-ই না নেই

গ্রন্থটিতে ? ভাষা আন্দোলনের একেবারে গোড়া পর্ব থেকে আরম্ভ করে, মধ্যম পর্ব পর্যন্ত লিখেছেন আগাগোড়া বিরাট এক আন্দোলনের ইতিহাস। ঘেঁটেছেন অনেক দলিল-পত্র, উদ্ধার করেছেন পোকা-খাওয়া জীর্ণ অনাবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্ব। যা আমরা জানতাম না, সেই অন্ধকারের অনেক বিস্মৃত ইতিহাসকে এনেছেন আলোয়, আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন তুলে।

তিনি প্রচুর তথ্য ও যুক্তি সহকারে একটি প্রবন্ধও লিখেছেন : রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি। তার থেকে কিছুটা অংশ তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔরসজাত ষড়যন্ত্রে রবীন্দ্রনাথকে বরবাদ করে দেবার অপচেষ্টা চলেছিল। উমর সাহেব সর্বনাশের সেই বীভৎস চেহারা দেখে লিখলেন,—

"পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা এবং রক্ষা করার স্বর্গীয় দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু' এবং 'ভারতীয়', কাজেই রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলে অথবা রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের চর্চা করলে এদেশের 'তৌহিদবাদী' মুসলমানদের দুনিয়া এবং আখেরাত দুই-ই বরবাদ হবে। তাঁদের প্রধান যুক্তি এই যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও পূর্ব পাকিস্তানী সংস্কৃতির তিনি কেউ নন। অর্থাৎ তাঁদের মতে পূর্ব পাকিস্তানী সংস্কৃতির সাথে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কহীন।

রবীন্দ্রবিরোধী এই আন্দোলনকে প্রথম দৃষ্টিতে উন্মাদ মনে হলেও আসলে এটা যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বিরোধী আন্দোলন একথা বোঝার জন্য খুব বেশী মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন হয় না। এ আন্দোলন ১৯৪৮ বা ১৯৫২ সালের মত সরাসরি বাংলাকে অস্বীকার এবং বাতিল করার আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন তার থেকে অনেক সূক্ষ্ম এবং পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পঙ্গু করার আন্দোলন। এর অনেক দিক আছে এবং

রবীন্দ্র-বিরোধিতা তারই একটি। এ বিরোধিতাকে তাই বিচ্ছিন্ন-ভাবে না দেখে এর চরিত্রকে একটি সামগ্রিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেটা করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা, বাংলা ভাষা সরলীকরণ, নববর্ষ উৎসব বন্ধ করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি সমস্তই একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ উদ্দেশ্যের সাথে ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা বিরোধী প্রচেষ্টা ওতপ্রোত যোগ-সূত্রে জড়িত।

পূর্ব পাকিস্তানকে যে বহুদিক থেকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে একথা আজ প্রায় সর্ববাদীসম্মত। এ দেশের সাংস্কৃতিক জীবনও আজ পঙ্গুদশাপ্রাপ্ত। যে কোন দেশের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং পঙ্গুত্ব তার সামগ্রিক জীবনকে আচ্ছন্ন করতে বাধ্য। তার দেশপ্রেম, আত্ম-সম্মানবোধ এবং গৌরবচেতনা সব কিছুই তার সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে অবিচ্ছিন্ন। এজন্য সাংস্কৃতিক জীবনকে পঙ্গু এবং বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলে পরোক্ষভাবে সমাজের সামগ্রিক জীবনকে পঙ্গু ও বিধ্বস্ত করার কাজ অনেকখানি সফল ও দ্রুততর হয়। এখনকার রবীন্দ্রবিরোধিতা এবং বাংলা ভাষা সরলী-করণের প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর সামগ্রিক জীবনকে এই ভাবে বিধ্বস্ত করারই এক সূক্ষ্ম দূরদর্শী পরিকল্পনা।

রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্তে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে বদরুদ্দীন উমর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভদ্র ভাষায় সূক্ষ্ম বিদ্রূপের সুরে বলে উঠলেন :

"রবীন্দ্রসঙ্গীত বাতিল করার আন্দোলন রবীন্দ্র-বিরোধিতার শেষ পর্যায় নয়। এটা একেবারে প্রথম পর্যায়। এর পর ধীরে ধীরে রবীন্দ্রকাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, চিঠিপত্র সব কিছুর মধ্যেই 'তৌহিদবাদ-বিরোধী' মালমসলা যথাসময়ে আবিষ্কৃত হবে এবং মুমীনের দলগুলো বরদাস্ত করতে নারাজ বলে ঊর্ধ্ব গগনে মাদল বাজিয়ে ধরণীতল উতলা করবেন। এখন রবীন্দ্রসংগীত বাতিলের

চেষ্টা হচ্ছে রেডিও, টেলিভিশন থেকে, তখন রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্য সম্পূর্ণভাবে বাতিল হবে পাঠ্যপুস্তক থেকে। কারণ রবিঠাকুরের গান শুনলে যদি ধর্মনাশ হয় তাহলে তাঁর কাব্যসাহিত্য চর্চা করলে দেশের ধর্ম রক্ষা পাবে কেমন করে, এ যুক্তি নিতান্তই অকাট্য এবং প্রথমটি স্বীকার করলে দ্বিতীয়টি অস্বীকার করার উপায় থাকে না।"

কিন্তু কেন রবীন্দ্রনাথকে বরবাদ করা উচিৎ, তার পিছনে শাসক পশ্চিম পাকিস্তানের কি যুক্তি, কি তথ্য? সে যুক্তি বড়োই উদ্ভট এবং হাস্যকর। উমরের তীর্যক ভাষায়ঃ

"রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু' এবং 'ভারতীয়' এই দুই কারণে তাঁকে বাতিল করা উচিত। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, তক্ষশীলাকে এঁরা পাকিস্তানের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সগৌরবে প্রচার করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাদের যত কিছু দুশ্চিন্তা এবং আপত্তি পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এদেশের লোকের ঠুনকো ঈমান কোন্ কবিতা, গান অথবা উপন্যাসের দ্বারা বিনষ্ট হতে পারে সেদিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি। এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে কাফেরদেরকে বর্জন করতেই হবে এবং তার সাথে মুনাফেকদেরকেও।

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ভারতীয় কাজী নজরুল সে অর্থেই রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক বেশী ভারতীয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানের পূর্বেই দেহত্যাগ করেছেন কিন্তু নজরুল ইসলাম এবং তাঁর পরিবারের লোকজন সকলেই ভারতে এখনো দেহ ধারণ করে আছেন। নজরুল ইসলামকেও কি তাহলে বাতিল করা দরকার?

বাতিল তিনি এমনিতেই হয়ে আছেন। কারণ তাঁর সমগ্র সাহিত্য এবং সঙ্গীত সাধনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানীদের পরিচয়ের কোন সুযোগই রাখা হয়নি। রেডিওতে তাঁর কতকগুলি বাঁধা ধরা গান ব্যতীত অন্য কোন গান দেওয়া হয় না। এমন কি অনেক

সময় তাঁর গানের শব্দ পরিবর্তন করেও গাওয়া হয়। এসবের কারণ নজরুলের এই গানগুলি 'তৌহিদবিরোধী'।

…রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হলেও তিনি নাকি হিন্দু। উপনিষদ ইত্যাদির প্রভাবে তাঁর মানসচরিত্র অনেকাংশে গঠিত, এই অর্থে ধরে নেয়া গেল তিনি হিন্দু। কিন্তু তাঁকে বাতিল করলে রক্ষা পায় কে? মাইকেল খ্রীষ্টান হলেও ঐ একই কারণে হিন্দু। ঈশ্বরচন্দ্র নাস্তিক হলেও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের তো কথাই নেই। এ যুক্তিস্রোতের ফল দাঁড়ায় এই যে পূর্ব পাকিস্তানীদের ঈমান রক্ষার জন্য সব হিন্দু সাহিত্যিকদের বাদ দেয়া প্রয়োজন। এমন কি যে সমস্ত মুসলমান লেখক হিন্দু ঘেঁষা, তাঁদেরকেও সমানভাবে বাতিল করা দরকার।"…

এই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কেন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল, তার কারণও লেখক আবিষ্কার করেছেন। খুব জোরের সংগেই তিনি বলেছেন:

"…রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে দ্রুত গতিতে জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তার কারণ রাষ্ট্রভাষার সমস্যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সাথে ছিল অবিচ্ছিন্ন। বাংলা ভাষাকে একটা নামমাত্র স্বীকৃতি দান করলেও আজ চারিদিক থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছে সে আক্রমণকে সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ করতে হলে ভাষা ও সাহিত্যের সাথে বৃহত্তর জীবনের নিবিড় ও গভীর যোগাযোগের বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার।"

কিন্তু এ তো গেল পরের অধ্যায়। একদিকে ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামী, অপর দিকে সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদনীতি, একদিকে ইসলামের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা ও অচলায়তন সমাজব্যবস্থার প্রতি মোহ ও মমতা, অন্যদিকে শিক্ষার অভাব, আরেক দিকে দারিদ্র্যের নগ্ন উল্লাস, এই হল রক্ষণশীল সমাজের একচেটিয়া

অধিকার। পশ্চিমী রক্ষণশীল দলের বিষাক্ত হাওয়া এইভাবে এর পিছনে মদৎ জোগাতে লাগলো।

কিন্তু এর পাশেই বয়ে চললো উদারতার এক আলো। প্রগতিশীল একশ্রেণী পূর্ব বঙ্গবাসীর ঘটলো বৈদগ্ধের উন্মেষ, ধর্মের কোন সংকীর্ণ ব্যাধি ও বুজরুকিতে টললো না তাঁদের মন। তাঁদের দৃষ্টি রইলো স্বচ্ছ, মন হল মুক্ত মানসিক চিন্তা ও যুক্তিতে, সংস্কৃতির আত্ম-প্রাণতা ও সাহিত্য প্রেমে তাঁদের-অন্তর হলো ভরপুর। 'শ্রেয়নীতির এই মূল্যবোধ সংকীর্ণতার গণ্ডিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।

এবার ফিরে যাই আগের অধ্যায়ে। মাতৃভাষার সংরক্ষণে ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অর্জনে ধীরে ধীরে পূর্ববঙ্গের জনগণ কি করে গড়ে তুলছিলেন আন্দোলনের শক্ত ভিৎ, তারই ইতিহাসে।

'আ মরি বাংলা ভাষা'-কে মাতৃ-ভাষার রাজকীয় সম্মানের সিংহাসনে অভিষেক করার উদ্দেশ্যে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের জুলাই মাসে বপন করা হল বীজ। বহু রক্তে-রাঙা ঢাকাকে করা হল তার তীর্থভূমি। ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ স্মারক গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন রোয়েদাদ। দিনটি ছিল ঐ সালেরই তেশরা জুন। পাকিস্তানের আজাদীর তখন আর বেশী দেরী নেই। তারপরের মাসেই মুসলীম লীগের কয়েকজন বামমার্গী কর্মী ঢাকায় গড়ে তোলেন একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। তাকৎ তার অনেক কম, লক্ষ্য কিন্তু এক, উদ্দেশ্য অনেক। সংস্থাটি উন্মোচন করা হল "গণ-আজাদী লীগ" এই নামকরণ দিয়ে। তাঁরা প্রকাশ করলেন একটি ম্যানিফেস্টো, নাম দিলেন: আশুদাবী কর্মসূচী আদর্শ। তাতে তাঁরা তুলে ধরলেন তাঁদের বক্তব্য:

"সত্যিকার পাকিস্তান অর্থে আমরা বুঝি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। সুতরাং আমাদের কর্তব্য এই শিশু পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গঠন করা, এবং মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করা।"

বুকের ও মুখের ভাষা সম্বন্ধে তাঁরা বললেন : "বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"

তারপর অনেক অশ্রুর স্রোতে, অনেক জীবনের মূল্যে পাকিস্তানে এলো আজাদী। পূর্ববঙ্গের জনগণ আস্বাদ নিলেন আজাদীর। কিন্তু কেমন তার স্বাদ, কেমন তার সৌরভ, কেমন তার বর্ণ? লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথের ভিখারী করে, বহু রক্তপাত ঘটিয়ে পেলেন যে আজাদী, তা জনগণকে দিলো কি? পশ্চিমীরা চাপালো উর্দ্দু ভাষা ও আরবী হরফ, করলো শাসন, চললো শোষণ। পূর্ব্ববঙ্গকে প্রতি মুহূর্তে পাঞ্জাবী ও উর্দ্দুভাষী আমলাতন্ত্র চোখ রাঙাতে লাগলেন, দিতে লাগলেন ধমক, করতে লাগলেন বিদ্রূপ।

আজাদীর বিদ্যুৎ ঝলকে জনসাধারণের চোখে তখন আলোর ধাঁধাঁ, মুসলীম জাতীয়তা তথা ইসলামের বাণী তখন তার অঙ্গে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক তখন কিছুটা শিথিল। চিত্তের সেই ভাবাবেগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে গোদের উপর বিষফোড়ার মত ঘাড়ের উপর চেপে বসলেন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা। কায়েম করা হল উপনিবেশের ভিত্তি-প্রস্তর। শিক্ষায় প্রতিষ্ঠা করা হল ইসলামী আদর্শ, প্রতিটি অঙ্গকে তার ছেদ করা হল, ঘটানো হল আমূল পরিবর্তন।

পাকিস্তানী আজাদী আসার কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা রেডিও-কে আনা হল পশ্চিম পাকিস্তানের করায়ত্তে। হুকুম দেওয়া হল : দিল্ যত চায়, প্রচার করো উর্দ্দু, কার্পণ্য করবে না এতটুকু-ও, তাহলে যাবে তোমার গর্দান। ঢাকা রেডিও-তে অন্তত চল্লিশ শতাংশ প্রচার করা হতে থাকলো উর্দ্দু ভাষা।

এইভাবে পূর্ববঙ্গের নিরীহ জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া

হতে লাগলো উর্দ্দু ভাষা, জোর করে করানো হল গলাধঃকরণ। সাড়ম্বরে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হল উর্দ্দু ভাষার মাহাত্ম্য।

স্কুলের বাঙলা বই লেখা হবে কোন লিপি দিয়ে? কেন, উর্দ্দু লবজের পাকা গাঁথুনি দিয়ে। বাঙালী ছাত্রদের জন্য তৈরী হল অদ্ভুত বাংলা ভাষা। সেই ভাষা যে কি পয়দা করলো, তা বোঝে কার সাধ্য! একটি বাংলা কবিতা, যা লেখা হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সহজবোধ্য ভাষায়, তার একটু নমুনা দিই:

"পাতা জাফরীতে নারদীল বুকে তবুবার শরবৎ,
নারঙ্গী রাঙ্গে রসিক মেহেদী মেওয়ার মহবৎ।
সুম্বল কেশী প্রবাল শা'জাদী সাজিয়াছে জওহরী,
জবল নূরের চূড়া হতে তার উঠিয়াছে তকবীর।"

মালুম হচ্ছে কারুর, কি এই চীজ, হিং টিং ছট্ কি?

শুধু কি এই? শুধু কি এতটুকু? প্রতিটি স্তরে, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের প্রতি মুহূর্তে যাতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে উর্দ্দু, তারই চলতে লাগলো বিরামহীন প্রয়াস। যাঁরা দিলেন তাঁদের এই প্রচারে মদৎ, তাঁরাই পেলেন সরকারী প্রসন্নতার স্নিগ্ধ বরাভয়। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা, সংবাদ-পত্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংস্থা, ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উর্দ্দুর প্রশংসায় হল পঞ্চমুখ, দিলেন দখলদারী সত্ত্ব, তাদের প্রতি সরকার হলেন দরাজ। চাপড়ালেন ওদের পিট, দিলেন উৎসাহ। বললেন, ঘাবড়াও মৎ। চালিয়ে যাও উর্দ্দুর রথ। লাগবে যত টাকা, দেবে করাচীর শায়েন-শা।" উর্দ্দু লিপি চালু করার জন্য করা হল এলাহীকাণ্ড। একেবারে দক্ষযজ্ঞ! এলো মাল-মসলা, এলো রসদ, এলো লক্ষ লক্ষ টাকা। তৈরী করা হল সুপরিকল্পিতভাবে স্কীম, চালু করা হল পুরোদমে কারবার। উর্দ্দু হরফে লেখা হল অগুণতি কিতাব, ঢালাওভাবে তা বিতরণ করা হল সকলকে। খোলা হল অনেক সেণ্টার, রাখা

হল বহুত মাইনে দিয়ে উর্দুর মৌলভী, দিলেন তাঁরা পাঠ, শুরু করলেন কাজ।

বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে অন্ধকারের যূপ-কাষ্ঠে কোরবাণি করবার পশ্চিম পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো এইভাবে। তারই বিপরীত দিকে কিন্তু ছোটখাট আয়োজন করে বাঙলা ভাষাকে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলেন কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল বাঙালী মুসলমান। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হলো। তাঁরা পনেরই সেপ্টেম্বর একটি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করলেন। বইটি আকারে ছোট হলেও, বক্তব্যের দিক থেকে অশেষ মূল্যবান, প্রতিটি বাক্যই লেখা হয় খুব নিষ্ঠা ও গভীর চিন্তার সঙ্গে। তাঁদের প্রধান কর্মকর্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বললেন, এক সময় ব্রিটিশ শাসকেরাও আমাদের ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়ে দিয়েছিল ইংরাজী ভাষা। সেই প্রেতাত্মা এখনো ঘুরছে আমাদের চতুর্দিকে অশরীরী ছায়ার মত। উর্দুকে যদি সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তাহলে পূর্বের সেই ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকেই অনুসরণ করা হবে। এবং সেই চেষ্টাই কোন কোন মহলে চালানো হচ্ছে পুরোদমে। এই হামলাকে প্রতিহত করার জন্য দরকার সুসংগঠিত আন্দোলন।

কিন্তু এ তো গেল কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মুসলমানদের বুকের কথা ও মুখের ভাষা। অনেক সংখ্যক মুসলমান বুদ্ধিজীবী কিন্তু দেখালেন অন্য যুক্তি, বললেন ভিন্ন কথা। ঐসলামিক আদর্শ, মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য ও পাকিস্তানের সুপরিকল্পিত প্রোপাগাণ্ডা তাদের করল অন্ধ, হারিয়ে ফেললেন বুদ্ধির জৌলুস। তাঁরা পাকিস্তানের মন্ত্রী

নাজিমুদ্দিনের হাতে তুলে দিলেন একটি স্মারকপত্র। তাঁরা হলেন সিলেটের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তাঁদের বক্তব্য তাঁদের ভাষাতেই তুলে দেওয়া যাক ঃ

নাজিমুদ্দিনের কাছে প্রেরিত সিলেটের কিছু সংখ্যক নাগরিকের স্মারকপত্র ঃ

"একদল লোক নিজেদের বিরাট সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিত বলে জাহির করে উর্দুর বিরুদ্ধে দারুণ প্রচার শুরু করেছে। পূর্ববঙ্গের লোকেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উর্দুকে জাতীয়তাবিরোধী ও বিদেশী ভাষা হিসাবে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশপ্রেমের মুখোশ পরে তারা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য চারিদিকে তোলপাড় আরম্ভ করেছে। জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার ভাব দেখিয়ে তারা নিজেরাই এমন এক ভাষার দাবী তুলেছে, যে ভাষার একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভের মতো যোগ্যতা একেবারেই নেই। মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী উর্দু ভাষাকে বর্জন করার এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা যে শুধু ধ্বংসাত্মক তাই নয়, তা পশ্চাদমুখী, নিন্দনীয় এবং সর্বোপরি সার্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তারা যদি বাংলাকে একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা এবং উর্দুকে ইংরেজীর জায়গায় রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলতো তাহলে সেটা বোঝা যেতো। কিন্তু বাংলার সমর্থকরা উর্দুকে পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায় এবং আমাদের সুচিন্তিত মতানুসারে সেটা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল।"

কিন্তু এই যুক্তি যে কত অসার, উদ্ভট ও অবাস্তব, তা বুঝবার মত বলিষ্ঠ মানসিকতা ওই সব ভদ্রলোকদের বোধ হয় ছিল না। ধর্মান্ধতার কালো চশমা চোখে লাগিয়ে আর যাই হোক সত্যকে

পাওয়া যায় না, মহৎকে অর্জন করা হয় না কল্যাণকে সার্বজনীন ঐক্যে কাজে লাগান যায় না।

অধ্যাপক সফিউদ্দিন আহম্মদ লিখলেন:

"বর্তমান পৃথিবীটা আজ আর চার দেওয়ালে ঘেরা গুপ্ত কারাগারও নয় বা কূপের মতোও নয়। এ যুগ ব্যষ্টির নয় সমষ্টির। এক কথায় আজকের যুগ আন্তর্জাতিকতার ও সার্বজনীনতার যুগ। এযুগে শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তাকরা আর ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর চিন্তা স্রোত আবদ্ধ করে রাখা হয় হিংসাবৃত্তির পরিচয় দেওয়া নয়তো আত্মঘাতী হওয়া। মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু একটি গোত্রের কথা ভাবা মানেই তো এক ঘরে হয়ে থাকা, মানবতার আসরে কোণঠাসা হয়ে থাকা। তা'ছাড়া এমনিতো আমাদের বদনাম আছে যে, পৃথিবীর আর সব জাতি যেখানে বিশ্ব সভ্যতার ভাণ্ডারে দান করছে সেখানে আমরা ভিক্ষা পাত্র হস্তে দাঁড়িয়ে থাকি তাদের করুণার উপর। এমন অবস্থায় আজও যদি আমরা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিয়ে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিই আজ যদি আমরা প্রাচীনকাল ও গুহাশ্রয়ী মানুষের মনোভাবের পরিচয় দিই তবে তো আর আমাদের কেহ ভিক্ষাও দেবে না। সাহিত্যকে যাঁরা শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাগাতে চান তাঁদের বুঝা উচিত যে, সাহিত্য কারো বাপ-দাদার কুক্ষিগত ধন নয়। এ বিশ্বমানবের অন্তরের ধন। এ ধনের মালিক সকলেই। সুতরাং এ সাহিত্য ও সংস্কৃতি অংগনে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার শিং নাড়ান, তাঁরা সাহিত্যিক ও শিল্পী তো ননই বরং সাহিত্য ও শিল্পের কুলশত্রু। যাঁরা হীনমন্য, মন যাঁদের আজও গুহার পাশে তাঁরাই সাহিত্যকে করতে চায় কুক্ষিগত। আর একদল সাহিত্যকে কুক্ষিগত করতে চায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। অপর কথায়, তাঁরা কামান আর গোলা-বারুদ দিয়ে সাহিত্যকেও জয় করতে চায়। আমাদের বুঝা উচিত কোন মহৎ সাহিত্যই ধর্মীয় আদর্শ ও রাষ্ট্রিয় আদর্শে

রচিত নয়, তা বিশ্বমানবের আবেদন ও বিশ্বাদর্শ বোধ নিয়ে রচিত।

এ যুগ রক্ষণশীল আর আত্মসঙ্কোচনের যুগ নয়। এ যুগ বিশ্বকে ধারণ করার আপন আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রসারের যুগ। এ যাঁরা স্বীকার করে না, তাঁরা দুর্বল, কেননা সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে আর দুর্বলের স্বস্তি আত্মগোপনে।”

তার আগে আহম্মদ সাহেব রেখেছেন বলিষ্ঠ এক যুক্তি, তা উদ্ধার না করলে তাঁর বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যাবে। ধর্ম ও সংস্কৃতি যে এক নয়, তাদের সম্পর্ককে একাসনে বসানো যে উভয়কেই অসম্মান করা, ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ করা, তাই হল তাঁর বক্তব্য। যেহেতু মুসলমানেরা গ্রহণ করেছে ইসলামের ধর্ম, তাই বলে আরবের আদব কায়দায়, বোল-চালে অভ্যস্ত হতে হবে, গ্রহণ করতে হবে আরবীয় অক্ষর, বর্জন করতে হবে বাংলা ভাষা এমন আজব ব্যাপার চাপানো চলে কি সকলের উপর সার্বজনীন ভাবে? তিনি লিখলেন:

“আমরা বলি ধর্ম ও সংস্কৃতি এক নয়, যেমন আরবের সংস্কৃতি আর ইরাণের সংস্কৃতি এক নয়। যেমন আরবের ইসলাম এলো ইরাণে আবার ইরাণের ইসলাম এলো বাংলায়। আমরা প্রত্যক্ষ-ভাবে আরবীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত নই, পরিচিত ইরাণী সংস্কৃতির সাথে। ইরাণের কবি-সাহিত্যক-শিল্পী আর সুফী-সাধকদের সাথে যতটুকু পরিচিত আরবের সাথে আমাদের ততটুকু পরিচয় নেই। সুতরাং আমরা যে ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে বড়াই করি তা আরবীয় নয় ইরাণীয়। তারপর আমরা বলতে পারি বাংলা দেশে যত সৈয়দ আছে একমাত্র জয়নাল আবেদীন হ’তে এত সৈয়দ এদেশে সম্ভব নয়। অবশ্য এ হিসেব আমার এক সংখ্যাতত্ত্বের বন্ধুকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছি। তা হলে আমরা বলতে পারি যে, পূর্ববাংলার ছয়কোটি মুসলমানের মধ্যে আরবের মুসলমান এক লাখও হবে না।

এ আলোচনার রেশ টেনে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে, আজ এক ঘণ্টা আগে আমি হিন্দু ছিলাম, এইমাত্র পীরের নিকট হ'তে আল্লা রসুলের কলমা পড়ে মুসলমান হলাম, কিন্তু সাথে সাথেই কি আমার রুচি ও মন মেজাজ পরিবর্তন হয়ে গেল? পীর আমাকে গরুর মাংস ভক্ষণ করতে দিলেই কি তা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ব? সুতরাং ধর্মান্তরের সাথে সাথেই খাওয়া দাওয়া ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় না। এ কখনো সম্ভবও নয়। তা হলে আমরা বলতে পারি যে, যেমন ইরাণী মুসলমানরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের সংস্কৃতিকে তাঁরা বর্জন করেননি। তাঁরা আরব ইসলাম গ্রহণ করলো কিন্তু বর্জন করলো না তাদের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি। তেমনই এদেশের হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করলো কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতি বর্জন করে গ্রহণ করেনি তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতি। অথচ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেও বাঙালীর সংস্কৃতি ঠিকই রয়ে গেল আর বাঙালীর বাঙালীত্বও ঠিক রয়ে গেল। আমি আগেও বলেছি যে, ধর্ম আর সংস্কৃতি এক নয়। রাশিয়ায়, চীনে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে মুসলমান আছে, তারা মসজিদে আযানদের নামাজ পড়ে, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি কি আরবীয় সংস্কৃতি? তাই বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি আর আরবীয় মুসলমানের সংস্কৃতি কখনো এক হ'তে পারে না। আমরা বাঙালী মুসলমানদের উপর যদি জোর করে আরবীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দিই তবে সংস্কৃতির নামে সেটা তলোয়ার আর লাঠি চালানো ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমরা বাঙালী মুসলমান সুতরাং আমাদের সংস্কৃতিও থাকবে বাঙালী সংস্কৃতি। আমরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছি আর তাই বলে আরবীয় কায়দার পোষাক পরতে হবে, ভাত বাদ দিয়ে খেজুর আর খুরমা খেতে হবে, এতো কখনো যুক্তির কথা হ'তে পারে না। কোন সংস্কৃতিবানের মনে এ চিন্তা ঠাঁইও দেবে না। যা আমাদের মনের মুক্তি দিতে পারে না, আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে না, সে সংস্কৃতিতে

আমাদের কি হবে? যেমন, ডঃ আহমদ শরীফ বলেন—যে সংস্কৃতি আধুনিক জীবন ভাবনার সহায়ক নয়, জীবনের মানস সমস্যার সমাধান দেয় না, মনের খোরাক যোগায় না, ব্যবহারিক জীবনের কোন অভাব মিটানোর যোগ্যতা যাতে অনুপস্থিত, যে সংস্কৃতি কেবল নরকের ভয় ও স্বর্গের লোভ দেখিয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণে তৎপর, ভাব, চিন্তা, জ্ঞান ও কর্মের উদ্যোগে ও প্রসারে রক্ত চক্ষু কিংবা কাতর, যে সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় না, সে সংস্কৃতি কল্যাণকে গ্রহণেও উৎসাহিত করে না; যে সংস্কৃতি কেবল ধরে রাখে, কেবলই পিছুটান দেয়, অথচ যা দিয়ে মনও ভরে না, প্রয়োজনও মিটে না, এগিয়ে যাবার দিশাও দেয় না, বেঁচে থাকার উপায়ও বাতলায় না, সে সংস্কৃতি দিয়ে আমরা কি করবো?

নিজ সুবিধা আদায়ের জন্য ইসলামী সংস্কৃতির দোহাই পাড়া বড়ই অকল্যাণকর। যাহা ভাল তাহাই আমরা গ্রহণ করবো। আমরা বাঙালীরা সৃজন করে নয়, গ্রহণ করেই হয়েছি সংস্কৃতিবান।

[বাঙালী সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য]

কিন্তু এই রবীন্দ্র-বিরোধীতা তথা বাঙালী সংস্কৃতির বিরুদ্ধ আচরণের জেহাদ কি করে কিছু লোকের মনে বেড়াতারের কাঁটা রচনা করলো? লেখকের সেদিকেও দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ। সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদনীতির বাষ্প যার গোড়ায় ইংরেজরা দিয়ে ছিলেন পানি আর জল, সযত্নে সন্তানের মত লালন করলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালী সম্প্রদায়, তা দৃষ্টি এড়ায় নি ইতিহাস-সচেতন প্রবন্ধকারের। তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবেই বললেন:

—"বাঙালীত্ব এবং মুসলমানত্বের মধ্যে বিরোধের কল্পনা সম্পূর্ণ-ভাবে সাম্প্রদায়িকতা-সৃষ্ট। ....বাংলা দেশে সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হল, মুসলমানরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মুসলমানরা ততই সরে আসার চেষ্টা করল বাংলার সংস্কৃতি থেকে। তাদের

কাছে বাংলার সংস্কৃতি মনে হল বিধর্মী, কাজেই, বিজাতীয়। বাংলা-দেশের হিন্দুরা যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙালী এবং মুসলমানরা যেহেতু হিন্দুর থেকে পৃথক, কাজেই তারা বাঙ্গালী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না।"

কিন্তু কেন? কি ছিল ইতিহাসের পশ্চাদ্‌পট? বাঙালী মানসিকতার এই দোদুল্যমানতার কারণ কি? এই সম্বন্ধেও সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর স্বচ্ছ ও বুদ্ধি-দীপ্ত প্রবন্ধে। তার সামান্য উদ্ধার করি:

"পূর্ববাংলার মুসলমানদের আড়ষ্টতার দুটি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষার সম্পর্কিত মনে করে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ।

বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার সভ্যতা বলতে যেন কোন জিনিসই নাই, পরের মুখের ভাষা বা পরের শেখানো বুলিই যেন তার একমাত্র সম্পদ। স্বদেশে সে পরবাসী, বিদেশীই যেন তার আপন।

তাই তার উদাসী ভাব, পশ্চিমের প্রতি অসহায় নির্ভর, আর নিজের প্রতি নিদারুণ আস্থাহীনতা। পশ্চিমী চতুর লোকেরা এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা জানে যে, বৃহৎ পাগড়ী বেঁধে বাংলা দেশে এলেই এদের পীর হওয়া যায়, কমের পক্ষে মৌলভীর আসন গ্রহণ করে বেশ দু' পয়সা রোজগারের জোগাড় হয়। শহুরে দোকানদার যেমন করে গ্রাম্য ক্রেতাকে ঠকিয়ে লাভবান হতে পারে, এ যেন ঠিক সেই অবস্থা। বাস্তবিক বাঙালী মুসলমান বাঙ্গাল বলেই শুধু পশ্চিমা কেন, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের সর্বভূতের কাছেই উপহাস ও শোষণের পাত্র।...

আমি উর্দু ভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না কিন্তু বাঙালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্য সত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন

দেখি, উর্দ্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙ্গালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে মাতোয়ারা, অথবা বাঙলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত, তখনই বুঝি এই সব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই।…

এতদিন মুসলমান কেবল হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বসে বলেছে যে হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানীর ভাবে ভরে দিয়েছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ত তা চলবে না। এখানে ইসলামী ঐতিহ্য পরিবেশন করার দায়িত্ব মুখ্যত মুসলমান সাহিত্যিক-দেরই বহন করতে হবে। তাই আজ সময় এসেছে মুসলমান বিদ্বজ্জন পুঁথিসাহিত্যের স্থলবর্তী বাংলা সুসাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন; তবেই মাতৃ-ভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামী ভাবধারা যথার্থভাবে জনসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য ও হীনতা-বোধ দূর করবে। উর্দ্দুর দুয়ারে ধর্না দিয়ে আমাদের কোন কালেই যথার্থ লাভ হবে না।"

কাজেই সিলেটের কয়েকজন কেতাদুরস্ত ভদ্রব্যক্তি বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সুরু করেছিলেন যে জেহাদ, তার আওয়াজ হল না খুব সোচ্চার। যাঁদেরকে তাঁরা বলেছিলেন জাতীয়তা বিরোধী, মুখোস-পরা স্বদেশপ্রেমিক, এবং উর্দ্দু ভাষার প্রতি যাঁরা অনাস্থা প্রকাশ করবেন, সার্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি তাঁরা করবেন বিশ্বাস-ঘাতকতা, তাঁরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে এই বলে সার্টিফিকেট দিলেন: মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রভাষা হবার মত পাস-মার্ক নেই, নেই যোগ্যতার ছাড়পত্র।

এই আজব যুক্তিকে যাঁরা বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করলেন, তাঁরা আর কেউ নন, সিলেটেরই অধিবাসী। তাঁরা আবার মরদানা নন,

তাঁরা হলেন বোর্খা ঢাকা জেনানা। তাঁরা তীব্র ঘৃণা আর প্রবল প্রতিবাদের সংগে জানালেন এর বিরুদ্ধে জেহাদ।

সৈয়েদা নাজিবুন্নেসা খাতুন একটি বিবৃতিতে বললেন: "যাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কুপুত্রতুল্য। অনেকে আবার না বুঝিয়া, ধর্মের দোহাই শুনিয়া উর্দুর সমর্থন করেন। তাঁহাদের তত দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু যাঁহারা ধর্মের দোহাই দেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি উর্দু ভাষাভিজ্ঞ অপেক্ষা সিলেটের উর্দু অনভিজ্ঞ মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের অনুশাসন পালনে কোন্ অংশে হীন?"

আর একজন জেনানা বললেন: "বাঙালী হিসাবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দাবি করেছিলাম, তেমনি আজ বাংলা দেশের ভাষা হিসাবেও বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করব না কেন?...পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র। তাই তার ভাষা হবে জনগণের ভাষা। বাংলার সাড়ে সাত কোটি লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে সে ভাষা তাদের নিজস্ব হবে না এও কি বিশ্বাস করতে হবে?"

যাঁরা ওকালতী করেছিলেন উর্দু ভাষার পক্ষে, গেয়েছিলেন গুণগান, মহিলাদের এই জোরালো বক্তব্য, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি, ভাষণ তাঁদের গায়ে ছাই ছিটিয়ে দিল না কি?

যাক সে সব কথা। উনিশশো সাতচল্লিশের আগাস্টের আজাদীর পর কয়েকজন অধ্যাপক গঠন করলেন গণতান্ত্রিক যুব লীগ। যাঁদের উদ্দেশ্য হল, "বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন এবং আইন আদালতের ভাষা করতে হবে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, উর্দু না বাংলা তা ঠিক করবে জনসাধারণ, ক্ষমতার তখ্তে বসা পশ্চিম পাকিস্তানের শায়েন-শা নয়।"

বুরবাকদের এ-কী অন্যায় আব্দার! এত ঢাক-ঢোল পেটান, এত আরবী অর্থাৎ উর্দু ভাষা তথা বিশ্বজনীন ইসলাম ধর্মের ধুয়া তোলা, এত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাধের সাজান প্রাসাদ, সবই কি বুজরুকেরা বরবাদ করে দেবে?

নিশ্চয়ই এরা চক্রান্তকারী, নিশ্চয় এরা হিন্দুস্তানের গুপ্তচর, নিঃসন্দেহে এদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে চড়ান চলে শূলে।

কিন্তু আসল সত্যটি, যা দিবালোকের মত উজ্জ্বল, পরিষ্কার, তা তাঁরা বুঝতে চাইলেন না। যাতে জনগণের অন্তরের সায় নেই, নেই হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাড়া, নেই আবেগ-স্পন্দিত হৃদয়ের স্পর্শ, তা জোর করে চাপানো চলে না, এই নির্মম সত্যটি তাঁদের হল না মালুম। আর তা চাপানো হলেও, তার ফল যে বদহজম, তাও তাঁরা বুঝতে চাইলেন না। কিন্তু বারুদে একদিন বিস্ফোরণ ঘটেই, সুপ্ত আগ্নেয়গিরি একদিন পরিণত হয় জ্বলন্ত লাভায়। তপ্ত সেই লাভার আগুন নেভাতে পারে না কেউ তা তিনি যতই শক্তিধর লৌহ মানব হোন না কেন।

ইতিহাসের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা আছে এবং সেই ভাষাকে পড়বার জন্য থাকা চাই চোখ। কিন্তু সেই চোখকে বন্ধ করলে একমাত্র দুর্ভেদ্য অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে কীই আর ভেসে উঠতে পারে? পাকিস্তানের প্রশাসকেরা এক চোখকে রেখেছিলেন বন্ধ, আরেক চোখকে রেখেছিলেন খোলা। কিন্তু সেই খোলা আঁখিও নিঁদে ঢুলুঢুলু হয়ে পড়েছিল উর্দু ভাষার ও ইসলামের মহব্বতে। সেই আঁখিতেও তাই তাঁরা দেখতে পেলেন না কিছু। তাই তাঁরা খুস্ মেজাজে বাস করতে লাগলেন মূর্খের স্বর্গরাজ্যে আর ঢলাঢলি করতে লাগলেন ইসলাম আর আরবী ভাষার সংগে।

বেতারকেন্দ্র, শিক্ষা বিভাগ, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং আরো নানা প্রতিষ্ঠান হল পশ্চিম পাকিস্তানের বসংবদ। কিন্তু

এত অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, সৈন্য-সামন্ত, জন-মজুরের বিরাট মিছিল থাকা সত্ত্বেও করাচীর শাসক গোষ্ঠি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাই করাচীতে ডাকা হল অধিবেশন। অনেক জবরদস্ত হোমড়া চোমড়ারা ছুটে এসে যোগ দিলেন সেই আসরে। চললো খানা, চললো পিনা। হল না শুধু আলোচনা। তা সত্ত্বেও হলেন তাঁরা গলদঘর্ম। মুছলেন তাঁরা মুখ, আঁখি করলেন বুঁদ। সেই সিরিয়াস শিক্ষা সম্মেলনে বিনা আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, উর্দ্দুই হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা। পানটা এত বেশী পরিমাণে হয়ে গিয়েছিল যে নড়ে-চড়ে বসেন, সে তাকৎও নেই হোমড়া-চোমড়া মহাজনদের। কোন রকমে একটু গর্দান হেলালেন, বোঝা গেল সবুজ সংকেতের নিশানা পেয়েছেন তাঁরা।

উর্দ্দুব ভাষা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, বাংলা ভাষার থাকবে না কোন স্থান, একচোখো এই কথা শু'নে ছাত্ররা হল ক্ষিপ্ত। জ্বললো তাদের চোখ, অপমানে তারা মুখ করলো কালো।

উনিশ শো আটচল্লিশ সালের মার্চ মাস। ঢাকায় আসছেন কায়েদে আজম। কায়েদে আজম তখন পাকিস্তানের একছত্র সম্রাট, কি জনপ্রিয়তায়, কি খ্যাতিতে, কি শ্রদ্ধায় তখন তিনি মধ্যগগণের একতম সূর্য। তাঁর নাম শুনলে ছুটে আসে লক্ষ লক্ষ ইসলাম রাষ্ট্রের নাগরিকেরা। শুধু একবার চোখের দেখায় ধন্য করতে চায় নিজেদের। তাঁর বাক্য তখন পাকিস্তানের গীতা, তাঁর কথা তখন উপনিষদ। এক বাক্যে, একটি মাত্র ঈশারায় জনগণ ওঠে, বসে। ইসলামাবাদের এমনই এক অদ্বিতীয় নেতা তিনি।

সেই অবিসংবাদী নেতা ভাষণ দিতে আসছেন ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে। কাজেই তাঁর বক্তৃতা শুনতে কাতারে কাতারে জনগণ আসছেন। কেউ আসছেন পায়ে হেঁটে, কেউ আসছেন গরুর গাড়ী চেপে, কেউ আসছেন ট্রেনে, কেউ আসছেন বাসে। শুধু কাছের অঞ্চল থেকেই নয়, আসছেন দূর দূরান্তর প্রদেশ থেকে। অনেক

শ্রম, অনেক কষ্ট স্বীকার করে। জনগণের প্রিয়তম নেতা গীতার কোন্ বাণী উচ্চারণ করেন, সেজন্য তাঁদের অপার আগ্রহ। তাঁর আসবার অনেক আগে থেকে জনারণ্যে ছেয়ে গেছে মাঠ, উপচে পড়েছে আশ-পাশের অঞ্চল।

কায়েদে আজম ঠিক ঘড়ির কাঁটা যখন ছ'টা, তখন এসে হাজির হলেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, অধঃ, উর্দ্ধ, চতুর্দিকে তাঁর দেহ-রক্ষীদের কড়া পাহারা। সেই কড়া পাহারায় বন্দী হয়ে তিনি ধীরে ধীরে উঠলেন বক্তৃতা মঞ্চে। তাঁকে দেখামাত্র উদ্বেলিত জনতা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দনে ফেটে পড়লেন, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ। সেই ধ্বনি-তরঙ্গ কাঁপতে লাগলো, ইথারতরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়লো। কায়েদে আজম আরম্ভ করলেন বক্তৃতা—"তামাম বাংলার মা ও বহিন………"

বলে চলেছেন তিনি এক নাগাড়ে। অধীর আগ্রহে, নিস্তব্ধ হয়ে শুনে চলেছে তাঁরা কায়েদে আজমের বক্তৃতা। কিন্তু, একি, হঠাৎ একী হল জনতার। তাঁদের সেই আবেগের উল্লাস কোথায় গেল, কোথায় গেল তাঁদের ঠোটের কোণে লেগে থাকা পুলকিত হাসির অভ্যর্থনা। তাঁদের হাতের পেশী হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠতে লাগলো কেন, মুখ কেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল? চোখের কোণ হয়ে উঠলো কেন লাল?

কায়েদে আজম কি সুস্থ মস্তিষ্কে বঙ্গাল তবিয়তে লেকচার দিচ্ছেন? এই তাঁর গীতার শ্লোক না এই উপনিষদের বাণী। দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে তিনি বলে চলেছেন, "Urdu and Urdu only shall be the State Language of Pakistan."

অর্থাৎ, একমাত্র উর্দ্দুই পাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার রাজকীয় সম্মান। বাকী সব ভাষা, বাংলা, পুস্তু ও সিন্ধি ভাষা রাজার পাশে কোন্ কোন্ স্থান দখল করবে? কোন স্থানই নয়। তাদের হতে হবে অনুগত প্রজা, কুর্নিশ জানাতে হবে উর্দ্দু ভাষাকে।

একে উর্দু ভাষা ও ইংরাজীর সংমিশ্রণে কায়েদে আজমের খিচুড়ি বক্তৃতায় জনগণ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিল, মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। তবু তারা নিস্তব্ধ ও নীরব ছিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাকে অসম্মান কিংবা অনাদর করাটা উচিৎ হবে না।

কিন্তু ওই একটি মাত্র কথা জনতার মনে দাবাগ্নি জ্বালিয়ে দিল। যিনি উচিৎ-অনুচিতের ধার দিয়ে যান না, জনগণের বুকের আস্থাকে এমন ভাবে গুঁড়িয়ে দেন, সেখানে জনতা নীরব হয়ে বসে থাকবে কেন? ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে না হয় চুপ করে থাকা যেত। কিন্তু যেখানে ভাষার মত একটা গুরুতর সমস্যা, জীবন-মৃত্যুর চেয়েও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, সেখানে নীরবতা শুধু ভীরুতা আর কাপুরুষতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই ভীরুতা আর কাপুরুষতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ মনুষ্যত্বের অবমাননা করা, মানব প্রগতি ও সভ্যতাকে অন্ধকারের দিকে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করা।

তাই রেসকোর্স ময়দানের জনগণ স্থির থাকতে পারলেন না। ভেতরে ভেতরে ধূমায়িত বিক্ষোভে তাঁরা ফেটে পড়তে লাগলেন। সভা থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা বুকের মধ্যে বারুদের স্তূপ নিয়ে।

ব্যাপারটার ইতি ঘটলো না এখানেই। একবার বীজকে বপন করবার সুযোগ ও সুবিধা দিলে ধীরে ধীরে তা পরিণত হয় বিরাট মহীরুহে। কাজেই আগে থেকে সচেতন হওয়া দরকার, যাতে বীজ প্রাণ ধারণের অনুকূল জল ও বাতাস না পায়।

সেদিনই রাত্রিবেলা, ছুটে আসতে লাগলেন ছাত্র-নেতারা এক-স্থানে। মুখে বিক্ষোভের আগুন যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বসলো আলোচনা। এলেন শেখ মুজিবর রহমান, এলেন নাইমুদ্দিন। গড়ে তুললেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ। শামসুল রহমান ও আতাউর রহমান নেতৃত্ব দিলেন পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজ গড়ে তুললেন আরেকটি

প্রতিষ্ঠান। নাম দেওয়া হল তার বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি। সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ আর মর্মাহত হলেন মুজিবর। ক্ষোভে রোষে তিনি ফেটে পড়লেন, "বাংলা ভাষার অপমান শির পেতে নেওয়া হবে না সামনে কঠিন পথ, নিতে হবে তাই দুর্জয় সংকল্প, গ্রহণ করতে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আন্দোলনের দ্বারা আদায় করতে হবে আমাদের প্রিয়তম মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা। এ-ছাড়া নান্য-পন্থা বিদ্যতে।

পরের দিন কায়েদে আজমের আবার দরবার বসলো। এবার আর রেসকোর্স ময়দানে নয়, এবার কার্জন পার্কে। এবার আর এঁচোড়ে পাকা অপরিণত বুদ্ধির ছেলে ছোকরাদের জমায়েৎ নয়, এবার বুদ্ধিজীবীদের সভা। যাঁরা মানীর মান দিতে জানে, জ্ঞানীর জ্ঞানোপদেশ ধৈর্যসহকারে হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁরাই বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মত অলঙ্কার ধারণ করলেন। কায়েদে আজম এলেন এখানে, খুব রাসভারী কণ্ঠে চোস্ত ইংরাজিতে লেকচার দিলেন, রেসকোর্সের সেই ভাগবৎ পাঠের পুনরাবৃত্তি করলেন এখানেও, "Urdu only shall be the State Language of Pakistan." তারপর চোখ রাঙিয়ে শাসানী দিলেন, "যদি কেউ এর বিরোধিতা করে, অথবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে, তাকে পাকিস্তানের দুষমণ ভাবা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।"

এই যদি হয় কায়েদে আজমের মনের সত্যিকার ভাগবৎ পাঠের তাৎপর্যটি, তাহলে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করাই উচিৎ। সেই ধর্মযুদ্ধের পবিত্র উদ্বোধন এখান থেকে আরম্ভ হোক।

তাই হল। উর্দু ভাষার পক্ষে ওকালতি করা মাত্র ছাত্রদের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো আকাশের দিকে। কণ্ঠ হল সরব, প্রতিবাদ হল গরম। সকলের ঐক্যতান ধ্বনিত হতে লাগলো মাঠে, ময়দানে, গ্রামে, প্রান্তরে। রাষ্ট্র-প্রধানের মুখের উপর লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে লাগলো, না, না, না। পাকিস্তানে একমাত্র

উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চলবে না। করতে হবে বাংলা ভাষাকেও।

কায়েদে আজম তাজ্জব বনে গেলেন। তাঁর মুখের উপর এমন বাৎ। পায়ের মাটি তাঁর সরে যেতে লাগলো, পৃথিবীটা কাঁপতে লাগলো, দুলতে লাগলো, উল্টে গেল, ভুমিকম্প হল, বজ্রপাত হল, জলোচ্ছ্বাস হল। মুহূর্তে আরো কত ছবি তাঁর মানসনেত্রে ছায়া-ছবির মত ভাসতে লাগলো, তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর সাজানো প্রাসাদ ভাবে তাসের ঘরের মত উড়ে যাবে ছাত্র-সমাজের মুহূর্তের হুঙ্কারের কাছে, তা তাঁর কল্পনার অগোচর।

গোটা বাংলার মুখে যে কবিতাটি সেদিন শোনা যাচ্ছিল, তার কয়েকটা পঙতি উদ্ধার করি ঃ

"ওরা আমার মুখের কথা
কাইরা নিতে চায়।
তারা কথায় কথায় শিকৃখল পরায়
আমার হাতে পায়।
... ...
সইমু না আর সইমু না
অন্য কথা কইমু না
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান।"

কায়েদে আজমের আর বেশিক্ষণ ভাগবত পাঠ শোনানো সম্ভব হল না। মনে মনে তিনি গর্জে উঠলেন, বুরবাকরা সব কাফের বনে যাচ্ছে। বাংলা ভাষা তো কাফেরের ভাষা, তাদের রবি-কবি তো বিরাট এক পৌত্তলিক। গোঁসা করতে করতে মঞ্চ থেকে মুখ ভার করে নেমে এলেন তিনি। বিরাট এক দেহরক্ষী বাহিনী নিয়ে সোজা চলে এলেন গভর্ণর হাউসের অন্তঃপুরে। জায়গাটি বেশ নিরাপদ।

কিন্তু না, আমাদের দাবী মানতে হবে, 'আ মরি বাংলা ভাষা'-কে

করতে হবে আমাদের মুখের ভাষা, প্রাণের ভাষা, রাজকীয় অভিষেকে তাকেও করতে হবে রাষ্ট্রভাষা। বাংলা ভাষাকে দুয়োরাণী করলে, আমরা তা বরদাস্ত করবো না।

কিন্তু ছাত্রদের এই অন্যায় আব্দেরে দাবীর পিছনে ছিল কি যুক্তি? ছিল কি তথ্য? উর্দ্দু গোটা পাকিস্তানে ৬'০ শতাংশের ভাষা, পাঞ্জাবী ২০'১ শতাংশের, পুস্তু ভাষাদের সংখ্যা ৩'৯ শতাংশ। আর বাংলা ভাষা? সেই কাফিরী ভাষায় কথা বলে ক'জনই বা? মাত্র ৬৭'৩ শতাংশ কথা বলে বাংলা ভাষায়।

৬৭' শতাংশের জায়গায় ৬'০ শতাংশদের দাবী তো আগে মানতেই হবে। তাকেই বসাতে হবে রাজকীয় মসনদে। এই হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্রষ্টা কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেবের ন্যায়বাদ প্রতিষ্ঠার সার্থকতম নমুনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সাম্য, মৈত্রী আর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সফল প্রয়োগ কোথায় আর দেখা গেছে। এই একটি মাত্র কারণেই তাঁর নাম সোনার অক্ষরে ইতিহাসে লিখে রেখে দেবার মত। অবশ্য ইতিহাস যদি দুষ্টামি করে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা!

মাতৃভাষাকে রক্ষা, তার প্রাপ্য যোগ্য সম্মান আদায় এবং বঙ্গ সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবনের রাজপথ তৈরীর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছিল উনিশ শো আটচল্লিশ সালে, দিনটি ছিল এগারোই মার্চ। ধর্মযুদ্ধ সুরু হয়েছিল এখান থেকে। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তর শহীদ-তীর্থে পরিণত হল একুশে ফেব্রুয়ারী, উনিশ শো বাহান্ন সালে।

কিন্তু সে তো চার বছর পরের কথা।

কায়েদে আজম চলে গেলেন। কিন্তু যে আগুন তিনি জ্বালালেন, তার স্ফুলিঙ্গ কারবারী প্রাসাদকূটে গিয়েও আছড়ে পড়লো। নিভলোনা তা অতি সহজে। রাস্তায়-রাস্তায়, দেওয়ালে-প্রাচীরে, স্কুলে-কলেজে, গ্রামে-গঞ্জে ছেয়ে গেল পোস্টার। সব

পোস্টার-এ একই কথা, একই ভাষা একই ভাব :

বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা।

আরম্ভ হল আন্দোলন। সুরু হল নির্যাতন, আরম্ভ হল ব্যাপক ধড়পাকড়। ছাত্রদের বজ্র-মুষ্টির পাশে এসে দাঁড়ালেন অনেকে-ই, করলেন সাহায্য, করলেন সহযোগিতা। এলেন বগুড়ার মহম্মদ আলি, কুষ্টিয়ার আব্দুল মোত্তালিক মালিক, কুমিল্লার তফাজ্জল আলি। আরো এলেন ঢাকার মিসেস আনোয়ারা খাতুন, পাক পরিষদ সদস্য জনাব খয়রাত হোসেন। তাঁরাও তাদের সংগে দিলেন সুর, মেলালেন গলা, তুললেন হাত।

কিন্তু তাঁদের সমর্থন যে মিথ্যা ছলনার অভিনয় মাত্র, তা বুঝতে পারেনি সরলমন ছাত্রেরা। কেমন করেই বা বুঝতে পারবে? তারা তো অন্ধকারের গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে চলা-ফেরা করে না। মন তাদের উদার, বুদ্ধি তাদের স্বচ্ছ, কর্তব্যে তারা আন্তরিক, আদর্শে তারা উজ্জ্বল, লক্ষ্যে তারা অবিচল। কাজেই লোভের পিচ্ছিল পথের গোপন লেন-দেনের খবর তারা জানবে কি করে? যারা সৎ, যারা পবিত্র, তাদের এসব খবর জানবার কথাও নয়। কিন্তু নেপথ্যের রঙ্গ-মঞ্চে চলতে লাগলো দর কষাকষি। মোহম্মদ আলিকে দেওয়া হল বার্মার রাষ্ট্রদূতের পদ, তফাজ্জল আলি আর আব্দুল মোত্তালিক দখল করলেন মন্ত্রীত্বের গদী।

লোভের এই নির্লজ্জ ব্যাভিচার দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল যুব সমাজ। তারা এ-হেন বিশ্বাসঘাতকতার কথা কল্পনাও করতে পারে না। যৌবনের ধর্ম আর যাই হোক, ফাঁকী দিতে জানে না, বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। আন্দোলন তাই থেমে গেল না। প্রথম রাউণ্ডে তারা জয়লাভ করলেন। মার্চের পনেরো তারিখে নাজিমুদ্দীন ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসলেন। অনেক আলাপ-আলোচনান্তে ছাত্রদের দাবী মেনে নিলেন তিনি। হল তাদের সংগে চুক্তি। ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন, বাংলা হবে

পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা। এবং তা যাতে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়, তার জন্য তিনি করবেন তদারক, করবেন তদ্বির।

ভালো কথা, যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। কিন্তু শেষেরটা কি ভালো হয়েছিল অগত্যা যে মাসে কায়েদে আজম উর্দু রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেবার কথা ঘোষণা করলেন, তার পরের মাসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ। যারা বাঙালী তারাই পালন করলো রবীন্দ্র উৎসব, নিল ব্রত উদ্‌যাপনের শপথ। ঢাকায় যে রবীন্দ্রস্মরণ-তীর্থ হল, তাতে নেতৃত্ব দিলেন প্রাদেশিক মন্ত্রী হবিবুল্লা। আর যায় কোথায়! করাচীতে রব উঠলো, গেল, গেল, সব গেল। তারস্বরে চীৎকার সুরু করলো করাচীর দৈনিক পত্রিকা ডন, মর্নিং নিউজ, যারা নিজেদের বিবেক আর মনুষ্যত্বকে বন্ধক রেখেছেন করাচী সরকার তথা কায়েদে আজমের কাছে। কি! হবিবুল্লা জন্মদিন পালন করেন কাফের রবীন্দ্রনাথের, এত তাঁর দুঃসাহস বেয়াদপকে শাস্তি দেওয়া উচিৎ।

কিন্তু কে দেবে শাস্তি? কার আছে বুকের সেই কলিজা? নাজিমুদ্দিন জল ঘোলা করতে সাহস করলেন না। একা তো হবিবুল্লাই নয়, গোটা বাংলার মানুষের রবীন্দ্রনাথ হলেন আকাশ, হলেন বাতাস, হলেন তাঁদের আত্মার আত্মীয়। সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে, সংগ্রামে-আন্দোলনে, দারিদ্র্যে যন্ত্রণায়, প্রেমে প্রীতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সংগে আছেন হিমালয়ের মত অপরাজেয় মাহাত্ম্য নিয়ে। তিনি তাঁদের প্রাণে বাজিয়ে চলেছেন বাঁশী।

উনিশ শো পঞ্চাশ সালে বেরুলো পাক গঠনতন্ত্র নির্ধারণের বেসিক প্রিন্সিপ্যাল কমিটি। তাতে বলা হল, আর কোন ভাষা নয়, উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্থানের ভাষা-সম্রাট অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা। অন্য কোন ভাষার সেখানে কোন আসন নেই।

তবে নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের কাছে যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে

ছিলেন তার ভবিষ্যৎ কি হবে? তাঁর কথার উপর ভরসা করে ছাত্রসমাজ নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। কিন্তু করাচীর বড় কর্তা সেই প্রস্তাব মানতে নারাজ। মুসলীম লীগের ধুরন্ধর নেতারা বললেন, "নাজিমুদ্দিন এই কথা বলেছিলেন নাকি? আর যদি বলে থাকেন, তবে কি তিনি স্বেচ্ছায় খুস্ মেজাজে দিয়েছিলেন এই সব প্রতিশ্রুতি? নিশ্চয় না। সেদিন ছাত্রদের কথায়, বন্দুকের নলের কাছে তিনি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র। এ-ধরণের প্রতিশ্রুতি দেবার কোন অধিকার তাঁর নেই।"

এই মধুর বাণীতে ছাত্রেরা খুস্ হয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে নিদ যাবে এবং শেরোয়ানী আচকান আর কায়েদে আজমী টুপি পরে ধ্বনি দেবে, কায়েদী আজম জিন্দাবাদ, তাহলে তো পূর্ব পাকিস্তানে সুবুদ্ধির সূর্যোদয় হয়েছে বলতে হবে। গণ-আদালত কিন্তু অন্য কথা বলে।

এই বক্তব্যের প্রতিবাদে, মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবীতে জেলা-বোর্ডে সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের ডাকা হল এক মহা-সম্মেলন, তার নাম হল Grand National Convention. এই মহা-সম্মেলনে একের পর এক আসতে লাগলেন জনসাধারণ। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষিত সমাজ, সর্বস্তরের মানুষ সকলেই মাতৃভাষার উৎসবে এসে মিলিত হতে লাগলেন। সভায় সভাপতিত্ব করলেন আতাউর রহমান। সেই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল: বাংলা ভাষা হবে জনগণের ভাষা, বাংলা ভাষা হবে বাঙালীর ভাষা, বাংলা ভাষা হবে রাষ্ট্রভাষা।

এরই মধ্যে ঘটে গেল অদ্ভুত এক ব্যাপার। লিয়াকৎ তখন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছেন, তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন ফজলুল হক। তিনি বার করলেন এক ফর্মুলা, ভাষার সর্বরোগ হরণ করে সেই ফর্মুলা। সেই ফর্মুলায় তিনি বাতলালেন, হেথা নয়, হোথা নয়, কোথাও যেতে হবে না। তাঁর ঝুলিতে আছে

ভাষারোগগ্রস্ত অমৃত-বটিকা। সেটা হল, বাংলা ভাষাকে লেখা হবে আরবী হরফে।

ভাষা হর ওষুধু-ই বটে! একে গোদ, তার উপর এই সর্ব ভাষাহর বটিকা চেপে বসলো বিষ ফোড়ার মত। এতদিন কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র ছিল, বাংলা ভাষাকে কেমন করে সর্বহারা করা যায়, এই ফর্মূলা দিল কেমন করে বিনাশ করা যায়।

উনিশশো বাহান্ন সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী। পাক গভর্নর জেনারেল নাজীমুদ্দিন আবার ঢেঁড়া পেটালেন, পাক গণতন্ত্রের বেসিক প্রিন্সিপ্যাল কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উর্দুই হবে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

এবার বারুদের উপর যেন আগুন পড়লো। এতদিন ভেতরে ভেতরে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল। এবার সুপ্ত লাভা পরিণত হল জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে। নাজিমুদ্দিন বোধহয় বুঝতে পারেন নি, গোটা পূর্ববঙ্গের নবজাগ্রত সমাজ পশ্চিম পাকিস্থানের একতরফা সিদ্ধান্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার জেদ মেনে নেবে না

ছাব্বিশে জানুয়ারী এর-ই প্রতিবাদে দেওয়া হল হরতালের ডাক। এই ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলেন, যাঁরা শিক্ষার সংগে ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ, তাঁরা-ও। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালন করা হল ধর্মঘট। তারপর একে একে ছাত্রেরা এসে সমবেত হতে লাগলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে মিলিত হয়েছে স্কুলের অল্প বয়সী ছাত্র-ছাত্রীরাও। বোঝে না তারা রাজনীতি, বোঝে না তারা কূটনীতি, বোঝে না ওরা কোন ছলনা কিংবা প্রতারণা। কিন্তু যে ভাষায় তারা নিশ্বাস নেয়, যে ভাষার আলোতে ভবিষ্যৎ দেখে, সুখ-দুঃখের গান গায়, তাকে বোঝার জন্য তো দরকার নেই কোন রাজনীতি কিংবা তর্কবিদ্যার।

ছাত্র নেতারা একে একে দিলেন বক্তৃতা। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগ ঠোঁটের কোণে ধারণ করলো জ্বালাময়ী রোষবহ্নি, আর কথার দাবদাহে তা ঠিক্‌বে বেরুতে লাগলো বুলেটের মত, "আমরা আর কিছু চাই না, আমরা চাই বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হোক, এই আমাদের দাবী। এই পরিষ্কার, দিনের আলোর মত উজ্জ্বল কথা সরকারের কানে কেন ঢুকছে না, তা বোঝা সত্যিই কঠিন আর দুর্বোধ্য। কিন্তু আর সময় নয়। অনেক সময় দিয়েছি। এবার কথায় নয়, কাজেও আমরা প্রমাণ করবো, মাতৃভাষাকে আমরা রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিতে পারি কিনা।"

ঐ দিনই বিকেলে ঢাকা উকিল লাইব্রেরীতে ডাকা হল এক সর্বদলীয় সভা। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটিও এর অনুকূলে নামলেন এবার পথে। এখানেও আনা হল মাইক, চললো বক্তৃতা। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, আদর্শে অবিচল, লক্ষ্যে দ্বিধাহীন ছাত্র নেতারা এসে দাড়ালেন মাইকের সামনে। আগুন হয়ে ঝরলো তাঁদের কথা, "এই সংগ্রাম শুধু ভাষা আন্দোলন নয়। এই সংগ্রাম মনুষ্যত্বের সংগ্রাম, মানবতার সংগ্রাম। মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রাম। এই পথের কণ্টক হয়েছে লীগ সরকার।

আমরা দাবী করেছি, প্রত্যেক ভাষাকে দিতে হবে আত্ম-প্রকাশের অধিকার, দিতে হবে সমানাধিকার। আমরা চাই, শুধু বাংলা ভাষা নয়, বেলুচ, সিন্ধী, উর্দ্দু, প্রত্যেক ভাষাই পাক একই সুযোগ, একই সুবিধা। জীবন ধারণের জন্য আলো, বাতাসের মত একটি জাতির সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির জন্য চাই ভাষার বিকাশ, চাই ভাষার স্বাধীনতা। নইলে তার মৃত্যু ঘটতে বাধ্য। আমরা শুধু বাঁচতে চাই না, আমরা চাই সভ্য দুনিয়ার সংগে সমানতালে পা রেখে এগিয়ে যেতে। একটি জাতি কত সভ্য, তার পরিচয় পাওয়া যায় তার সংস্কৃতিতে।

কিন্তু ভাই সব, লীগ সরকারের বক্তব্য কি? তাঁদের বক্তব্য হল, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা। এতগুলো ভাষায় কাজ চালাতে গেলে ঝামেলার অন্ত থাকবে না। তার জন্য দরকার একটি তেজী ভাষার। সেই তেজ মেটাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র উর্দ্দুর।

কিন্তু ভাইসব, এই যুক্তিকে যে অতি সহজেই বাজে কাগজের ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়, তা আর বলার দরকার নেই। অনেক দেশেই একাধিক রাষ্ট্রভাষা আছে। তাঁরা যখন সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, তখন আমরাই বা তা পারবো না কেন? আসল কথা, এটা কোন যুক্তি নয়। এটা হচ্ছে বাংলা ভাষাকে দাবিয়ে রাখার সুকৌশল চক্রান্ত। কিন্তু এই চক্রান্তের মুখোশ আমরা খুলে দেবো"...

সাবাস! ছাত্র নেতাদের বক্তৃতায় উল্লসিত শ্রোতারা হর্ষধ্বনি করে তাঁদের সমর্থন জানালেন।

সেই সম্মেলনেই গঠন করা হল, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি। প্রতিটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে দু'জন করে নেওয়া হল প্রতিনিধি। সেই সংগ্রাম প্রতিষ্ঠানে এলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্র লীগ, আওয়ামী লীগ, খিলাফতে রব্বানী। কমিটিতে যাঁরা রইলেন, তাঁরা হলেন সামসুল হক, আবদুল মতিন, কামরুদ্দিন আহমদ, অলী আহামদ, আবুল হাশেম, আতাউর রহমান খান ও আরো অনেকে। আহ্বায়ক হলেন গোলাম মাহবুব

কিন্তু এই সংগ্রাম কমিটির কর্মসূচী হবে কি? এই ব্যাপারে আলোচনার জন্যে আবার বসলো সংগ্রাম কমিটির সভা।

সভায় প্রশ্ন উঠলো, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র বাংলা হবে, না অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা? এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল। নানা মুনি নানা মত পরিবেশন করতে লাগলেন। কেউ বললেন, একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, কেউ বললেন উর্দ্দু

ও বাংলা দুটি হোক রাষ্ট্রভাষা, আবার কেউ বললেন একেবারে ভিন্ন কথা, দেখালেন ভিন্ন যুক্তি।

আলোচনার আসর নানা কথা, নানা যুক্তি, নানা তথ্যে গরম হয়ে উঠতে লাগলো। একজন বললেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দ্দু ও বাংলা—এটা অনেকে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এটা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই, আমাদের উপর অন্যায়ভাবে উর্দ্দুকে চাপিয়ে দেবার যেমন আমরা প্রতিবাদ করেছি, আন্দোলন করছি ও করবো, তেমনি আমরা এও চাই না বাংলা ভাষা অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করুক। অন্য ভাষার উপর জোর করে বাংলা ও উর্দ্দু চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও হবে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও আমাদের আদর্শের পরিপন্থী।

অথচ আমরা ইচ্ছে করলেই বাংলা ভাষাকে একক রাষ্ট্রভাষা করবার দাবী জানাতে পারতাম। তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে তা অন্যায় ও অযৌক্তিক হতো না। কারণ, শতকরা সাতষট্টি জনের ভাষা হচ্ছে বাংলা। তাই, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই, আমরা সে দাবী তুলতে পারি। কিন্তু আমরা চাই, প্রত্যেকটি ভাষা ফুটে উঠুক শতদল বিকশিত পুষ্পের মত: ভাষার স্বেচ্ছাচার নয়, ভাষার স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।"

আলোচনায় এ-কথা পরিস্কার হয়ে উঠলো, ছাত্র নেতারা অন্য ভাষার উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চান না। তাঁরা চান প্রত্যেক ভাষার সমানাধিকার ও স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেকটি ভাষা তার আত্মপ্রকাশের তথা আত্মবিকাশের স্বর্ণদুয়ার প্রান্তে এসে দাঁড়াক, এই তাঁদের কাম্য। সেই সঙ্গে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর কাছে মাথা তুলে যাতে দাঁড়াতে পারে, সেই জন্য তাঁরা করবেন সংগ্রাম, দরকার হলে দেবেন রক্ত, দেবেন প্রাণ।

সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত স্থির হল, বাংলা ভাষা হবে অন্যতম রাষ্ট্র

ভাষা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠবে আন্দোলন। সম্মেলনে আরো ঠিক হল, চৌঠা ফেব্রুয়ারী ডাকা হবে হরতাল, ছড়িয়ে দিতে হবে প্রতিটি শহর, গ্রাম, গঞ্জের কোণায় কোণায় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ।

তদনুযায়ী হল হরতাল, করা হল প্রতিবাদ, ডাকা হল সভা। রাস্তায় রাস্তায় বার করা হল মিছিল, শোভাযাত্রা। হাতে তাদের পোষ্টার, মুখে আগুনের ফুল্‌কী : বাংলা ভাষাকে হটানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। কেন্দ্রীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করুন। বাংলা ভাষা অমর রহে—

এই হল তাদের শ্লোগান, এই হল তাদের কণ্ঠের সমবেত দাবী। বিকালে সংগ্রাম কমিটি আয়োজন করলেন এক জনসভার। তাতে এলেন মৌলানা ভাসানী, আবুল হাসেন ও আরো অনেকে। ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে বললেন তাঁরা অনেক কথা। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করা হলে আন্দোলন চলছে, আন্দোলন চলবে। ঠিক হলো, সেই স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিন একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করা হবে ভাষা-দিবস হিসেবে। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য দেওয়া হবে প্রদেশব্যাপী বন্ধ্‌-এর ডাক।

এই একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটিকে সার্থক করবার জন্য চলতে লাগলো নেপথ্যে প্রস্তুতি। ছাত্রেরা ভিতরে ভিতরে নিজেদের সংগঠনকে জোরদার করবার অবিরাম প্রয়াস চালাতে লাগলেন। দিবারাত্রি শুধু কাজ, কাজ, আর কাজ। এমন কি, পকেটে খাওয়ার পয়সা নেই, তাতে কি হয়েছে। বাংলা ভাষাকে যারা কেড়ে নিতে চায় বাঙালীর বুক থেকে, তাদের জন্য আছে তো বিদ্রোহের আগুন। এই বিদ্রোহের জ্বালা দিয়েই দুচার দিনের ক্ষুধাকে দমন করা যাবে স্বচ্ছন্দে। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।' বাংলা ভাষার নাম শুনলে ক্ষিদে মিটে যায়, তৃষ্ণার মরুভূমি পরিণত হয় শ্যামল স্নিগ্ধ প্রান্তরে।

এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য চাই অর্থ, চাই রসদ। তা কে জোগাবে? কেন, ছাত্রেরা জোগাবে, কেন জোগাবে সাত কোটি আত্মা যে সুরের ইন্দ্রজালে বাঁধা, তারা। এগারো ও বারই ফেব্রুয়ারীকে ঘোষণা করা হল 'পতাকা দিবস।' ভাষা আন্দোলনের পতাকা দিয়ে সংগ্রহ করবে অর্থ, করবে রসদ।

কচি কচি কিশোরেরা, যাদের মুখে সবে ফুটছে ভাষা, তারা এসে দাঁড়ালো জনতার রাজপথে। তারা গেল দুয়ারে দুয়ারে। কে তুমি? আমি ছাত্র। কি চাই তোমার?

বুকের পাঁজরে এঁটে দিলো ভাষার পতাকা। আর বলতে হল না, কি চাই তোমার। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পকেট থেকে বেরিয়ে এলো পয়সার ঝুলি।

বদরুদ্দিন ওমর তাঁর ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থ-ই বলেছেন:

"ভাষা আন্দোলনের মৌলিক স্বতঃস্ফূর্ততা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে তাতে যাঁরা কিছুটা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্যই পুরাতন আমলের নেতৃবৃন্দ নন। এই নেতৃত্ব যাঁরা দেন, তাঁরা অল্পবয়স্ক এবং মোটামুটিভাবে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনার-ই তাঁরা প্রতিনিধি। কিন্তু এদের মধ্যেও কোন একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে আন্দোলনের নায়ক হিসেবে নির্দেশ করা ঠিক হবে না। এ আন্দোলনের নায়ক পূর্ববাংলার সংগ্রামী জনতা।"

সেই সংগ্রামী জনতাই নেমেছিলেন রাস্তায় রাস্তায়। সংগ্রহ করেছিলেন অর্থ, জুগিয়েছিলেন শক্তি, দিয়েছিলেন প্রাণ। সেই নবজাগ্রত চেতনাই সেদিন দিয়েছিল গোটা বাংলাকে নেতৃত্ব। তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকটি পত্রিকা, যাঁরা এক প্রাণ, এক মনে মুক্তি যুদ্ধের সৈনিকদের সংগে বাজিয়ে ছিলেন ঐক্যতান। দুর্ভাগ্য, তাদের আশা ভরসার শেষ প্রতিনিধি 'অবজারভার' পত্রিকাকে কয়েদ করলেন লীগ সরকার।

তেরই ফেব্রুয়ারী ঐ পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল আলামকে নিয়ে আসা হলো কারাগারে। তাঁর অপরাধ, বাংলা ভাষার স্বপক্ষে তিনি জোরালো যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন, দিয়েছিলেন তাকে মদৎ। অতএব, তিনি রাজদ্রোহী। ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে একটি পত্রিকার সম্পাদক গ্রেফতার, এই ঘটনা সংবাদপত্রের ইতিহাসে লেখা হবে গৌরবের রাজকীয় অভিষেক দিয়ে। পত্রিকাটির প্রকাশও সেই সংগে জঙ্গীশাহী করে দিলেন বন্ধ।

একটি নেই, আরেকটি আছে। একটি প্রাণ নিভেছে, আরেকটি প্রাণ জ্বলেছে। একটি প্রাণের শিখা থেকে জ্বলেছে শত শত প্রাণের শিখা। নেই অবজারভার, আছে ইত্তেফাক্, ঢাকার সাপ্তাহিক। তারাও প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে আলো করতে লাগলো জনপথ, রাজপথ।

এইভাবে আন্দোলন এগিয়ে চললো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, অবিচল আদর্শের গৈরিক ধ্বজা নিয়ে।

কিন্তু এ তো গেল একদিকের খবর। কিন্তু আরেক দিকের খবর কি? রাজভাষার উপর যাঁরা চালাতে চান রুদ্ররোষের ষ্টীম রোলার। তাঁরা বসে রইলেন না হাত গুটিয়ে। লাহোরের সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্র শুধু কাঁপতে লাগলো টরে-টক্কা বজ্রনিনাদ করে। শুধু অপর প্রান্ত থেকে শোনা যেতে লাগলো, "হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।" তাঁরা দিবারাত্রি শুধু কানের সঙ্গে যন্ত্রকে লেপ্টে রাখলেন।

অস্থির উন্মাদনায় লিয়াকৎ আলি কেবল ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেন। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ তাঁর কাঁপছে থরথর করে, শরীর দিয়ে কেবল ঘাম ঝরছে। উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য লিয়াকৎ আলিও কি নেহাৎ কম মেহনৎ করেছেন। কিন্তু তাঁর সাধের স্বপ্ন এবং কায়েদে আজমের শেষ ইচ্ছাকে বরবাদ করে দিচ্ছে বদমাস কাফেররা। গভর্ণর জেনারেল নিজামুদ্দিনকে ট্রাঙ্ককল করলেন তিনি।

জোরালো আদেশ দিলেন, যে কোন উপায়ে বেয়াদপদের সৃষ্টিছাড়া আন্দোলনকে কবর দিতে হবে। তার জন্য লাগে সৈন্য, দেবো আমি, লাগে বুলেট, দেবো আমি। কিন্তু আন্দোলনের উপর ষ্টিম রোলার চাপাতে হবে, দিতে হবে তাকে গুঁড়িয়ে!

খোদ্ শায়েন-শা-র ফর্মান, গদি বজায় রাখতে একে কি অগ্রাহ্য করা চলে? কিন্তু তাকিয়ে দেখলেন সামনের দিকে, নূতন প্রাণবেদনায় টগ্‌বগ্ করে ফুটছে গোটা একটি জাতি। তারা অশান্ত, তারা চঞ্চল, তারা দুর্বার, তারা দুর্দমনীয়।

এদের এই গণ জাগরণকে কেমন করে দেবেন বাধা, কেমন করে করবেন খতম? একশো চুয়াল্লিশ ধারা? তাই ভালো হবে। আগে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করে সংগ্রামী জনতার মতি গতির খবর নিলে নেহাৎ মন্দ হয় না। তারপর হাওয়া যেদিকে ছুটবে, তারাও ছুটবেন সেই হাওয়ার পেছনে ধাওয়া করে। কিন্তু ওরে বুরবাক, হাওয়াকে কি ধরা যায়, গতিকে কি বাধা দেওয়া যায়, আবেগকে কি থামানো চলে?

কিন্তু নিজামুদ্দিন অনড়, নিজামুদ্দিন অচল। তাই, তিনি গোঁফে তা দিয়ে সারা শহরে ঘোষণা করলেন একশো চুয়াল্লিশের বেড়াজাল। পুলিশের গাড়ী রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে দিলেন, সেই নিজামুদ্দিনের বাণী, সারা শহরকে কয়েদ করা হল একশো চুয়াল্লিশ ধারায়। আজ থেকে এক মাসের জন্য। একসঙ্গে চারজনের চলা-ফেরা, অস্ত্র-শস্ত্র বহন, সভা-সমিতি-শোভাযাত্রা সব কিছুকে নিষিদ্ধ করা হল।

সেদিন ছিল বিশে ফেব্রুয়ারী।

ঘোষণার সেই বয়ান শুনে জনগণ হলেন ক্ষিপ্ত, হলেন উত্তেজিত। গোটা জাতি ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় ফুঁসতে লাগলো।

এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিৎ। অতঃকিম? সর্বদলীয় সংগ্রাম

কমিটির জরুরী সভা বসলো। এক এক নেতা ভিন্ন ভিন্ন মত দিতে লাগলেন। বেশিরভাগ নেতাই রায় দিলেন, এই অবস্থায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ, সামনেই নির্বাচন। এই উপলক্ষে যদি ব্যাপক গোলযোগ হয় তো সরকার নানা যুক্তি দেখিয়ে নির্বাচন সিকেয় তুলে রাখবেন। তার চেয়ে বরং এই আন্দোলনের গায়ে অনির্দিষ্ট কালের তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হোক।

ওদিকে কিছু ছাত্র মিটিং সেরে এসে জানালেন, যে তারা একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করবার-ই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। বেয়নেট কিংবা টিয়ারগ্যাসের কাছে তাঁরা ভীরু কাপুরুষের মত আত্ম-সমর্পণ করতে একেবারেই নারাজ।

সর্বদলীয় কর্মপরিষদের বৈঠকেও বলা হল, একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করা উচিৎ হবে না। এবং কেউ যদি কই কর্ম-পরিষদের নির্দেশ অমান্য করেন, সংগে সংগে বাতিল করে দেওয়া হবে কর্ম-পরিষদ।

কিন্তু ছাত্রদের রক্তে জেগেছে সর্বনাশা আগুন। নূতন দিনের সূর্যকে সেলাম করবার জন্য তাই তারা হয়ে উঠেছে অধীর, চঞ্চল, উন্মাদ। কোন নিষেধের তর্জন তারা আর শুনতে রাজী নয়, কোন আদেশই তাদের করাতে পারবে না কুর্নিশ।

তাই ঝড়ের চেয়েও দ্রুতবেগে ছাত্রদের সিদ্ধান্ত ছড়িয়ে পড়লো আকাশে বাতাসে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা হবে, হবে, হবে। কোন শক্তির দম্ভের কাছে মাথা নত করবো না মোরা। দুর্বলের অস্ত্র বেয়নেট, রাইফেল, একশো চুয়াল্লিশ ধারা, শক্তিমানের অস্ত্র আন্দোলন, ত্যাগ, মৃত্যু। দুর্বলের সংগে থাকে শাসক, সবলের সংগে থাকে জনগণ। দুর্বলের চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু, শক্তিমানের চূড়ান্ত পরিণতি অমৃত।

একুশে ফেব্রুয়ারী, উনিশ শো বাহান্ন সাল।

তরুণদের তূর্যে হল প্রভাতোদয়। "নবজীবনের গাহিয়া গান আমরা আনিব রাঙা প্রভাত।" সকলের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বন্দনা করলো, মৃত্যু তোর দুয়ারে দুয়ারে, গাও জীবনের জয়গান। অতএব বিলম্ব কেন, বেরিয়ে এসো জনতার রাজপথে। ভাঙ শৃঙ্খল খোল দ্বার।

শৃঙ্খল ভেঙে, দ্বার খুলে ছাত্রেরা এসে দাঁড়ালো সূর্য রাঙানো রাজপথে। ঢাকার স্মরণতীর্থ পথে আরম্ভ হল ছাত্রদের আনাগোনা। বেলা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। আকাশে সূর্য এসে দাঁড়ালো প্রায় মধ্য গগনে। আরম্ভ হল শাসনের বজ্র নিষ্পেষণের ব্যারিকেড রচনা করা। ভ্যানের পর ভ্যান, পুলিশের পর পুলিশ এসে ব্যারিকেড সৃষ্টি করলো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। এ্যান্টি রায়ট ব্ল্যাক কেরিয়ার গাড়ী এসে দাঁড়ালো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক প্রবেশ দ্বারে। হাতে রাইফেল, মাথায় বেয়নেট, হাতে লাঠি, সংগে টিয়ার গ্যাস, এই হল পাঞ্জাবী আর বেলুচি ফৌজের অস্ত্রের বহর।

নওজোয়ানেরা ঘৃণা আর অবজ্ঞার থুতু ছিটিয়ে দিয়ে প্রবেশ করতে লাগলো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। সংখ্যায় তারা হবে অগুণতি। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাই তো নয়, যত স্কুল কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। আছে তাদের যত ছাত্র, তারা সকলেই এসে জমায়েৎ হয়েছে মাতৃভাষা বাংলার মহোৎসবে।

বেলা ঠিক বারোটায়, মধ্যাহ্ন সূর্যের খররৌদ্র যখন মাথায়, তখন আরম্ভ করলেন সভা। একে একে ছাত্র নেতারা এসে দাঁড়াতে লাগলেন বক্তৃতা মঞ্চে। সকলের কণ্ঠেই ঝরছে আগুন, চোখে ইস্পাতের কঠিন শপথের দৃঢ়তা। সকলেই প্রস্তাব করলেন, একশো চুয়াল্লিশ করা হবে অমান্য, মানা হবে না আদেশ।

ঠিক হল, দশ জন দশ জন করে এক একটা দল আইন অমান্য করবেন। এগিয়ে যাবেন তাঁরা এ্যাসেম্বলি হাউসের দিকে। প্রথম

দলটি সমবেত কণ্ঠে "আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা, আমাদের ভাষা রাষ্ট্রভাষা, বলতে বলতে বেরিয়ে পড়লেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে মাইকে ওয়ার্নিং দেওয়া হল, যাঁরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করবেন, তাঁদেরই করা হবে গ্রেফতার।

কিন্তু কে শুনবে কার কথা! মৃত্যু তখন ছাত্রদের দুয়ারে দুয়ারে গাইছে জীবনের জয়গান। তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন পুলিশের রক্ত রাঙা চোখকে অগ্রাহ্য করে, বেয়নেটের বেষ্টনীকে তোয়াক্কা না করে।

সংগে সংগে পোষ মানা পাঞ্জাবী ও বেলুচ জঙ্গীবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁদের ওপর, ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তাঁদের লালবাগ থানায়।

কিন্তু মাত্র দশজনেই শেষ নয়। অনেক আছে, আরো আছে। এগিয়ে এলেন আরো দশজন। এঁরা ভেটেনারী স্কুল, টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট, আর কমার্শিয়াল কলেজের ছাত্র। এঁদেরও ভাগ্যে জুটলো একই ব্যাপার। এঁদেরও টেনে নিয়ে যাওয়া হল লালবাগ থানায়। এবার এলো আরেকটি দল, আবার এলো, আবার, আবার...

শেষ বারে ছাহাবউদ্দিনের নেতৃত্বে এগিয়ে এলো পরবর্তী দলটি। হঠাৎ ঘটে গেল এক অঘটন। কোথাও কিছু নেই, আচম্বিতে শক্তির আস্ফালন করলেন একজন পুলিস অফিসার। বোধ হয় দেখতে চেয়েছিলেন, এদের পাঞ্জায় কত জোর, তা পরীক্ষা করে। একটি স্কুলের ছাত্রের গায়ে বসিয়ে দিলেন ভারী বুটের লাথি। আর যায় কোথায়, সেই অল্প বয়স্ক ছাত্রটি উঠে দাঁড়ালো বীরের মত, বাড়িয়ে দিলো সেই অফিসারের দিকে ওর বজ্রমুষ্টি। বালকের চোখে বিদ্রোহের সেই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন জঙ্গীশাহীর দল। বেচারাকে শাস্তি দেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। এলো-পাথাড়ি সুরু হল তার উপর অকথ্য নির্যাতন।

বীভৎস পাশবিকতার সেই উল্লাস দেখে ছাত্রদের বিক্ষোভে যেন আগুন পড়লো। তারা ক্রোধে দিশাহারা হয়ে ঘিরে ধরলো পুলিশবাহিনীকে। সুরু করলো চীৎকার, কিছু ঢিল-ও এসে পড়লো সেখানে। 'অবস্থা আয়ত্তে' আনতে পুলিশ ছুঁড়ে দিলো টিয়ারগ্যাস, অন্ধকারে অন্ধকারে ছেয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন। ছাত্রেরা জীবন রক্ষার জন্য ছুটে এলেন পিছন দিয়ে। শেলের পর শেল ফাটিয়ে তারা ছুঁড়তে লাগলো কাঁদানে গ্যাস। চোখ যেন পুড়ে যেতে লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেখানে টিকতে না পেরে ছুটে গেল মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু সেখানেও পুলিশ তাদের পিছু নিল।

মেডিক্যাল কলেজ, সেখানে আছে রুগী, কেউ যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে, কেউ আর্তনাদ করছে, কেউ এপাশ ওপাশ করছে। কিন্তু তাদেরও কি রেহাই আছে। সেখানেও অম্লান বদনে ফৌজরা চালালো টিয়ারগ্যাস, ছুঁড়লো শেল। একেন বেচারারা রুগী, তার ওপর এই নির্যাতন। রুগীদের অবস্থা কেমন হলো, তা না বলাই ভালো।

ছাত্রেরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু রণে ভঙ্গ? না, দানবের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছেন, তার তো সবে আরম্ভ। এখনো বাকী অনেক।

কিছুক্ষণ পর আরম্ভ হল দ্বিতীয় প্রস্থের মহড়া। এবার ছাত্রেরা ছুটে আসতে লাগলো ঢাকা হল মেডিক্যাল কলেজ, জগন্নাথ হল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি এলাকা থেকে। এবার আর দশজনের মিছিল নয়, অসংখ্য জনের। তাদের মুখে সেই তাদের গরবিনী বাংলা ভাষার শ্লোগান, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা।

সবে একটু নিশ্বাস নিচ্ছিল জঙ্গীবাহিনী। অনেক দৌড়াদৌড়ি হয়েছে, অনেক কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে। তাই তারা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ক্ষুদে শত্রুরা এ-কী

বাচালতা শুরু করলো। তারা আবার তৈরী হলো, রসদকে রাখলো প্রস্তুত।

এবার শুধু শ্লোগান নয়, যেন বাঁধ-ভাঙা গর্জন। সমুদ্রের বাঁধ ভেঙে গেছে, আর ধরে রাখা যাবে না। মহাসমুদ্রের সেই মহা-সংগীত শুনে বিচলিত হলেন পাঞ্জু আর বেলু। বৃথাই তারা এতো অস্ত্র-শস্ত্র এনেছে, কোনই কাজে লাগলো না।

হঠাৎ কোথাও কিছু নয়। গর্জে উঠলো রাইফেল, আওয়াজ হল, গুড়ুম···

শুধু একটা নয়। একটার পর একটা। গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম··· এক একটা আওয়াজে নেওয়া হতে থাকলো এক একটি তাজা প্রাণ। লুটিয়ে পড়লো তারা মাটিতে। একজন নয়, দু'জন নয়— উনিশটি চঞ্চল যৌবন প্রাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁকর বিছানো পথ শহীদের রক্তে তীর্থ হয়ে গেল আবদুল জব্বার ও রফিউদ্দিনের বুকের কলিজা ভেদ করে গেছে রাইফেলের গুলি। তাঁদের শেষ নিশ্বাস পড়ছে সেখানেই, ভাষার বিদ্যা-তীর্থে, মাতৃভাষার মন্দিরে। আবু বরকতের চোখে বুলিয়ে দিয়ে গেল গোধূলির শেষ ম্লান আভা।

তখন বাজেট অধিবেশন চলেছে এ্যাসেমব্লিতে। গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ধর ঝড়ের বেগে ঢুকলেন পরিষদ কক্ষে। মুখ তাঁদের উত্তেজনায় থকৃথক্ করছে। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "বন্ধ করো অবিলম্বে বাজেটের প্রহসন। আমাদের ছেলেদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে পুলিশেরা, সেখানে আমরা নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না।"

মুহূর্তের মধ্যে বিরোধী দলের সদস্যরা ফেটে পড়লেন তীব্র ক্রোধে। ছাত্র হত্যার জবাব চাই, নুরুল আমিন জবাব দাও। সেই সংগে উঠলো মুলতুবি প্রস্তাব। একে সমর্থন জানালেন খয়রাত হোসেন ও মৌলানা আবদুর রসীদ তর্কবাগীশ ও আরো অনেকে। ফকরুদ্দিন সাহেব এই ব্যাপারে এতই বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হন যে তিনি

পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। তিনি ছিলেন 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক। মুসলীম লীগের সদস্যরাও এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এসে যোগ দিলেন বিরোধী দলে। বাজেট রইলো পড়ে, সদস্যরা ছুটলেন মেডিক্যাল কলেজের দিকে।

দাবানলের মত সেই মর্মান্তিক পৈশাচিক খবর ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। সকলের মুখ মেডিকাল কলেজের দিকে।

তুমি রিক্সাওয়ালা, তুমি কি করতে এসেছো ?

তুমি ফেরিওয়ালা, তুমি কি করতে এসেছো ? তুমি ভাষার কি বোঝ ?

আমরা দেখতে এসেছি আমার ভাইকে। আমাদের ভাষাও তো সেই বাংলা ভাষা, আমাদের ভাই-এর ভাষাও বাংলা। দেখতে এসেছি কোন্ প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে এরা এসেছিল ধরায়, আমাদের বাংলা ভাষাকে পবিত্র করতে, প্রতিটি ধূলা-কণাকে তীর্থ রেণু করতে। কি সেই প্রাণ, কি সেই আলো ?

এলো ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, কেরানী, দিন মজুর। শুধু একবার চোখের দেখা দেখে ধন্য করতে চায় নিজেকে, সার্থক করতে চায় নয়নদ্বয়কে।

পরদিন বাইশে ফেব্রুয়ারী। ভোর হল। কিন্তু আকাশ এত ম্লান কেন, বাতাস এত ভারী কেন, সূর্য এত বিষন্ন কেন ? কেন ওদের চোখে অশ্রুর সজল বিন্দু ?

না দোস্ত্, তুমি কেঁদো না। আজ কাঁদবার দিন নয়, আজ জ্বলে ওঠার দিন, আজ কঠিন প্রতিজ্ঞা নেবার দিন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন, সেখানে শহীদদের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে গৈবি জানাজা পাঠ করলেন ঢাকার ইমাম। তিনি খোদার দুয়ারে বললেন,

"নিভায়েছে যারা আলো, নিবায়েছে যারা বায়ু,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো, তুমি কি বেসেছ ভালো ?"

নামাজের পরেই বেরুলো অফুরন্ত বিষাদ-ক্লান্ত জনতার শোক-মিছিল। এখান থেকে শোক মিছিল বেরিয়ে যাবে নবাবপুর রোড, যাবে চকবাজার, তারপর ফিরে আসবে এখানে। কিন্তু শাসকেরা রুদ্র-রোষের এই বহ্নি মূর্তি দেখে শহীদদের দিতে চাইলেন না জনতার হাতে। নাই দিক, কিন্তু তাঁদের আত্মা তো আছে আকাশে বাতাসে, আছে বাংলা ভাষায় আর জনগণের হৃদয় সাম্রাজ্যে। সেখানে শহীদেরা একচ্ছত্র সম্রাট। কাজেই মিছিল বেরুল।

একশো চুয়াল্লিশ ধারা? তখন ভয়ে নিজের জান বাঁচাতেই ব্যস্ত। মিছিল এগিয়ে চললো দৃপ্ত পদক্ষেপে, নম্র মস্তকে, বিষাদাত্মক হৃদয়ে। হঠাৎ মিছিলের গতি রোধ করলো জঙ্গীশাহী বাহিনী, পাঞ্জু আর বালু।

ঢাকা হাইকোর্ট, যেখানে হয় অন্যায়ের বিচার, সেখানে পুলিশ আরম্ভ করলো নির্বিচারে গুলির বৃষ্টি বর্ষণ। ন্যায় অন্যায়ের যারা ধার ধারে না, তাদের কাছে কি আইন, কি বিচার! কিন্তু শোক সন্তপ্ত মৌন মিছিল, তার ওপর গুলি বর্ষণ, এ যে তৈমুরলঙের নিষ্ঠুর পৈশাচিকতাকে বুড়ো আঙুল দেখায়। জনতার নেতা ফজলুল হক এই নির্বাক লাঠিতে হয়েছেন আহত। হাইকোর্টের রাজপথে লুটিয়ে পড়লো ল'কলেজের ছাত্র শফিকুর রহমান, বুক থেকে তার ফিনকি দিয়ে রুধির বেরুলো। অদূরে বিচারালয়ের বিচারের বাণী নিভৃতে বোধহয় দু'বিন্দু অশ্রু দিয়ে শহীদ তর্পণ করলো। এই গুলি বর্ষণে কেউ হলেন হত, কেউ আহত।

ক্রুদ্ধ জনতা পুড়িয়ে ছারখার করে দিলো ঢাকার মর্নিং নিউজ, নির্লজ্জ মিথ্যার বেসাতি করা ছিল যার একমাত্র মূলধন। এটি ছিল উগ্র মুসলীম সমর্থক।

সর্ব্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সংগঠন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কারণ, তখন সরকারের নির্মম বজ্র নিষ্পেষণ নেমে এসেছে উদ্যত

খড়্গের মত ছাত্রদের উপর। কাউকে করেছে হত্যা, কাউকে করেছে আহত, কাউকে করেছে কয়েদ। কারুর নামে ওয়ারেণ্ট, কেউ করেছে আত্মগোপন।

আন্দোলন কিন্তু থেমে রইলো না। তিন দিন ধরে ছাত্র পুলিশের পাঞ্জা কষাকষি চললো। যে সংগ্রাম শুধু কেন্দ্রবৃত্ত রচনা করেছিল ঢাকা শহরে, তা ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। গ্রামেগঞ্জে, হাটে বাজারে, অফিসে দোকানে, স্কুলে কলেজে, ব্যবসায় বাণিজ্যে। চাকা থামলো রেলের, অফিসের কাজকর্ম্ম হল বন্ধ, বিচার রইলো মুলতুবি, পড়া শুনা রইলো দূরে, ষ্টীমার গেল থেমে। এক কথায়, দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্ম্ম-চঞ্চলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। গণ-আন্দোলনের ঢেউ-এ উত্তাল হল গোটা পূর্ববঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হল। ছাত্রদের আবাসিক স্থল থেকে জোর করে হটিয়ে দেওয়া হল। পাঁচ ই মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ দিলেন ডাক শহীদ দিবসের। ন' দফার ভিত্তিতে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করবারও ছাত্ররা দাবী জানালেন।

কিন্তু তার আগে থেকে-ই অতন্দ্র প্রহরীর মত ছাত্র-নেতাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন শাসকেরা। কাজেই যত পারলেন ব্যাপক ধরপাকড় করলেন, আন্দোলনকে চেষ্টা করলেন দমাতে।

পূর্ববঙ্গের এই জাগরণ দেখে ঢুলুঢুলু আঁখির তন্দ্রা গেল টুটে। দেওয়ালের লিখনকে অস্বীকার করলে সেই আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে হবে নিজেদের, গণ-সংগ্রামের সেই চেহারা দেখে চৈতন্যোদয় হল সরকারের। প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন প্রথমে বেমালুম ব্যাপারটা চেপে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।—"গুলি চালিয়েছে পুলিশে, এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? ইটস্ এ ফ্যান্টাসটিক্ স্টোরী।'

এই মিথ্যা দম্ভোক্তিতে ফেটে পড়লেন পরিষদের সদস্যরা। তখন তাঁদের হয়ে তিনি বেহায়ার মত ওকালতী করলেন, "হ্যাঁ, গুলি চালিয়েছে ঠিক-ই। কিন্তু তার জন্য কে দায়ী? দায়ী উচ্ছৃঙ্খল অবিবেচক অর্বাচীন ছাত্র। তাদের হাতে আমরা আইন তুলে দিতে পারি না।"

সেই অবিবেচক উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সেই নুরুল আমিনই আইন সভার জরুরী বৈঠক বসাতে বাধ্য হলেন। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় ভাষা অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য গ্রহণ করা হল প্রস্তাব।

করাচীর শায়েন-শা বুঝলেন, হতে পারে বাঙালী জাতি বড় ভীরু, বড় নম্র, বড় উদার, বড় আবেগপ্রবণ, কিন্তু সেই সংগে তারা বড় আত্মসচেতনও। তাদের আত্মসম্মানে কোন আঘাত করলে তারা হয়ে ওঠে বড় ভয়ংকর, তখন আর তারা কাউকে পরোয়া করে না। সুতরাং এই বাঙালী জাতিকে চিরকাল ধর্মীয় উন্মাদনা আর উগ্র জাতীয়তাবাদে মেঘাচ্ছন্ন রাখা যাবে না। এই মোহ যেদিন সরে যাবে, ধর্মীয় উন্মাদনা যখন কমে যাবে, উগ্র জাতীয়তাবাদ যখন স্তিমিত হয়ে যাবে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে সেদিনই হবে সব চেয়ে বড় দুর্দিন।

অপর দিকে এই ভাষা আন্দোলন বাঙালীর চোখও দিল খুলে। তাঁরা দেখতে পেলেন নিজেদের সর্বহারা দেউলিয়া চেহারা, যার জন্য মূলত ও মুখ্যতঃ দায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা। শুধু সাংস্কৃতিক দিক থেকেই বাঙালী জাতিকে তাঁরা শোষণ করেন নি। করেছেন সমস্ত দিক দিয়েই। একমাত্র উর্দু ভাষাকে তাঁরা রাষ্ট্রভাষা করে তা গেলাতে চেয়েছিলেন, চাপাতে চেয়েছিলেন হরফ। শুধু শিক্ষায় নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা এভাবে বাংলার জনগণকে দমিয়ে রাখতে চান, তার আত্মপ্রকাশের পথকে বন্ধ করে দিতে চান। সরকারের সমস্ত উচ্চপদে অবাঙালী, পাঞ্জাবী আর কিছু

বেলুচ, সরকারের বড় বড় কলকারখানা সব পশ্চিম পাকিস্তানে। তারও সর্বাধিনায়ক অবাঙালী। বাঙালীর উপর শুধু চালানো হয় নির্মম শাসন, শোষণ আর সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন। তার মুখ বন্ধ করে রাখা হয় উগ্র জাতীয়তাবাদ আর সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার গান গেয়ে।

কাজেই, ভাষা আন্দোলন, শুধু বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন-ই নয়। এই আন্দোলন একটি জাতির আত্মশুদ্ধির আন্দোলন, আত্মসচেতনতার আন্দোলন। নিজেদের এই সর্বহারা চেহারা দেখে বাঙালী বুঝলো, তার বৈভবকে পেতে গেলে শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। পশ্চিম পাকিস্থানের চক্রান্তের হাত থেকে তাকে মুক্তি পেতে হবে। সেজন্য দরকার সংগ্রাম, দরকার আন্দোলন, দরকার ত্যাগ, দরকার শোনিত। তাই একুশে ফেব্রুয়ারী পবিত্র দিনটি হয়ে রইলো বাঙালীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল, জাতীয়-চৈতন্য যার উৎস।

ঢাকার সেই পবিত্র তীর্থস্থান, যেখানে জঙ্গীশাহীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল উনিশটি তাজা প্রাণ, সেই স্থানটি এখন শহীদ-তীর্থ। ছাত্রেরাই সেখানে নির্মাণ করেছে শহীদ বেদী। বুকের পাঁজরে যত ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ছিল, তা দিয়ে নির্মিত বেদীর পাদদেশে রক্তের আখরে লিখেছে, "তোমাদের ভুলিনি, ভুলবো না।"

কিন্তু অনেকেই জানেন না, ভাষা আন্দোলনের শহীদ আবুল বরকত আমাদের এপার বাংলার ছেলে। মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার বাবলা গ্রামে উনিশ শো তিরিশ সালে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বরকত। ওই গ্রামে যেতে হলে নামতে হবে সালার স্টেশনে, সেখান থেকে তিন মাইল দূরে বাবলা গ্রাম। গরুর গাড়ী বা হাঁটা পথে যাওয়া যায় সেখানে। পাশের গ্রামের তালিমপুরের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল বরকত। উনিশ শো বাহান্ন সালে সে ছিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। একুশে ফেব্রুয়ারী সে হল শহীদ।

সেই দিনটির স্মরণে বরকতের মা গ্রামে তাঁর বাড়ীর পাশে একটি শহীদ বেদী নির্মাণ করেছেন। প্রতি বছর, একুশে ফেবরুয়ারী সেই শহীদ বেদীতে তিনি দেন মালা, দেন ফুল, দেন ধূপ। আর প্রত্যেক-দিন ভোরের প্রথম শিশির বিন্দু করে তার বন্দনা, সূর্যোদয়ের প্রথম কনকরেখা করে তাকে আলিঙ্গন, গোধূলির আকাশ করে তাকে আরতি, ঘনশ্যাম দুর্ব্বাদল লুটিয়ে পড়ে করে তার অঙ্গ মার্জনা। আর রাত্রি যখন গভীর হয়, পৃথিবী যখন নিস্তব্ধ হয়, তখন সেই বেদীর বক্ষের তলা থেকে শোনা যায় আকুল করা গান, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আ মরি বাংলা ভাষা......."

তখন সেই তরুণপ্রাণের বুকে পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে তাজা লাল রক্তে রাঙানো ফুলের স্তবক ঝরে পড়তে থাকে টুপ্ টুপ্ করে এক নাগাড়ে আর মাধবিকা তখন দূর দিগন্তে ছড়াতে থাকে তারই সৌরভ। অপূর্ব সেই সুবাস বিলাতে থাকে বরকতের পুষ্পিত হৃদয়ের মর্ম্মধ্বনি।

বর্তমান আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি

রণাঙ্গনে

স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র আজ বজ্র-দীপ্ত কণ্ঠে শেকল ভাঙার বন্দনা করেঃ তার মন্ত্র হল, শেখ মুজিবর স্বাধীন, তিনি আছেন বহাল তবিয়তে। তার জন্য নেই কোন চিন্তা, নেই কোন উদ্বেগ। দেশে দেশে তাঁর ঘর পাতা আছে, যেখানেই তিনি যাবেন সেখানেই পাবেন জনগণের রাজমুকুট। তাছাড়া পৃথিবীর কোন তাকৎ নেই, যাঁরা মুজিবরের কণ্ঠ করে রুদ্ধ, তাঁকে করে অবরুদ্ধ।

স্বাধীন বাংলার মুক্তাঞ্চল থেকে এই গীতি বন্দনায় একটা কারণ আছে। এই ঘোষণার কিছুক্ষণ আগে করাচীর বেতার কেন্দ্র করে এক মিথ্যার বেসাতি, বলে, "শের-ই বঙ্গালকে পুরেছে তাঁরা খাঁচায়, ভেঙেছে তাঁর দাত। আর পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থা? আল্লার কসম খেয়ে বলছি, 'সম্পূর্ণ সুস্থ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নেই কোন গণ্ডগোল, সব কিছু প্রাণের গতিতে দীপ্ত ও চঞ্চল।"

তার পরমূহূর্তেই গো পন কেন্দ্র থেকে ভেসে এলো কণ্ঠস্বর, শোনানো হল মুজিবরের বাণী, আমি আছি, আমি থাকবো। আমি আছি চট্টগ্রামে। স্বাধীন বাংলার মুক্তি ফৌজ দখল করেছে কুমিল্লা। এগিয়ে চলেছে অকুতোভয়ে মুক্তি পথের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, দখল করতে চলেছে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম এখন সম্পূর্ণ বাঙালী জওয়ানদের করায়ত্তে। অতএব, কুছ পরোয়া নেই, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। কিন্তু বন্ধুগণ, সাবধান! পাকিস্থানী হানাদারেরা এখন বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে দিতে চাইছে গা ঢাকা, আনতে চাইছে অরাজকতা, করতে চাইছে বিশৃঙ্খলা। খুঁজে এদের বার করতে-ই হবে, নিয়ে যেতে হবে কবরস্থানে।"

গোপন বেতার কেন্দ্র আরো জানান, "মরিয়া হয়ে উঠেছে ইয়াহিয়ার শক্ত থাবা। বিমান থেকে সুরু করেছে তারা বোমা-বর্ষণ। বীরত্বের আস্ফালন দেখাচ্ছে তারা ট্যাঙ্ক দিয়ে, বোমারু বিমান দিয়ে। কিন্তু বাংলা দেশের লক্ষ্য, স্বাধীনতা। সেই রক্ত আখরে লেখা বুকের তপ্ত ভাষাকে কেমন করে করবে স্তব্ধ? বোমা দিয়ে, ট্যাঙ্ক দিয়ে হানাদারেরা করবে হয়রানি?

তা হয়রানি করবার মত ক্ষমতা আছে বৈকি! আছে তাদের হাতে অস্ত্র শস্ত্র, আছে গোলা বারুদ, আছে, ট্যাঙ্ক, কামান, আছে বিমান, আছে জঙ্গী সৈন্য-সামন্ত, আছে আরো কত কি!

কিন্তু খবর যা আসছে বিভিন্ন বিশ্বস্ত মহল থেকে, তাতে জানা যাচ্ছে: পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনী এঁটে উঠতে পারছে না জওয়ানদের সংগে। একটি পাঞ্জাবী রেজিমেন্ট ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এদিকে জবর খবর, বালুচিস্তান আর পাখতুনিস্তানের সেনাবাহিনী বাঙলার এই যুক্তি সংগ্রামের মানসিক শরিক হয়ে উঠেছেন। তারা বালুচবাহিনীর কর্তাদের গায়ে ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে দিয়ে হুঁসিয়ারী দিয়েছেন, সাবধান, নিরস্ত্র বাঙালীর উপর গুলি বর্ষণ চললে তার ফল ভোগ করতে হবে।

তাই পাকিস্তানের জঙ্গী বাহিনী বে-সামাল হয়ে পড়েছেন বোমা ফেলছেন তারা ঢাকায়, বোমা ফেলছেন তাঁরা খুলনায়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তারা আমদানি করছে একের পর এক হানাদারকে। তারা রাস্তায় রাস্তায় নামিয়েছে ট্যাঙ্ক, আগুনের চেয়েও নির্মম ও ভয়ংকর হয়ে তোপের মুখে ছুটছে গোলা।

কত হতাহত? সে-কথা বলা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কিন্তু পাকিস্তানের নরকের গুণ্ডাবাহিনীর হাতে আত্মাহুতি দিয়েছে, শিশু, নারী, বৃদ্ধা, যুবতী-ছাত্র, বাদ পড়েনি কেউ। কুৎসিত বীভৎস সেই নরমেধ যজ্ঞের ভয়াবহ লীলা। কিন্তু ওদের পৈশাচিক বুক নরহত্যার

উৎসবে মেতে উঠতে কাঁপে নি এতটুকুও। হৃদয়ের কোন কারবার নেই সেখানে।

কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জন-গণ-মন-অধিনায়ক মুজিবর সকলকে দিয়েছেন, অভয় দিয়েছেন আশ্বাস। 'ভয় নাই তোর ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' শুক্রবার তিনি বলেছেন, দু' একদিনের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী বাংলা দেশের উজ্জ্বল ললাটে শোভা পাবে। জয়-বাংলা ফৌজের মেজর জিয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে দীপ্তকণ্ঠে বলেছেন, বাংলা দেশের মুক্তি আসবে কয়েক দিনের মধ্যেই।

তবু, এই লড়াই যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, হয় রক্তাক্ত, তাকে মাথায় পেতে নেবে স্বাধীনতাকামী সাতকোটি মুক্তিপাগল জনগণ।

অপূর্ব দক্ষতায় একটির পর একটি ব্যাটিং করে চলেছেন শের-ই বঙ্গাল মুজিবর রহমান ও সাতকোটি জনগণের মুক্তি ফৌজ। এখনো রয়েছেন অপরাজেয়, এখনো রয়েছেন নট আউট। তাই তিনি থাকবেন চিরকাল। কারণ, পূর্ববঙ্গের মানুষের ঐক্য-সঞ্জীবনীতে তিনি এনেছেন নূতন প্রাণ, নূতন চেতনা, নূতন দিনের আশার সূর্য, যা কখনো অস্ত যাবে না। জনগণকে দিয়েছেন তিনি বেগ, এনেছেন আবেগ। ইতিহাসের যে রথ-চক্র থেমে গিয়েছিল, সেই রথচক্রের চালক হচ্ছে মুজিবর, আর তার চালিকা শক্তি কোটি কোটি জনগণ।

একটির পর একটি রান, রানের পর রান। অদ্ভুত তাঁর বিক্রম, অমিত তাঁর তেজ, অপূর্ব তাঁর দক্ষতা। কখনো বাউণ্ডারী মারছেন, কখনো দেখাচ্ছেন মারের দুর্ধর্ষ কৌশল।

সেই চোস্ত মারের মারে, বাউণ্ডারীর বাউণ্ডারীতে পশ্চিম পাকিস্তানের খেলোয়াড়েরা বোধ করছেন অসহায়, হয়ে পড়ছেন বিপর্যস্ত।

জয়ের নেইকো কোন আশা। তাই হারের এমন সর্বনেশে

চেহারা দেখে হয়ে উঠেছেন তাঁরা মরিয়া, হয়ে উঠেছেন উন্মাদ। পশ্চিম পাকিস্তানের কোঠায় এখনো ওঠে নি কোন রান। মুজিবরের চোস্ত মারের চোটে এঁটে উঠতে পারছেন না কেউ। তাই তাঁরা দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটছেন, লুটিয়ে পড়ছেন মাঠের এপাশে, ওপাশে। পশ্চিম পাকিস্তানের স্কোরবোর্ড শূন্য, ফাঁকা, বিবর্ণ। মুখে তার কালি, চোখে তার জল।

অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন যে, ফিল্ডেং সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন তাঁরা থরথরিয়ে। কাঁপছেন ইয়াহিয়া ও তাঁর ব্যাটসম্যান ফৌজী বাহিনী। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি, অবস্থা তাঁদের এমনই বেগতিক।

কিন্তু মুজিবর বলছেন, দোস্ত, এখনো খেল দেখলে কি? এখন সবে তোমাদের কলির সন্ধ্যা। সবে আরম্ভ, অপেক্ষা করো। তোমাদের একের পর এক কেমন রান আউট করি, ধরাশায়ী করি, সেই খেল এখনো হয় নি আরম্ভ। একটি রানও উঠবে না তোমাদের কোঠায়, শূন্য হাতে, শূন্য মনে যেতে হবে ফিরে। তোমাদের ফিল্ডিং-এ উড়বে ধূলো, ঝরবে বালি। হাসি পাচ্ছে শুধু আমার এই কথা ভেবে, যারা প্যান্ট-ই ভালোভাবে পরতে পারে না, ধরতে জানে না উইকেট, তাঁদের সংগে কি খেল খেলবো! বীরের সংগে বীরেরাই করে যুদ্ধ, খেলোয়াড়ের সংগে করে খেলোয়াড়। কিন্তু তোমরা কাপুরুষ, খেলোয়াড়ী মনোভাব নেই তোমাদের স্বভাব-চরিত্রে। জুজুর ভয়ে যাদের প্যান্ট খুলে যায়, হৃৎপিণ্ড যায় শুকিয়ে, তাদের সংগে করবো কি খেল? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে মন না-পসন্দ্‌। তবু ধরলে আব্দার, মানা করেছিলাম অনেক, ভালো পরামর্শ দিয়েছিলাম বিস্তর। কিন্তু বুড়ো খোকারা দিলে না সে-কথায় কান। দেখালে বিরত্বের অনেক শূন্য আস্ফালন। তাই তাদের একটু শিক্ষা দিয়ে চোখ কান খোলাতে আমার এই ক্ষুদ্র আয়োজন।

কিন্তু ক্ষুদ্র আয়োজন দেখে স্তম্ভিত বিশ্ববাসী। এই যদি ক্ষুদ্র

আয়োজনের চেহারা হয়, তাহলে বৃহৎ আয়োজনের চেহারা কেমন হবে, তা যে কল্পনাও করা যায় না। এই ক্ষুদ্র আয়োজনের ঘটনাই পৃথিবীর অনেক নাক সিটকানো কাগজেও বেরুচ্ছে অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রথম পাতার হেডিং-এর জায়গা জুড়ে। বেরুচ্ছে তাঁর কথা, বেরুচ্ছে তাঁর আলোচনা, বেরুচ্ছে তাঁর ছবি। সে এক এলাহি কাণ্ড! সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে, সকলের মুখে তাঁর বন্দনা-গীতি, সাবাস মুজিবর! রাজনৈতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে তুমি যুগ যুগ জিও, যুগ যুগ জিও—

সেই মারের খেলাই আরম্ভ হয়েছে ঢাকা, খুলনা, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, যশোর, চট্টগ্রাম,—গোটা পূর্ববাংলায় জয় বাংলার। সেই মারের খেলা কেমন, তার বিবরণী সংগ্রহ করেছি আমার প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে গিয়ে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, বাকী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধু ও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে।

যশোরের খবর কি? এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখের খবর ছিল যশোর জ্বলছে। জ্বলছে দাউ দাউ করে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষের নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছে এরা। একের পর এক বিমান থেকে নামতে থাকে ছত্রী সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র। তারপর চলতে থাকে বোমাবাজি। এমন কি খালিসপুরের একটি চটকল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় জঙ্গীবাহিনী।

কিন্তু জল্লাদেরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দেখতে পায় নি, পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, এই ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই প্রবল হয়ে উঠেছে সৃষ্টির নতুন যুগের অফুরন্ত সম্ভাবনা। প্রথম দিন তারা পুড়িয়েছে যশোরকে। কিন্তু পরের দিন বীর জওয়ানেরা বিপুল বিক্রমে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করলে, ইয়াহিয়ার গুণ্ডাবাহিনী পালাবার পথ খুঁজে পায় না। ভয়ঙ্কর মারের চোটে চোখে তারা অন্ধকার ছাখে। মুজিবর বাহিনী 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে ক্যান্টনমেন্ট নিজেদের দখলে নিয়ে আসে।

ক্যান্টনমেন্টে একটি পুরো ব্রিগেড সৈন্য মোতায়েন ছিল। তারা পালিয়ে গেছে। কিন্তু নিয়ে যেতে পারে নি অস্ত্রশস্ত্র, খাবার দাবার, আগে বহু কষ্টে পাওয়া প্রাণটাই বাঁচুক তারপর কা তব কান্তা…। মুক্তি বাহিনী সেগুলি দখল করে নিয়েছে। কয়েক দিনের যুদ্ধের উপকরণের কোন অভাব হবে না। নাকের বদলে নরুন নয়, নাকের বদলে নাকই পেয়েছে জয় বাংলা বাহিনী।

কিন্তু নষ্টামি করা যাদের স্বভাব, তারা কি এত শীঘ্র ভদ্র পথ বেছে নেবে? ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে সৈন্যরা যশোর-কুষ্টিয়া রোড ধরে ব্যাপক সংখ্যায় কুষ্টিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঝিনাইদহের ছ'মাইল দক্ষিণে মুক্তিফৌজ আবার পাকড়াও করে তাদের গতিরোধ করে। সারাদিন ধরে সেখানে চলতে থাকে প্রচণ্ড লড়াই।

বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে টিকে উঠতে না পেরে এবার চরবৃত্তি আরম্ভ, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার এই তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাদের সন্ধান করছে।

কুষ্টিয়া শহর চারদিন যাবৎ পুরোপুরি মুক্তিফৌজের দখলে রয়েছে। পাকিস্তানী-সৈন্যবাহিনী সেখানে একেবারে খতম হয়ে গেছে।

এই শহর পুনর্দখল করে নেবার চেষ্টায় গতকাল বিকেলে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে এক অভিযান সুরু করেছিল। প্রায় ৪৫টি জীপের কনভয়ে তারা যশোর-কুষ্টিয়া সড়ক ধরে অগ্রসর হয়।

ঝিনাইদহের মাইল ছয়েক দক্ষিণ ঐ কনভয়ে মুক্তি বাহিনীর কাছ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। প্রচণ্ড প্রতিরোধে তাদের আক্রমণের প্রথম ধাক্কাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে মুক্তিফৌজ সাতখানি জীপ দখল করে নেয়।

ঝিনাইদহের বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে কুষ্টিয়া থেকে মুক্তি

ফৌজের একটি বাহিনীকে পাঠানো হয়। তারপর মিলিত উদ্যোগে তারা হানাদার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা রাত ধরে তাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতি-আক্রমণের মুখে হানাদাররা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত যশোর ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে।

যশোর ছাউনিতে পাক ফৌজকে বন্দী রেখে এই এলাকায় মোতায়েন মুক্তিফৌজ সময় বুঝে তা দখল করার জন্য সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এই ছাউনী পাক-ফৌজের হাতছাড়া হওয়া মানে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলায় মুজিব সরকারের নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথের শেষ কাঁটাটি অপসারিত হওয়া।

সেটা বুঝেই তারা এই এলাকাটিকে দখল করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই বারে বারে বেপরোয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এর উপর। কিন্তু মুক্তি বাহিনীর অসীম বীরত্বে এদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

আজ সকালে পাক ফৌজের একটি দল চাঁচড়া মোড়ের কাছে মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুজিবর বাহিনী প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে বীরপুরুষরা পশ্চাদ্‌পসরণ করে।

পালাবার আগে তারা তাদের কুকীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছে, শহরের আশেপাশে কিছু তাজা মা-ন ফেলে। মুক্তিফৌজের গতি-বিলম্বিত করার মতলবেই তাদের এই শয়তানী, এ কথা বেশ বোঝা যায়।

এদিকে মুক্ত যশোর শহরে শত্রুচর ও সমাজবিরোধীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুক্তি- স্থ সেখানে সান্ধ্য আইন বলবৎ করেছে।

মুক্তিফৌজের প্রধান কয়েকজন ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়দের যশোর ছাউনীতে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু জঙ্গীবাহিনীকে তাঁরা

কাঁচকলা দেখাতে দেখাতে খুশ্ মেজাজে ফিরে এসেছেন নিরাপদ স্থানে।

যশোর সেক্টারে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একটি বাহিনীর পরিচালনায় মুক্তিফৌজ লড়াই করছে। তাদের পাশে রয়েছে পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার ও স্বেচ্ছাসেবকরা। উইং কম্যাণ্ডার ওসমান এই এলাকায় মুক্তিফৌজের অধিনায়ক। সেক্টার কম্যাণ্ডার ছিল এক পশ্চিম পাকিস্তানী। ব্যাটা হয় ফেরার, নয়ত পটল তুলেছে।

'যশোর ছাউনীতে যে-সব চমুরেরা শয়তানী চালাবার চেষ্টা করেছে তার মধ্যে রয়েছে পাক স্থলবাহিনীর ১০৭ নম্বর ব্রিগেড। ফার্ষ্ট ইষ্টবেঙ্গল ব্যাটালিয়ান, পঁচিশ ও ছাব্বিশ বালুচ ব্যাটালিয়ান, ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং থার্ড ইনফ্যান্টি ব্যাটালিয়ান—এই নিয়ে তৈরি ১০৭ নম্বর ব্রিগেড।

ফার্ষ্ট ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট পুরোপুরি বেঁকে বসেছে—তাঁরা পিণ্ডীর হুকুম মানতে নারাজ। এটা বোঝার পরই ছাউনীতে তাদের ঘেরাও করে হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়। এই রেজিমেণ্টেরই এক কোম্পানী অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশজন জওয়ানকে ঘিরে কেবল পাক ফৌজ হত্যা করে।

মুক্তিফৌজেরা হাত গুটিয়ে বসে ইয়াহিয়ার পরিষদ বর্গের এই কার্য-কলাপ শুধু দেখছিল নাকি? মারের বদলা মার, খুনের বদলা খুন, আর কোন দয়া কিংবা অনুগ্রহ নয়। এবার বদলা নেবার পালা। মুক্তিফৌজ বদলা নেয় শহরে। প্রথম আক্রমণের সুবিধা নিয়ে পাক বাহিনী শহরে ঢুকে আসে এবং টেলিফোন একসচেঞ্জ, ডাক-তার অফিস ও আরও দুটি উঁচু বাড়িতে ঘাঁটি গেড়ে বসে।

পঁচিশ থেকে আঠাশে মার্চ পর্যন্ত এই রণাঙ্গণে পাক বাহিনীর পৌষ মাসের পালা। প্রাথমিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে মুক্তিফৌজ সুরু করে পাল্টা মার। প্রবল প্রতিরোধে পাক ফৌজ হটে যায়,

আশ্রয় নেয় ক্যান্টনমেণ্টে। শহরে ঐ চারটি চৌকির পাক ফৌজ খতম হয়ে যায়।

তার পরই চাঁচড়ার মোড় এবং নিউ সেটলার্স লাইনের কাছে মুক্তিফৌজ ব্যারিকেড বানিয়ে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলো। এই প্রতিরোধ পাক বাহিনী প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিল।

শক্তিশালী ও ভারী আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পাক বাহিনী যশোর ছাউনীর গর্তে আশ্রয় নেয়।

তাদের মদত দেওয়ার জন্য দুখানি বিমান ছাউনীর লাগোয়া বিমানঘাটিতে নামার চেষ্টা করে। কিন্তু মুক্তিফৌজ প্রবল গোলাবর্ষণ সুরু করলে তারা সেখানে না নেমেই ফিরে যায়।

যশোহর হাতছাড়া, এটা কেমন করে বরদাস্ত করবে জঙ্গীপাক বাহিনী। তাই যশোহর শহরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য পাকিস্তানী বাহিনী রাত্রি থেকে মরিয়া হয়ে মরণপণ লড়াই আরম্ভ করেছে। ক্যান্টনমেণ্ট থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা ৬ পাউণ্ডের গোলাবর্ষণ ও মর্টার ছুড়ে চাঁচড়া মোড়ের কাছে এগ্রিকালচার বিল্ডিংয়ের দখল নিয়েছে। কিন্তু আর নয়, অনেক দূর তোমাদের এগুতে দেওয়া হয়েছে। বাংলা দেশের মুক্তিফৌজ গুরুত্বপূর্ণ চাঁচড়া মোড়ের উপর থেকে তাঁদের আধিপত্য কেড়ে নিল। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীকে যশোহর শহরের ভিতরে আর এগোতে দেয় নি। তারা পাকিস্তানী বাহিনীকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে খুলনার দিকে রূপদিয়া গ্রাম পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছে।

চাঁচড়া মোড়ে গতকাল রাত্রি থেকে প্রচণ্ড লড়াইয়ের ফলে ঝিকিরগাছা ঘাট থেকে যশোহর শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানী বাহিনী বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত একদিকে ঢাকা, যশোহর, খুলনা রোড আর অন্যদিকে যশোহর শহর ঝিকরগাছা রোড পর্যন্ত কোন রকমে সলতের নিবু নিবু পলতের মত জ্বলতে থাকে।

অর্ধ-মৃত পশুর মত মাঝে মাঝে এক এক জায়গা কামড় দিতে থাকে, চেষ্টা করে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে।

পাকিস্তানী বাহিনী গত তিন দিন ক্যাণ্টনমেণ্টে নাকানি-চে কানি খাবার পর গত রাত্রিতে অন্ধকার জঠোর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কারণ খাবার নেই, সব রসদ ফুরিয়ে গেছে। না-খেয়ে এবার মরতে হবে। অগ্রবর্তী ঘাঁটির মুক্তিফৌজের হাবিলদার ওদুদ বলেন যে, খুলনা শহরে প্রায় আড়াইশ' পাকিস্তানী সৈন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের খাবার ও রসদ ফুরিয়ে গেছে এবং তাদের কাছ থেকে এস-ও-এস পাবার পর যশোর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে পাকিস্তান বাহিনীর একটি দল বেরিয়ে পড়ে। তাদের মূল লক্ষ্য খুলনা শহর থেকে অবরুদ্ধ পাক সৈনিকদের উদ্ধার করা।

এরপর-ই যশোরে আগুন জ্বলতে লাগলো। যখন হেরে যাবে, তখন আগুন জ্বালাবে কাউকে নিস্তার দেবে না, এই হল বর্বরশাহীর মনুষ্যত্বহীন বিবেকশূন্য নীতি। তাই তারা আগুন জ্বালালো। নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পর্যুদস্ত, বিপর্যস্ত পাক দখলদারেরা যশোরে এখন বেপরোয়াভাবে হত্যালীলা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ চালাচ্ছে। কিন্তু বীর জওয়ানেরাও নিশ্চুপ হয়ে বসে নেই। স্বাধীনতার জন্য দিতে হবে অনেক মূল্য, অনেক প্রাণ, কণ্টকাকীর্ণ পথকে করতে হবে বরণ। জওয়ানেরা তাই ভীত নয়। মুক্তিফৌজ মুক্তাঞ্চলে নিজেদের শক্তি সংহত করে প্রচণ্ডতর আঘাত হানার জন্য তৈরী হল। বীর মুজাহীদদের উপর আঘাত হানার জন্য যশোর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে জঙ্গীশাহী চার পাশে সমানে ২৫ পাউণ্ডার কামানের গোলা ছুঁড়ছে। খালি বাড়ীও তাদের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। যেখানে পারছে, সেখানেই রেখে যাচ্ছে কলঙ্ক-নিধিরা তাদের অপকর্মের স্মারক। এমন কি, নিরস্ত্র গৃহীও চোখের সামনে পড়লে চালাচ্ছে বেপরোয়া গুলি।

নিরীহ শান্ত মানুষেরা দলে দলে এই গুণ্ডা-বাহিনী হাত থেকে

রক্ষা পাবার জন্য ঝিকরগাছা ঘাট, সিংজুলী, চৌগাছা ইত্যাদি এলাকা থেকে তাঁদের ভিটা-মাটি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

রাত থেকে সৈন্যরা আবার উন্মত্ত হয়ে ওঠে। যশোর শহরের চারপাশে বেপরোয়া অত্যাচার শুরু করে দেয়। টেলিফোন ভবনটি কামান দেগে উড়িয়ে দেয়। পোষ্ট অফিসটি ধ্বংস করে। গতকাল সারা রাত ধরে যশোরে আগুন জ্বলতে থাকে। যশোহর পুড়িয়ে দিয়েও সৈন্যদের শান্তি নেই। আশপাশের গ্রামগুলিও লুঠ করে, গৃহে গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাক দখলদাররা ঢাকা-খুলনা-যশোর রোডের সংযোগস্থল দখল করে নিয়ে তিনটি জেলাতেই মুক্তিফৌজেরা যাতে এই বর্বর কামুকদের উচিত শাস্তি দিতে না-পারে, সেজন্য যাতায়াতের পথ বন্ধ করবার জন্য মাথা খুঁড়ছে।

এদিকে খুলনার ফুলতলা আর ডুমুরিয়া, যা উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি ছিল, অনেক কষ্টে, বহু প্রাণের বিনিময়ে পাক-সৈন্যরা তা আজ দখলে আনলো।

কিন্তু অংশ দখল করুক, ক্ষতি নেই। হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা যাবে সময় ও সুযোগ এলে-ই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, সকলের মুখে এখন 'জয় বাংলা'র মন্ত্রোচ্চারণ। সকলেই এখন এক মন্ত্রে দীক্ষিত পাক হানাদারদের তাড়াতে হবে, যে কোন মূল্যেই হোক দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করতে হবে। পূবের আকাশ নতুন দিনের সূর্যের কিরণচ্ছটায় ঝলমল করছে। 'ভয় নাই, ওরে তোর ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' এই হল সাড়ে সাত কোটি জাতির মুক্তি-মন্ত্র।

তাই কোন সামরিক ঐতিহ্য না থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন জওয়ানেরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র তাদের মূলধন, মনবল। যশোরে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ কিছু পাক সৈন্য খতম করেছে।

খাদ্য গুদামগুলি পাক হানাদাররা লুটপাট করে নেওয়ায় যশোহরে এখন খাদ্যভাব দেখা দিয়েছে। দ্রব্যমূল্যও দিন দিনই বেড়ে

চলেছে। বেশ কিছুদিন ধরে বাজারহাট-ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ। চাকুরীজীবিরা মাস মাস মাহিনা পাননি। তবু কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। বীর মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত। প্রাণ থাকতে দেব না তোমাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে, এই তাঁদের কঠিন পণ। তারই প্রস্তুতি সুরু করে দিয়েছে তাঁরা। তারই প্রস্তুতি দেখে এলাম আমি যশোর সীমান্তে।

• চুপটি করে জঙ্গীবাহিনী পড়ে আছে যশোর ক্যান্টনমেন্টের গোড়া আঁকড়িয়ে। শুধু একটিই রণবাহিনী নয়, আরেকটি আশ্রয় নিয়েছেন কৃষিদপ্তরের একটি বাড়ীতে। পূব দিয়ে যশোর সহরে ঢুকতে হলে চাঁচড়া মোড়ে আসতে হবে। এই পথ ঢাকা ও খুলনার যাবার গুরুত্বপূর্ণ মোড়। ক রণ, ঢাকা ও খুলনা যেতে হলে এই পথকে আগে স্বাগত জানাতে হবে। কাজেই এই রাস্তাটির গুরুত্ব অশেষ, এই পথকে আগলে থাকতে পারলে ঢাকা ও খুলনায় প্রবেশ করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

তাই আগে আক্রমণ করতে হবে এখানে, এই চাঁচড়া মোড় ও ক্যান্টনমেন্ট। এদিকে যশোরের ভিতরটাকে শয়তানদের হাত থেকে মুক্ত করে রেখেছে বীর সেনানীরা। কিন্তু আগে গোড়াকে বাঁচাতে হবে, তারপর আগা। গোড়া থাকলেই আগা থাকবে।

কিন্তু কিভাবে তাঁরা আক্রমণ করবেন, কেমন করে গড়ে তুলবেন ব্যূহ বেষ্টনী। সেই পরিকল্পনাও তৈরী। এখন শুধু অপেক্ষা তাদের, আদেশ পেলেই বীরবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বেন দুর্ধর্ষ বেগে ক্যান্টনমেন্টের দখলদারী ফৌজের উপর। পাঁচ দিক থেকে কদম বাড়িয়ে এগিয়ে আসবেন নওজয়ানেরা। তাদের হাতে রণ-সম্ভারের অভাব নেই। কেউ নিয়েছেন রাইফেল, কেউ নিয়েছেন মেসিনগান, কেউ নিয়েছেন ছোট বড় মাঝারি গোছের মরটার, কারুর হাতে আবার হাল্কা ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র।

নিখুঁত নিয়মে এগিয়ে চলেছে কাজ। সকলের মুখে চোখে উপছে পড়ছে নূতন দিনের সূর্য।

কিন্তু সব সময় যারা ভয়ে সন্ত্রস্ত, থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে, কি হয়, কি হয়, আজ রাতেই বুঝি জান চলে যায়, এমন একটা ভাব, তাদের হাতে কি মজুদ? গোটা ক্যান্টনমেণ্ট গিসগিস করছে শ-পাঁচেক জঙ্গীবাহিনীতে। আর হাতের অস্ত্র? সে এক এলাহি ব্যাপার! একেবারে যাকে বলে রাজকীয় আয়োজন! আছে মেসিনগান, তাও সর্বাধুনিক ও চীনামেড, আছে দূরপাল্লার রাইফেল, তাও স্বয়ংক্রিয়, আছে বৃটিশ ও মারকিন মিলিমিটার, তাও একাশি, আছে গুলি, গোলা, আগ্নেয়াস্ত্র, তাও অফুরান। আর কামান? তাও আছে বৈকি? দরকার হলে কামান দেগে মশা মারবে।

তার পর-দিন, সারাদিন ধরে চলে বোমা বর্ষণ, চালায় শত্রুরা। কিন্তু নাহি ভয়, হবে, হবে জয়। প্রচণ্ড বাধাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে ক্যান্টনমেণ্টের দিকে। তাও কিভাবে? কখনো বুকে হেঁটে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে। কিন্তু ক্যান্টনমেণ্ট চাই, একমাত্র লক্ষ্য, ক্যান্টনমেণ্ট। তাঁদেরও মেসিন-গান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাই গুলী বেরিয়ে আসছে। দু-পক্ষেরই চলেছে তুমুল হানাহানি। কামান আর বারুদ আকাশ হয়ে উঠতে লাগলো আঁধার, বাতাস হল ভারী, গোলা গুলির বিকট শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়।

এদিকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগলো খাঁ বাহিনী। চাই হেল্প, চাই এয়ার সাপোর্ট, না হলে অবস্থা হবে সঙ্গীন। দোস্তদের ডাক শুনে চারটি স্যাবার জেট ছুটে আসে। নির্বিচারে সুরু করে দেয় এলোপাথাড়ি বোমা বর্ষণ। আর এদিকে স্থলবাহিনী ফৌজ চালিয়ে যায় কামান আর মরটার।

ওদের কামানের গোলায় ঝাঁজরা হয়ে যায় যশোর আদালত ভবনের বুক। আর্তনাদ করে আছড়ে পড়তে থাকে একটির পর

একটি বাড়ী যশোর নগর ধাম পরিণত হয় শ্মশানের শূন্য পুরীতে।

কিন্তু শেষ এখানেই নয়। মানুষ যখন পশু হয়, তখন তার চেহারাও হয় ভয়ংকর। বিকেলের সূর্য পশ্চিম দিকে গা এলাতে না এলাতেই খাঁ বাহিনী মেতে ওঠে নারকীয় উৎসবে। বেরিয়ে পড়ে ওরা গ্রামে, চালায় নির্বিচার লুঠ, অত্যাচার, মাতে হত্যা-কাণ্ডে বুলেট বিদ্ধ শবের মিছিল, সংখ্যায় বেশ কয়েক শো, ভাসতে থাকে মুক্তেশ্বর খালে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত হল ঝিকরগাছা রণক্ষেত্র পর্যন্ত। কামান ও ছয় ইঞ্চি মটার নিয়ে বিরাট সংখ্যক সৈন্য সেদিন সূর্যোদয় ঘটবার আগেই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ চালালো। ফলে, বাংলা বাহিনী গ্রামটি ছেড়ে পিছনে সরে পড়ল। কিন্তু হঠবার আগে মেসিনগানের গুলিতে একশো জনের জান খতম করলো।

মালঞ্চ গ্রাম ছেড়ে দিয়ে মুক্তিফৌজ এখন একদিকে যশোর রোডের উপর লাউজানি লেভেল ক্রসিং গেটে এবং অন্য দিকে ঝিকরগাছা বাজারের উত্তর দিকে কপোতাক্ষ নদীর পুব পাড়ে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে 'ব্যাক টু দি ওয়াল' লড়াই আরম্ভ করেছে।

সকালের দিকে পাকিস্তানী বাহিনী যখন যশোহর রোড ধরে ঝিকরগাছার দিকে এগোচ্ছিল, সে সময় মুক্তিফৌজ লাউজানি লেভেল ক্রসিং গেট বরাবর মেসিনগান ও ৩ ইঞ্চির মর্টার দিয়ে পাক বাহিনীর আক্রমণ রোধ করে। কিন্তু পাক বাহিনী তখন যশোর রোডের উপর তাদের আর একটি দল রেখে উত্তর দিকে চষা মাঠের মধ্য দিয়ে কাটাখাল পেরিয়ে ঝিকরগাছা বাজারের উপর মর্টারে গোলা ছুঁড়তে আরম্ভ করে।

যশোরের সর্বশেষ খবর কি? সর্বশেষ খবর, অর্থাৎ চৌদ্দই এপ্রিল মুজিব বাহিনী যশোরের কর্তৃত্ব অনেকটা নিজের হাতে

নিয়ে আসেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন শুধু সময় আর সুযোগের। সেই সুযোগ তাঁরা পেলেন, হঠাৎ আরম্ভ হল দারুণ, বৃষ্টি, প্রচণ্ড ঝড়। খাঁ বাহিনী আরামে চিৎ হয়ে শুয়ে হেড়ে গলায় খুশ্ মেজাজে গান ধরেছিল। কিন্তু তাদের সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল। অতর্কিত আক্রমণে বেসামাল হয়ে গেল তারা। প্যাণ্টের বোতাম খোলা অবস্থায় তারা ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার শুরু করলো, আল্লা, বহুৎ পাপ করেছি, এবারের মত জানটা বাঁচিয়ে দাও।

কিন্তু খুনের জবাব খুন। পাঁচজন বেইমানকে বাংলা বাহিনী গোরস্থানে মুহূর্তের মধ্যে পাঠিয়ে দিল। পড়ি কি মরি করে রসদ, গোলা বারুদ ফেলে পালাতে থাকলো ওরা।

এই ঘটনার কেন্দ্রস্থান, যশোর থেকে বারো মাইল দূরে পালাগুড়িতে। বৃষ্টির তোড়ে পরিখাগুলি ভেসে যায়। সেখান থেকে ওরা পালিয়ে আশ্রয় নেয় মূল শিবিরে। মূল ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ায়, পরিখাগুলিতে রসদ জোগান যেতে পারছে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আল্লা ওদের ফাঁড়গুলো নেহাৎ কম মোটা করেন নি। সর্বনেশে ওদের ফাঁড়ের আগুন। সেই ফাঁড়ের আগুন মেটাতে তৈমুর লঙেরা বেরিয়ে পড়ে গ্রামে, লুঠ করে নিরীহ মানুষদের কষ্টার্জিত খাদ্য, ধরিয়ে দেয় আগুন, চালায় রাইফেল।

দিনাজপুরের আকাশে তিন দিন ছিল অরুণ-রাঙা প্রভাত। কিন্তু নয়ই এপ্রিল ভোর বেলা রংপুর জেলার সৈয়দপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের খাঁ-এর সৈন্য সামন্ত বীরত্বের আস্ফালন দেখানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে সহর দিনাজপুরের উপর।

রাত তখন অনেক। আকাশে দু'চারটি নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে নিষ্প্রাণ ভাবে। কিন্তু তারই মধ্যে ভেসে আসছে আওয়াজ, দুড়ুম, দাড়াম। দিনাজপুরের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে বারুদের গন্ধ। হতাহতের সংখ্যা? তা অনেক।

কিন্তু আগে থেকে কি বোঝা গিয়েছিল, ঝড় আসবে? না, আকাশ ছিল পরিষ্কার, বাতাস ছিল নির্মল। তার মধ্যেই অঘটন পটিয়সীদের এই কীর্তি। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পিল পিল করে ওরা বেরুতে থাকে। সামনে পিছনে, উর্দ্ধে অধে যা পায়, তাতেই নির্বিচারে লাগায় আগুন। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে করে দেয় ছাই। গ্রামবাসীদের অবস্থা কি? তাদের কি রেহাই আছে! তাদের উপরও চালাতে থাকে গোলা-গুলি।

বীরবাহিনীরা এদের চিরিবন্দরে বাধা দেয় প্রচণ্ড ভাবে। গতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে সেখান থেকেই একনাগাড়ে ছুঁড়তে থাকে তারা গোলা বারুদ।

অতঃপর দিনাজপুরের কি খবর? দিনাজপুরের আকাশে চোদ্দই এপ্রিল আবার দেখা যায় অরুণ-রাঙা প্রভাত। স্বাধীন, মুক্ত দিনাজপুর।

শ্রীহট্ট: মুক্ত শ্রীহট্ট, ছয়ই এপ্রিল জয় বাংলা বাহিনী পাক দস্যুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় শ্রীহট্ট। বোমায় বোমায় আকাশকে করে দিয়েছিল কালো, বারুদের গন্ধে বিষাক্ত। তবু, মুক্ত শ্রীহট্ট। এই শহরের পতনের অর্থ বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চল দক্ষিণে আর উত্তরে সিলেট—মুক্তিফৌজের দখলে এসে গেল। এর ঠিক পরেই ভারতের আসাম সীমান্ত। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, মৈমনসিং এবং শ্রীহট্ট জেলাগুলি। বাকি আছে শুধু ছাউনি এলাকা আর চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ।

না, মুক্ত নয়, শ্রীহট্ট। আবার পাক হানাদের বাহিনী দশ তারিখে শ্রীহট্টকে নিয়ে এলো নিজের কব্জায়। কিন্তু কি নির্লজ্জ ব্যভিচারিতায়, তা শুনলে তামাম দুনিয়া আঁৎকে উঠবে। শ্রীহট্ট শহর দখলে রাখার জন্য আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাক বাহিনার বিরুদ্ধে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুক্তিবাহিনী শুধু মনোবলে লড়াই করেছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শ্রীহট্ট শহর মোটামুটিভাবে মুক্তি-

যোদ্ধাদের হাতে ছিল। কিন্তু আগের দিন বিকাল থেকে হানাদারেরা হঠাৎ গোলাবৃষ্টি শুরু করে এবং ছলনার আশ্রয় নিয়ে আবার শ্রীহট্ট শহরে ঢুকে পড়ে। হানাদারদের এবারকার হীনতার কোন নজীর নেই। শহরে ঢোকার একমাত্র রাস্তা—সুরমা নদীর উপরে কিংস ব্রিজ। একদল অনিচ্ছুক অসহায় মহিলাকে ব্রীজের উপর সামনে রেখে হানাদাররা পিছন থেকে কামান দাগতে দাগতে শহরের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এ যেন শিখণ্ডীকে খাড়া রেখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলছে।

ক'দিন ধরেই হানাদারদের আশ্রয় ঘাঁটি শালটিকুরি বিমানঘাঁটিতে বিমানে অস্ত্র, খাদ্য, সৈন্য মজুদ করছিল। মুক্তিবাহিনী ওদের পিছনে ধাওয়া করলে সুরমা নদীর ওপারে গিয়ে ওইখানে ঘাঁটি বানায়। শহরে ঢোকার একমাত্র যোগসূত্র কিংস ব্রিজ।

নদীর ওপারে বসে হানাদাররা সময় নিচ্ছিল। গত মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শ্রীহট্ট শহর ও সন্নিহিত এলাকায় ওরা শুধু বোমাবর্ষণ করে। মাঝে মাঝে মেসিনগান থেকে চলতে থাকে গুলি। কিন্তু ঘরের শত্রু বিভীষণদের তো দেশে অভাব নেই, অভাব নেই মিরজাফরদের। এই আক্রমণে সেই বিশ্বাসঘাতকদের শয়তানী কাজ করছে বলে সামরিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস।

এত আঘাত সত্ত্বেও পাছাধানো এত সুবোধ বালক কেন, তা একটু ভাবিয়ে তোলে মুক্তিযোদ্ধাদের। কিন্তু ব্যাপারটা পরে দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে যায়।

জয়লাভের মরীচিকার পিছনে ছুটবার জন্য তারা কেমন কূট-কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে, যা আন্তর্জাতিক. যুদ্ধ-নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তার একটি কলঙ্কিত কাহিনী রেখে গেল শয়তানেরা।

ঐদিন সকালে হানাদারদের বিমানঘাঁটিতে একটি পরিবহণ বিমান এসে নামে। তখনো মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা সুরমা নদীর এপারে তীর বরাবর নানা জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। ওরা কিংস ব্রিজ

পাহারা দিচ্ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে একটানা মর্টারের গোলা ছুঁড়তে থাকে। তখনো হানাদাররা এক রকম নিশ্চুপ।

হঠাৎ বেলা তখন দুটো। পশ্চিম পাকবাহিনী গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করে। একজন মুক্তিযোদ্ধা বললেন, 'আমাদের গোলা গিয়ে ওদের বারুদঘরে পড়েছে—বিস্ফোরণ ঘটছে।' তখনি হানাদাররা মুক্তি-বাহিনীর গোলার আওতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যা কাজ করলো, তা পৈশাচিকতায় যেমন ভয়ংকর, নির্মমতায় তেমনি নির্লজ্জ।

সুকৌশল চক্রান্ত করে—একদল মহিলাকে কিংস ব্রিজের উপর ঠেলে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নরকের প্রহরীরা। নারী নারীই, চিরকালের তাঁরা শ্রদ্ধেয়। এঁদের উপর গুলি? দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন জয় বাংলা বাহিনী ঠিকই। কিন্তু নীতিকে, মনুষ্যত্বকে, মানবতাকে কখনো তাঁরা পরিহার করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। কারণ, এই যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ, নীতিহীনতার বিরুদ্ধে নীতির যুদ্ধ, আদর্শহীনতার বিরুদ্ধে আদর্শবাদের যুদ্ধ, মনুষ্যত্ব হীনতার বিরুদ্ধে মানবতার যুদ্ধ, বিবেকশূন্যতার বিরুদ্ধে বিবেকের যুদ্ধ। তাই তাঁরা গুলি বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। তারপর ব্রিজের ওপরে একপাল গরু উঠিয়ে দিল ওরা। তারপর এক উলঙ্গ একজন পাগল হেঁটে ব্রিজ পার হতে লাগল।

পাগলকে বাঁচানো গেল না। গুলি গিয়ে ওর গায়ে লাগল। এরকম গোলমেলে অবস্থায় একটি লালরঙের মোটরগাড়ি ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে গেল।

তারপরেই ঘটলো আশ্চর্য ব্যাপার। সেই লাল গাড়ী যেন সবুজ সংকেত দিল। গাড়িটি ওপারে গিয়ে পৌছুতেই পশ্চিম পাক সৈন্যরা ভারি কামান দাগতে শুরু করে দিল। ঐসব কামান বিমান-ঘাঁটির আশেপাশে বসানো ছিল।

নির্ভুলভাবে কামানের গোলা মুক্তিবাহিনীর সঠিক লক্ষ্যে এসে পড়তে লাগল। যেভাবেই হোক হানাদাররা মুক্তিবাহিনীর প্রকৃত অবস্থান জানতে পেরেছিল।

কিন্তু এত নির্ভুলভাবে কেমন করে ওরা গোলা-গুলি নিক্ষেপ করছিল, যদি আগে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক অবস্থান তারা জানতে না পেরে থাকবে? কি করে তা খবর পেল? গুপ্তচর মারফৎ পাক সৈন্যরা খবর পেয়েছে। তা না হলে এমন নির্ভুল-ভাবে বোমাবর্ষণ অসম্ভব। শ্রীহট্টের কয়েকজন অসামরিক কর্মচারী পশ্চিম পাকিস্তানীদের দিকে চলে গিয়েছে। এ কীর্তি তাদেরই। গুপ্তচররা খবর সংগ্রহ করছিল বলে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পাক সৈন্যরা চুপ করেছিল। লাল মোটর গাড়ির ব্রিজ পেরিয়ে ওপরে পৌঁছানো মাত্র পাক কামান থেকে গোলাবৃষ্টি শুরুর ঘটনাই ওদের এই কুকীর্তির রহস্য ফাঁস করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

কামান দাগতে দাগতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা কিংস ব্রিজ পেরোবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনজন দুঃসাহসী সামান্য হালকা মেসিনগান সম্বল করে কামানের গোলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হানাদারদের কয়েক ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখেন। ক্যাপটেন আজিজ জীবনকে পায়ের ভৃত্য করে ব্রিজের মুখে ছুটে যান। একজন নিহত মুক্তি-যোদ্ধার হাত থেকে হালকা মেশিনগান নিয়ে তিনি সোজাসুজি গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান বালগঞ্জ আওয়ামী লীগের সেকেরেটারি ও তাঁর একজন সহকর্মী। তিনজন মিলে দু' ঘণ্টার উপর হানাদারদের আটকে রাখেন। ততক্ষণে মুক্তিবাহিনী নিজেদের গুছিয়ে তোলেন। সামনে তখন আরেকটি রাত—আরেকটি যুদ্ধ।

মুক্ত শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট আবার খাঁ বাহিনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে মুজিব বাহিনী। কিন্তু পাক চমূরুরা তার শান্ত লালিত্যকে

একেবারে নষ্ট করে দিয়ে দিয়েছে। শহরটিকে এখন বলা চলে মৃতের দেশ। কামানের গোলাগুলিতে কত বাড়ী যে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, কত গ্রাম যে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তার কোন হিসেব নেই।

বিশদিনব্যাপী স্থায়ী এই যুদ্ধে কত লোক যে মারা গেছে, সে বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, শিশু থেকে আরম্ভ করে কিশোর, তরুণী কেউ বাদ পড়েনি বর্বর নাদিরশাহী বাহিনীর রক্ত-রঞ্জিত হাত থেকে।

তবু, মুক্ত শ্রীহট্ট। তবু, সকলে পুলকিত। টিককা খাঁ বাহিনীকে তাঁরা তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন। নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে পেরেছেন। এটা কি চাট্টিখানি কথা ?

কিন্তু অন্যান্য রণক্ষেত্রে কি চলেছে ? ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সেখানের খবর কি ? খবর কি রংপুর, রাজসাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও বরিশালের ? প্রায় প্রত্যেকটাতেই, একমাত্র কেন্দ্রিয় শহর ঢাকা বাদে, সবই মুজিবর সৈন্যের অনুকূলে। সব চেয়ে বড়ো কথা, গণ সমর্থন মুজিবরের দিকে। কারণ এ লড়াই তাদেরও লড়াই। যে সব জায়গা ওরা জোর করে গেড়ে বসে আছে, সেখান থেকে তাদের হটতে হবেই। এটা হল ইতিহাসের অমোঘ ও চূড়ান্ত রায়।

দেখিলাম বাংলার মুখ

আজ বাংলা দেশের হৃদয়কে একী রূপে প্রত্যক্ষ করলাম! সত্যি বলতে কি, জয় বাংলাকে কোন দিন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবো, এ ছিল আমার বিশ্বাসের বাইরে। সেই ঠুনকো বিশ্বাসকে আমি মনে মনে ধিক্কার দিলাম, তীব্র ভর্ৎসনা করলাম। যাকে তুমি ভালোবাসো, যে তোমার আত্মায় আছে, হৃদয়ে আছে, আলোতে আছে, বাতাসে আছে, তার দীর্ঘ অদর্শনের বিরহ মেনে নিলে কেমন করে। এই কি তোমার ভালোবাসা?

মনকে আমি বললাম, বাংলা দেশ, তোমাকে আমি ভালোবাসি ঠিক-ই। এতে কোন ফাঁকও নেই, ফাঁকি নেই। কিন্তু আমি তাকিয়েছিলাম নির্মম বাস্তবের দিকে। সেই নিষ্ঠুর অতি বাস্তব এ-পারে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে এবং ওপারে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে গতিরোধ করেছে। কিন্তু এভাবে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া দুই প্রান্তে দিলেও ফায়দা বিশেষ কিছু হয় নি। কারণ, মানুষের জীবনটা তো রাজনীতি নয়, আর তার মনটাও ভূগোল নয়। কাজেই কাঁটাতারের বেড়া দুটি মানুষকে পৃথক করবে কেমন করে? দেশ ভাগ করা সহজ, কিন্তু হৃদয় ভাগ করা সহজ নয়। অনেক প্রীতি, অনেক ভালোবাসা আর অনেক শ্রদ্ধার সেতুতে আত্মিক রাখী বন্ধন ঘটে, তাই তা অবিভাজ্য। কিন্তু যাতে নীতির বালাই নেই: বিবেকের প্রশ্ন নেই, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ নেই তাই রাজনীতি। রাজনীতি তাই ভাঙে আর হৃদয় মানুষকে গড়ে। তাই রাজনীতি যে করে তার কাছে হৃদয়নীতি থাকে সাত যোজন দূরে।

সাধারণ মানুষ রাজনীতি করে না। তাই মানুষের ডাক সাধারণ মানুষকে মনে জাগায় সাড়া। সে সেই ডাকে ছুটে যায়, করে তাকে আলিঙ্গন, নেয় তাকে বুকে তুলে।

আমার মত সাধারণ মানুষ, যারা মুক্তির চেয়ে হৃদয়, নীতির চেয়ে আবেগকে বেশী মূল্য দেয়, সেই মানুষের পূর্ব বাংলা স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে, এই অতি উজ্জ্বল বিস্ফোরণের খবর শুনে ধরে রাখতে পারি নি নিজেকে। যেদিন পূর্ববঙ্গে মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, তারপর দিন ই ছুটে গেছি কল-কল্লোলিত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গকে মুগ্ধ বিস্ময়ে অবলোকন করতে। ছুটে গেছি স্বাধীনতা সূর্যের তীর্থ গঙ্গাকে আমার নত মস্তক করতে ; 'আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু, বাংলা দেশের ধূলার তলে'।

তবু আমি গর্বিত, তবু আমার বুকটা অহংকারে স্ফীত। কেননা আমি জন্মেছি হেথা নয়, হোথা নয়, উভয় বাংলায়, অখণ্ড বাংলায়, খণ্ডিত এপার বাংলা, ওপার বাংলায় নয়। যদিও তখন আমার জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে নি, বুদ্ধির আলোয় জ্বলে নি চেতনার ছোঁয়াচ। মার বুকের পীযূষবিন্দু তখনও আমার দেহধারণের একমাত্র মূলধন। তবু আমি উল্লসিত, তবু আমি পুলকিত। কেননা প্রাক্ স্বাধীনতার আগে বাংলা দেশে জন্ম আমার। এ-কথা বলতে পারার সৌভাগ্যও অশেষ।

তাছাড়া নাই বা হলো পূর্ব বাংলা আমার জন্মভূমি। কিন্তু বাংলা দেশ তো আমাব জন্মভূমি। তাছাড়া আর কিছু, নয়, শুধু মাত্র একটা শব্দ, কিন্তু তার প্রভাব অসামান্য, তার ব্যঞ্জনা সুদূর প্রসারী। সেই শব্দ বাঙালী। এই শব্দটি অদ্ভুত এক অনুরণ তোলে আমা দর হৃদয়ে, আনে আবেগ, তোলে ঝংকার, ওঠে গান, বন্ধন করে একাগ্রতার। কি যে অপূর্ব অনুভূতি হয়, আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় দেহে মনে সর্বাঙ্গে, তা বোঝানো শক্ত। আমি বুঝি হৃদয়ের কোন সূক্ষ্মতম ব্যাপার, যা সপ্তসুরে বাঁধা, তাকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা কিংবা বিশ্লেষণ করা চলে না। কেন এই সংগীতের মালকোষ, কেন এই নামটি শুনলেই বুক করে ওঠে আনচান, তা কাউকে বোঝানো চলে না, নিজেকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়, উপলব্ধির আশ্চর্য স্বাদে

অবগাহন করতে হয়। যার এই চোখ নেই, হৃদয় নেই, তাকে আদাজল খেয়ে বোঝাতে আরম্ভ করলেও তাকে বোঝানো, শুধু গা দিয়ে ঘাম ঝরানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

কবিতা যেমন বোঝবার নয় বাজবার, বাঙালী শব্দটি তেমন-ই বোঝাবার নয়, বাজবার।

সেই বাজবার বাঙালী-কবিতায় আজ কি সুর উঠছে? বাংলার রক্তে আজ লেগেছে ফাগুনের আগুন। প্রত্যেকটি বাঙালী সাধারণত শান্ত সুরের কবি। তার মাঠ-ঘাট, শান্ত স্নিগ্ধ সবুজের ছায়া-ঘন প্রান্তর, পদ্মা মেঘনার অবিরত স্রোতধারা, গ্রাম্য মানুষের সুখ-দুঃখের বাউলী জীবন তার দৃষ্টিকে করেছে উদাস, মনকে করেছে উদার। তাই তার আবেগে জন্ম নিয়েছে প্রেম, প্রীতিতে জন্ম নিয়েছে আন্তরিকতা। এই প্রেম আর আন্তরিকতা চালিত করেছে তার বুদ্ধিকে। তাই তার বুদ্ধি হয়েছে হৃদয় ধনে ধনী। কিন্তু সেই শান্ত সুরের কবি, যার চোখের কোণে প্রেমের মায়া-কাজল, সেই বাংলা, বাঙালীর চোখের কোণে কেন আগুনের ঠিকরে পড়া বহ্নিশিখা! কেন সেখানে বৈশাখের ডাক।

তার কারণ, বাঙলা দেশের সন্তানেরা আজ অমৃতের মন্ত্রপাঠ করার দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছে। গোটা বাঙালী জাতি মুক্তির অভিষেক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে।

সেই জেগে ওঠা জাতিকে একবার দেখে পিপাসা মেটে নি। বার বার ছুটে গেছি, কখনো গিয়ে শুনেছি বারুদের গন্ধ, কখনো শুনেছি গুলির আওয়াজ। আজ আর এপার বাংলা ওপার বাংলা বলে কিছু নেই, ভৌগোলিক নিষেধের তর্জনী আজ হাত নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে, জিন্নার বড় সাধের দ্বি-জাতি তত্ত্বের বায়নাক্কা আজ কবরের বেদীতে সমাধি রচনা করেছে।

কপোতাক্ষ নদীর তীরে যশোরের গ্রামে গেছি। গেছি হরিদাসপুর সীমান্ত পেরিয়ে দূর দূরান্ত গ্রামে, গেছি খুলনা জেলা সীমান্ত পেরিয়ে

বেশ কয়েক মাইল ভিতরে। দেখেছি, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে ওরা রক্তে লিখে চলেছে এক গৌরবদীপ্ত কাহিনী, বুকের পাঁজরে জ্বলছে তাদের কঠিন শপথের আগুন।

যেখানেই গেছি, সেখানেই পেয়েছি মধুর আতিথেয়তার উষ্ণ আলিঙ্গন, জয় বাংলা। আরেকজন অল্পবয়সী ছাত্র তো ত্রি-রঙা জয় পতকা উত্তোলিত করে অভিনন্দন জানালো আমাদের, আরেকজন উপহার দিলো আমাদের জয় বাংলার ডাক টিকিট।

কিন্তু তবু, কোথায় যেন ক্ষোভ, কোথায় যেন অভিমান। কি যেন বলতে চায় ওরা। গল্প করছিলাম যশোরের লক্ষীপুর থেকে অনেকটা ভেতরে অবস্থিত একটা গ্রামে। আওয়ামী লীগের অফিস সেটা।

হঠাৎ একটি অল্প বয়স্ক যুবক বলে উঠলেন, আপনারা বারে বারে এখানে আসছেন, অনেক ঝুঁকি নিয়েও খবর সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন, এতে আমাদের আনন্দই হচ্ছে। কিন্তু কি জানেন—

আমি তাকালাম যুবকের দিকে। পরিচয় হল তাঁর সংগে। যুবকের নাম সেখ আসাদুর রহমান, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। কথা-বার্ত্তায় বেশ ভদ্র, মার্জিত রুচি, নম্র ব্যবহার, সংযত অথচ প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত কথা-বার্ত্তা।

আসাদুর শেষ করলেন তাঁর কথা, আমরা আরো অনেক কিছু আশা করি আপনাদের কাছে।

আমি বললাম, কি ধরণের আশা করেন?

খুব দৃঢ়তার সংগে, চোখে-মুখে কঠিন প্রত্যয়ের আলো এনে আসাদ্দুর বললেন, ভারতবর্ষ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করুন, এটাই আমাদের অনুরোধ। এখন আর কেউ বলতে পারবে না, লুকিয়ে চুরিয়ে আমরা মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। প্রকাশ্যে মুজিবনগরে আমাদের মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলা সরকার প্রতিষ্ঠায় শুধু আপনারাই নয়, বিদেশের কত সাংবাদিকেরা এসেছিলেন।

আমি বললাম, আমাদের সরকার এ-ব্যাপারে ভেবে দেখছেন। হয়ত কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন। তবে, আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, এক্ষুনি এই মুহূর্তে বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিৎ।

আসাদুর বললেন, আমরাও সেটাই আশা করি। বাড়ীতে আগুন লাগলে, পাশের বাড়ীই আগুন নেভাতে আসে, এটাই সরল সত্য। আবার পাশের বাড়ীর সংগে যদি আত্মীয়তা থাকে, তবে তো কথাই নেই; আগেই তাকে সাহায্য করা উচিত।

আমি বললাম, ভারত সরকারের স্বীকৃতি দেওয়াও উচিৎ। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, পঞ্চাশ কোটি ভারতবাসী আজ আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের দুঃখ হয়েছে আমাদের দুঃখ আপনাদের যন্ত্রণা হয়েছে আমাদের যন্ত্রণা, আপনাদের সংগ্রাম হয়েছে আমাদের সংগ্রাম। আপনাদের সব কিছুর অংশীদার আমরাও।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন যুবক বলে উঠলেন, এটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড়ো আশার কথা। আমরা যখন আপনাদের কাগজ হাতে পাই, দেখি আমাদের জন্য আপনারা সভা-সমিতি করছেন, প্রতিবাদ করছেন, আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন, তখন গৌরবে ও আনন্দে চোখে জল আসে। আপনারা যে আমাদের সংগ্রামে কত প্রেরণা যোগাচ্ছেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। তাই পরমাত্মীয়ের মত প্রতিটি ব্যাপারে আমরা তাকিয়ে থাকি আপনাদের দিকে।

আসাদুর বললেন, আর দেখুন তাকিয়ে পৃথিবীর বড়ো বড়ো দেশের দিকে। ওদের বিবেক, মনুষ্যত্ব, মানবতা, ন্যায়নীতি এসব গেল কোথায়? ওরা অপেক্ষা করছে, হাওয়া যদি খুব ভালোভাবে আমাদের দিকে মোড় নেয়, একটি হানাদারও যখন অত্যাচার করতে থাকবে না এখানে, তখন তাঁরা অবস্থা বুঝে সমর্থন করবেন আমাদের। কি অপূর্ব্ব রাজনীতি-ই না শিখেছেন ওঁরা!

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলে উঠলো, এখন ওরা আন্তর্জাতিক আইন কি বলে তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন, এখনো অনেক ভাবছেন। অনেকে বলছেন, পাকিস্তানের এটা নিছক ঘরোয়া ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

একটু রেগে উঠে আসাদুর বলে উঠলো, তা তো ভাববে-ই। কিন্তু যখন ড্যাগলের বিন্দুমাত্র ঠাঁই ছিল না ফ্রান্সে তখন সেই দেশ স্বীকৃতি পেল কেমন করে? তখন কোথায় ছিল আন্তর্জাতিক আইন; কোথায় ছিল আইনের দাবাখেলা?

ইতিমধ্যে আরেকজন এসে দাঁড়ালো আমাদের আলোচনায়। যুবকটির নাম রবিউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলে উঠলেন, আর লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করছে ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী, বুদ্ধিজীবী-দের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারছে, নারী, শিশু, যুবতী কাউকে হত্যা করতে কার্পণ্য করছে না। গ্রামকে গ্রাম ওরা পুড়িয়ে দিচ্ছে, ধ্বংস করছে। যেখানেই হেরে যাচ্ছে, সেখানেই নির্বিচারে বোমা ফেলছে। এটা ওদের কাছে হল আভ্যন্তরীণ ব্যাপার! কিন্তু কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে, গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস হচ্ছে, তা দেখেছেন কি? আর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলে সেই দেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে? তাও অপ্রকাশ্যে নয়, প্রকাশ্যে।

আমি বললাম, তবে ওরা আপনাদের স্বীকৃতি জানাচ্ছেন না কেন?

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র আসাদুর বললেন, এর পিছনে বিরাট এক রাজনীতি কাজ করছে।

—কি সেই রাজনীতি?

তা বলতে গেলে আমাদের এই মুক্তি-সংগ্রামের চেহারাকে একটু স্পষ্ট করে দিতে হবে। তাহলে বুঝতে পারবেন, বৃহৎ নীরব কেন। আমাদের এই যে গণ-অভ্যুত্থান, তা স্বতঃস্ফূর্ত, এর মধ্যে আন্তর্জাতিক কোন ইজমের ছাড়পত্র নেই। মুস্কিল হয়েছে এখানেই।

যদি কোন নির্দিষ্ট ইজমের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতাম, তা হলে পৃথিবীর তিন বৃহৎ শক্তির কোন শক্তি আমাদের পক্ষে এসে দাঁড়াতো। একটি শক্তি এসে দাঁড়ালেই, তার উপর নির্ভরশীল যেসব রাষ্ট্র, তারাও এসে দাঁড়াতো আমাদের পাশে। কিন্তু যেহেতু, তিন বৃহৎ শক্তি চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে, তাই ওদেরও চুপচাপ বসে থাকতে হবে।

ওঁর বন্ধুই বলে উঠলো, আমেরিকা চুপ করে বসে রয়েছে কেন?

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র বললেন, আমেরিকার অনেক সমস্যা। প্রথম সমস্যা, আজ যদি আমেরিকা স্বাধীন বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানকে যে কয়েক শো কোটি ধার দিয়েছে, অস্ত্র শস্ত্র দিয়েছে, তো হজম করে দেবে ওরা। তাছাড়া, অন্য দুটি বড়ো রাষ্ট্র সেখানে আসর জমাবে, আমেরিকা সেখানে থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেখানে যে-ভাবে আমেরিকা গাঁট-ছাড়া-বেঁধে আছে, তাতে বেরুনো ওর পক্ষে বেশ কঠিন।

রফিউদ্দিনেরও দেখলাম রাজনীতির ব্যাপারে বেশ টনটনে জ্ঞান। এই তরুণ যুবক বললেন, তাছাড়া, আমেরিকার আছে কাশ্মীর নীতি। এত বছর ওরা পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীরের হয়ে ওকালতি করে এসেছে। এখন আমাদের যদি সমর্থন করে, কাশ্মীরের নীতিও ওদের পাল্টাতে হবে। কেননা, আমরা কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত-সরকারের নীতি সমর্থন করি।

আরেকজন খুব জোরের সংগে বলে উঠলেন, কিন্তু যাই হোক না কেন, আমাদের কেউ রুখতে পারবে না। স্বাধীনতার যে যুদ্ধ আমরা সুরু করেছি, একটা হানাদার থাকা পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধ চলবে। ততদিন আমাদের চোখে ঘুম থাকবে না, মনে আনন্দ থাকবে না।

আমি বললাম, কিন্তু যেভাবে ওরা মরিয়া হয়ে পোড়া-নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে তো অক্ষত অবস্থায় কিছুই থাকবে না।

অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের সংগে আসাদুর বললেন, ধ্বংস ও সৃষ্টির

আরেক পিট। মোহিতলালের একটি কবিতা অনেক দিন পড়েছিলাম। তিনি সেই কবিতায় বলেছিলেন, ধ্বংসের মধ্যেই প্রবল হয়ে ওঠে সৃষ্টির অজস্র সম্ভাবনা। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের তো একাধিক কবিতাতে একথা আছেই। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে, বর্বরেরা রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের বাড়ীটার নাকি অনেক ক্ষতি করেছে। ওটা আমাদের সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর তীর্থস্থান। এই অপরাধের কি কোন ক্ষমা আছে?

রফিউদ্দিন বলে উঠলেন পৃথিবীতে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অনেক বিপ্লব, অনেক বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতি রক্ষার জন্য একটি জাতির গণ-অভ্যুত্থান, তা কোন ইতিহাসে পড়েছেন?

আসাদুর বললেন, আর এই সংস্কৃতি হচ্ছে, বাঙালী সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। ভারতবর্ষের উচিৎ, এই বাংলা দেশের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরা পৃথিবীতে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত রাখুন, মানবতার পক্ষে তাঁরা আছেন, মনুষ্যত্বের শ্রেয়নীতিতে তাঁরা আছেন, বিবেকের বাণীতে তাঁরা আছেন, সংস্কৃতি রক্ষার্থে তাঁরা আছেন। ভারত সরকার এই নতুন রাষ্ট্রকে সর্ব প্রথম স্বীকৃতি দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করুন।

মনের মধ্যে অদ্ভুত এক আবেগ নিয়ে, অদ্ভুত এক আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম জয় বাংলা থেকে। কিন্তু আশ্চর্য, কতই ওদের বয়স হবে, বড়ো জোর কুড়ি কিংবা একুশ। অথচ, কি ক্ষুরধার ওদের বুদ্ধি, আত্মপ্রত্যয়ে কত জোর, সংস্কৃতির সংরক্ষণে কি গভীর শ্রদ্ধা! যে দেশে এদের মত যুবক রয়েছে, সেই দেশের জয় যে হবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ কি। কিন্তু আমি ভাবছি, পরমাত্মীয়ের মত ওরা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমাদের সরকারের এখনও কি উচিৎ হচ্ছে ওদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে দর-কষাকষি ও টাল-বাহানা করা? ভারতবর্ষই সর্ব প্রথম বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাক না।

অরুণ-রাঙা প্রভাত

ইতিহাসের স্মরণ-তীর্থ হয়ে থাকবে মুজিব নগর। একটি নূতন রাষ্ট্র, নূতন জাতিকে অরুণ-রাঙা প্রভাতের স্বর্ণ-দুয়ারে অভিষেক করা হল। সেই রাষ্ট্রের নাম গণতান্ত্রিক বাংলা প্রজাতন্ত্র, সেই জাতির নাম বাঙালী আর তাদের মাতৃভাষার নাম বাংলা।

সেই সাড়ে সাত কোটি জাতি আম্রকুঞ্জের ছায়াবীথি তলে শপথ নিলেন নূতন করে। নেই কোন আড়ম্বর, নেই কোন উল্লাস। আছে একটি শান্ত নম্র পবিত্র ভাব। এই সেই আম্রকানন, যার প্রাচীন নগরীতে ১৭৫৭ সালে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা দেশ হারিয়েছিল তার স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা। সেই লজ্জাকে ঢাকবার জন্য সে জাহ্নবী-সলিলে সমাধিস্থ করেছিল নিজেকে। কিন্তু আজ আর এক প্রান্তরের আম্র-বীথিকার স্নিগ্ধ ছায়ায় সৃষ্টি করলো এক গৌরবের ইতিহাস। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা, তার নতুন নাম মুজিবনগর। এখানে বাধা পড়েছে একটি জাতির প্রাণ, একটি জাতির মন, একটি জাতির হৃৎপিণ্ড। 'জয় বাংলা'র সুরের পতাকাতলে একটি জাতির গোটা আত্মা ঐক্যতান মিছিলে যোগ দিয়েছে। এই জাতি বাঙালীত্বের ভাবে ও ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, মাতৃভাষা তাদের বাংলা। শহীদদের রক্ত ব্যর্থ হয় নি, পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-বুড়িগঙ্গার তীরে তীরে জীবনের জয় গান যাঁরা গেয়েছিলেন একদা, সেই আত্মা আজ তৃপ্ত, প্রসন্ন, পূর্ণ। কেননা, সপ্তকোটি প্রাণ কলনিনাদ আজ একই সুরের আসরে আত্মস্থ।

সেই আম্রকাননে স্বাধীনতার মন্ত্রবাণী উচ্চারণ করলেন স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। মুজিবর নেই? কে বলে নেই

তিনি? তিনি আছেন আকাশে, বাতাসে, আছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষায়, আছেন সুখে, দুঃখে, সংগ্রামে, ব্যর্থতায়, নৈরাশ্যে। তাঁর কায়িক সত্তা যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করবে, সময়ের সারথি যখন সবুজ-সংকেত দেবে।

সকলের মুখে শুধু মুজিব, শুধু মুজিব, যেখানে নবজাতকের অন্নপ্রাসন হল, সেই স্মরণীয় প্রান্তরের নামও মুজিবনগর।

আকাশে আলো-আঁধারীর, মেঘ ও রৌদ্রের অপূর্ব মেলা। আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে চারটি ছেলে গাইলো সেই প্রাণ-মাতানো, হৃদয় নিঙড়ানো গান, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমার ভালোবাসি'। তারপর পবিত্র কোর-আন থেকে স্তবগাঁথার মত বেরিয়ে এলো 'তেলাওয়াৎ'।

না, এ আমার কল্পনার আকাশে বিলাসিতার মরীচিকা-আঁকা ছবি নয়। সতেরই এপ্রিল, উনিশ শো একাত্তর সাল, মুজিব-নগরের একটি বাস্তব ছবি। অপ্রকাশ্যে মুখ লুকিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা নয়, প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, মন্ত্রীদের পরিচয় সবই হলো একে একে।

শুধু কাফের সাংবাদিকরাই এই অনুষ্ঠানে হাজির থাকেন নি, সেই মহান বাংলার স্মরণীয় তীর্থে হাজির ছিলেন আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া ও আরো অনেক রাষ্ট্রের সাংবাদিকেরা। সেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সকলেই মঙ্গল কলসে করেছেন বীজ বপন। বিদেশী মহিলা সাংবাদিক ও ক্যামেরা-গার্লসদের সে কি উৎসাহ। মুহুর্মুহু ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ আওয়াজ ও ঝলসে ওঠা আলোতে ঝলমল করতে লাগলো গোটা এলাকা। অনেক বিদেশী সাহেব-সাংবাদিক এই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দৃশ্যকে ধরে রাখলেন টেলিভিসন ক্যামেরায়।

বাংলা দেশের পতাকা উড়তে লাগলো আকাশে, বাতাস তার অঙ্গে চামর দোলাল। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীনুরুল আমিন ইসলাম

গার্ড অব অনার গ্রহণ করলেন। তারপর এসে দাঁড়ালেন বক্তৃতা-মঞ্চে। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের প্রতিলিপি হোক আমাদের একান্তের গীত-ভাষা/

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি' মুকুল' আমিন' রক্তের আখরে ইতিহাস লিখলেন :

"জাতি হিসেবে বাঙালী জেগে উঠেছে। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই বাঙালীর জয়যাত্রার বাধা দিতে পারে। "প্রান্তরে প্রান্তরে, হাটে-বাজারে, শহরে-গঞ্জে বাঙালী লড়ছে। অকাতরে আমরা রক্ত দিচ্ছি পরাজিত হবার জন্যে নয়। এ-যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের অস্তিত্বের যুদ্ধ—এ-যুদ্ধে আমরা জিতবই।"

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জানান, গত ২৫শে মার্চ তাঁদের সরকার গঠিত হয়। গঠন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী যাঁকে এক বাক্যে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছে।

তিনি বলেন, "আজ এই আম্রকাননে একটি নতুন জাতি জন্ম নিল। বিগত ২৩ বছর যাবৎ বাংলার মানুষ তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব নেতাদের নিয়ে এগোতে চেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থ তা হতে দিল না। ওরা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে এগোতে চেয়েছিলাম, ওরা তা দিল না। ওরা আমাদের উপর বর্বর আক্রমণ চালাল। তাই আমরা আজ লড়াইয়ে নেমেছি। এ লড়াইয়ে আমাদের জয় অনিবার্য। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের বিতাড়িত করবই। আজ না জিতি কাল জিতব। কাল না জিতি পরশু জিতবই।

আমরা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই। পরস্পরের ভাই হিসেবে বসবাস করতে চাই। মানবতার, গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার জয় চাই।"

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বললেন, "তিরিশ বছর ধরে বঙ্গবন্ধু নিজের

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করে দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেছেন।

"আপনারা জানেন, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ এবং শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গত ২৩ বছর ধরে বঙ্গবন্ধু সব কিছু পরিত্যাগ করে আন্দোলন করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। আমি জোর দিয়ে বলছি তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। জাতির সঙ্কটের সময় আমরা তাঁর নেতৃত্ব পেয়েছি তাই বলছি পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম লগ্নের সূচনা হল তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোন শক্তি তা মুছে দিতে পারবে না।

আপনারা জেনে রাখুন, গত ২৩ বছর ধরে বাংলার সংগ্রামকে পদে পদে আঘাত করেছে পশ্চিমের স্বার্থবাদী, শিল্পপতি, পুঁজিবাদী ও সামরিক কুচক্রীরা।

আমরা চেয়েছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের অধিকার আদায় করতে। লজ্জার কথা, দুঃখের কথা ওই পশ্চিমীরা শের-ই বাংলাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল। শহীদ সোরাবর্দি সাহেবকে কারাগারে পাঠিয়েছিল। তাই ওদের সঙ্গে আপস নেই। নেই ক্ষমা।

আমাদের রাষ্ট্রপতি জনাব শেখ মুজিবর বাংলার মানুষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য যে ৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৫১ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তা মেনে নিয়েছেন। কায়েমী স্বার্থে এতে আঘাত এল। এরা উঠেপড়ে লাগলেন আমাদের খতম করার জন্য। তা ওদের বলে দিতে চাই তোমরা তা পারবো না।

সারা বিশ্ববাসীকে আমরা বলতে চাই—২৫ মারচ রাতের অন্ধকারে কারফু না দিয়ে সামরিক বাহিনীর ঝুনটা ঢাকা শহরে বুদ্ধিজীবীদের খুন করতে শুরু করেছে। হাজার হাজার নিরস্ত্রকে নাগরিককে গুলি করা হল। বাংলার নারীরা ইজ্জত হারাল।

তাঁদের কি অপরাধ। বিশ্বের জনগণের কাছে এর বিচার চাই। আপনারা বলুন আমাদের কি অপরাধ। আমরা স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার চেয়েছিলাম। আমাদের কেন গুলি করা হল। তাই পৃথিবীর ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।

পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অত্যাচার বাংলার মানুষ গ্রহণ করেন নি। বাংলার মানুষ কাপুরুষ নয়। আমরা বাঙালীরা স্বাধীনতার জন্য লড়তে জানি। এই যুদ্ধ স্বাধীনতার অস্তিত্বের যুদ্ধ। পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালীর অস্তিত্বের যুদ্ধ।

শ্রীইসলাম বলেন, হাটেবাজারে, নদী নালায় আমার সৈনিকরা লড়েছেন, লড়ছেন, লড়বেন। তাঁরা এই দেশের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সংস্কৃতির বেড়াজাল ভেঙে জয়লাভ করবেন।

আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য মনের দিক থেকে সঙ্ঘবদ্ধ।

আমরা পরাজিত হওয়ার জন্য যুদ্ধে নামি নি। বাঙালী জাতি জেগে উঠেছে। জাগ্রত জাতি হিসাবে পৃথিবীর সঙ্গে সহঅবস্থান করতে চাই।

যুগ যুগ ধরে মনীষীরা মানব মুক্তির জন্য পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। আমাদের এই জয় হবে মানবতার জয়। গণতন্ত্রের জয়।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতার সে আদর্শ সামনে রেখে আমাদের মহান্ নেতার নির্দেশে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই।

আপনারা জেনে যান আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার আছে। থাকবে। আপনারা এই সরকারকে স্বীকৃতি দিতে সাহায্য করুন।

বক্তৃতা শেষ করার আগে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, "স্বাধীন বাংলা দেশের এক খণ্ড জমিতেও শত্রু রাখব না। রাখব না। ইনশাহ্ আল্লা—জয় বাংলা।"

তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে অগণিত সর্বসাধারণ 'জয় বাংলা' 'মুজিবরের জয়' বলে গীতিবাদ্যে হর্ষধ্বনি করে ওঠেন। এই আম্র-কাননে যে ইতিহাস সৃষ্টি করা হল, তার সূর্য-স্বাক্ষী হয়ে রইলেন শতশত মুক্তি পাগল বীর মুজিবর বাহিনী ও স্বাধীনতার রঙে রাঙা হাজার হাজার জনতার পুলকিত কলোচ্ছ্বাস ও শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান ও ক্যামেরাগার্ল।

এরপর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সরকারের প্রধান মন্ত্রী তাজুদ্দিন কেমন করে পশ্চিম পাকিস্তানের শায়েনশা শয়তানীর মুখোশ এঁটে দিনের পর দিন বাঙালীর রক্ত চুষছিল, তার বর্ণনা করেন।

এই বিবৃতিতে তিনি বলেন "মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনার সময় ইচ্ছে করে আশাজনক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। অথচ ঐ সময়েই চট্টগ্রাম সামরিক বাহিনী থেকে বাঙালী ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে হঠাৎ সরিয়ে ফেলে সেখানে একজন পশ্চিম পাকিস্তানীকে বসান হয়। ২৪শে মার্চ রাত্রে তাকে সশস্ত্র প্রহরাধীনে আকাশপথে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সম্ভবতঃ তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর নতুন সামরিক কর্তৃপক্ষ হঠাৎ জাহাজ থেকে মাল খালাস করার নির্দেশনামা জারী করেন। সতরদিন ধরে ধর্মঘট চললেও এরকম কিছু তারা করেন নি। চট্টগ্রামের রাস্তায় লক্ষ লক্ষ লোক বেড়িয়ে পড়েন সামরিক বাহিনী যথেচ্ছ গুলি চালায়। আলোচনা চলাকালে এমনটা কেন করা হ'ল জেনারেল পীরজাদার কাছে এ প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি কিছুই নাকি করেন নি।

২৪শে মার্চ আওয়ামীগ নেতাদের সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়ার সর্ব্বশেষ বৈঠক বসে। এরপর কথা ছিল জেনারেল পীরজাদা আবার নেতাদের ডাকবেন। ডাকা তো হয়ই নি, উপরন্তু যিনি আলোচনা চালাচ্ছিলেন, ২৫শে সকালে তাঁকে হঠাৎ করাচী পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

২৫শে রাত এগারটার মধ্যে সৈন্যরা জায়গা মত ওৎ পেতে বসে

থাকে। কোন চরম পত্র নয়, কার্ফু নয়, হঠাৎ মধ্য রাত্রে মেশিন গান চালানো সুরু হয়ে যায়। পরের দিন টিক্কা খানের ঘোষণা বেতারে প্রচারিত হবার আগেই ৫০ হাজার মানুষকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান, তাই অক্ষম, বৃদ্ধ, নারী, শিশু আর ঘুমন্ত মানুষকে ঘর থেকে টেনে ওরা খুন করে। স্বাধীন বাংলা সরকার পরে এই গণহত্যার বিস্তৃত বিবরণ দেবেন।

"২৫শে রাত্রে ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে যান, পরের দিন রাত আটটার আগে তাঁর পক্ষে এই গণহত্যার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়নি। এখন আর কোন কৈফিয়ৎ নয়, ইয়াহিয়া জঙ্গলের আইন চালু করেছেন।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পাকিস্তান মরে গেছে, মৃতদেহের পাহাড়ের নীচে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। ইয়াহিয়া গণহত্যা চালিয়ে নিজেই পাকিস্তানের কবর খুঁড়লেন।"

প্রধানমন্ত্রী নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানান। কৃতজ্ঞতা জানান ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের প্রতি। বিশ্বের অষ্টম জনবহুল রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বসভায় স্থান ক'রে নেবেই: তিনি এই প্রত্যয় প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী সভা গঠন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নুরুল ইসলাম আলী তাঁর স্বাধীন বাংলার জনগণতান্ত্রিক মন্ত্রিসভায় যাঁদের গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন:

১। প্রধান মন্ত্রী: শ্রীতাজুমুদ্দিন আমেদ

প্রধানমন্ত্রীর সংগে পরামর্শ করে আর যাঁদের নিয়োগ করা হয়, তাঁরা হলেন।

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী: (ক) শ্রীখান্দকার মোসতাক আমেদ (খ) শ্রীমনসুর আলী (গ) শ্রীকামরুদ্দান।

৩। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্ণেল উসমানি।

৪। চীফ অব ষ্টাফ : কর্ণেল আবদুল রব।

স্বাধীন বাংলা সরকার একটি স্বাধীনতার দলিল-ও রচনা করেছেন। সেই ঐতিহাসিক দলিলের বয়ান :

যেহেতু ১৯৫০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৫১ সনের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৫৫ সনের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহূত এই স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনী-ভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনা চলাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতা মূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতা মূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথ ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা

দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এবং বাংলাদেশের জনগণ তাঁহাদের বীরত্ব সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাঁহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যাণ্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে জনগণের জন্য সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য—সেইহেতু আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। •

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্রবাহিনী সমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাহার কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে, তাহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা ছাড়া বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও বিষয়তান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও অধিকারী হইবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা

আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যদি তিনি অক্ষম হন তাহা হইলে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকরি বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যাপক এস, ইউসুফ আলিকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।

এই ঘোষণার একদিন পরে কলকাতায় ঘটলো এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী যোদ্ধদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। কলকাতার পাকিস্তানী হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন শ্রী এম হোসেন আলী। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে শ্রী আলি অত্যন্ত সততা, যোগ্যতা ও অপূর্ব নিষ্ঠার সংগে পাকিস্তান সরকারের হয়ে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সংগে পালন করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পাক সরকার তাঁকে ডেপুটি হাই কমিশনারের পদে সম্মানিত করেছিলেন।

কিন্তু স্বাধীন বাংলায় ইয়াহিয়া খাঁ যে বর্বর নৃশংস গণ-হত্যার উৎসবে মেতে উঠেছেন, তার প্রতিবাদে শ্রী আলি বেরিয়ে এলেন

বাংলার রাজপথে, পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সংগে করলেন সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ।

"আমার মা-বোন-ভাইকে, লক্ষ লক্ষ বাংলার জনগণকে মর্মান্তিক পৈশাচিকতায় হত্যা করবে, পূর্ব বাংলাকে পরিণত করবে শ্মশানের প্রান্তরে, আর আমি সুখের রাজশয্যায় দিন কাটাবো, সম্মানের দুর্গে বাস করবো?"

গর্জে উঠলেন শ্রীআলি ও বেগম আলি। বেগম আলি বললেন, বাংলার স্বাধীনতার জন্য আমরা প্রাণ দেবো, তবু নেকড়ের মুখে আমার স্বামীকে ছেড়ে দেবো না।

শ্রীআলি বললেন, রইলো তোমার রাজকীয় মসনদ, রইলো তোমার ভূয়ো সম্মানের ডালি। বাংলা দেশের আত্মার সংগে আমার আত্মার যোগ করছি। আজ থেকে এই ভবনকে স্বাধীন বাংলা দেশের মিশনে অভিষেক করছি এই সৌধশীর্ষে উঠবে জয় বাংলার স্বাধীন ত্রি-রঞ্জিত পতাকা।

সাবাস শ্রীআলি ও শ্রীমতী আলি। একেই বলে বীর, একেই বলে যথার্থ দেশপ্রেমিক কোন কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধির এমন ঘোষণা, পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই।

কিন্তু স্বাধীনতা, এ তো শুধু মুখের কথা নয় এবং তার অস্তিত্বকে বজায় রাখা, এ যে বড়ো দুঃসাধ্য ব্রত, কঠিন শপথ। কঠিন ব্রতকে পালন করবার জন্য চাই কঠিন বুক, চাই সব রকম কষ্ট নির্য্যাতনকে সহ্য করবার জন্য দৃঢ় মানসিক প্রস্তুতি। কারণ, সামনের পথ, সে যে বড়ো কন্টাকাকীর্ণ, সংগ্রামের রক্ত-রাঙা বিরাট এ প্রান্তর।

সে-কথা ভুলে যান নি মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত সাড়ে সাত কোটি নবজাগ্রত জনতা। তাই তো তাঁরা কত স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করতে পেরেছেন সংগ্রামের বাণী।

দিয়েছি তো শান্তি, আরো দেবো স্বস্তি
দিয়েছি তো সম্ভ্রম, আরো দেবো অস্থি

প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত,
হক না পথের বাধা প্রস্তর-শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সঙ্ঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।
মৃত্যুর ভর্ৎসনা আমরা তো
অহরহ শুনছি
আঁধার গোরের ক্ষেতে তবু তো
গোরের বীজ বুনছি
আমাদের বিক্ষত চিত্তে
জীবনে জীবনে অস্তিত্বে
কালনাগ-ফণা উৎক্ষিপ্ত
বার বার হলাহল মাখছি
তবুতো কান্তিহীন যত্নে
প্রাণের পিপাসাটুকু স্বপ্নে
প্রতিটি দণ্ডে মেলে রাখছি।

—সিকান্দার আবু জাফর

এই অটল বিশ্বাস নিয়ে গোটা জাতি অবিচল ভাবে এগিয়ে চলেছে বিজয়ের স্বর্ণ-মঞ্চের অভিষেক উৎসবে। পূবের আকাশ উজ্জ্বল, অরুণোদয় হবেই। জয় হোক মুজিবর রহমানের, জয় হোক সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর, জয় হোক জয় বাংলার।

———